পৌষ।

মাঘ।

ফাল্গুন।

চৈত্র।

শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ।

(তৃতীয় খণ্ড)

ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবন হইতে গেণ্ডারিয়া আগমন ও আশ্রমের তদানীন্তন অবস্থা।

শ্রীশ্রীগুরুদেব (প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়) ১২৯৬ সনের পৌষ মাস হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামে বৎসরাধিক কাল বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে মাঠাকুরুণ (শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী) ১২৯৭ সনের ১০ই ফাল্গুন তারিখে দেহত্যাগ করেন। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই ঠাকুর, তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী (শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী), তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামী, কন্যা কুতুবুড়ী (শ্রীমতী প্রেমসখী) এবং আমাদিগের অন্যান্য কয়েকটিকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনহইতে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায় উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে যাইয়া তিনি অল্প কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করেন এবং যোগজীবনের দ্বারা মাঠাকুরুণের অস্থি ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাগর্ভে সমাহিত করিয়া, ঢাকা গেণ্ডারিয়া যাত্রা করেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে ঠাকুর আমাকে জানাইয়াছিলেন, "শীঘ্রই আমি গেণ্ডারিয়া যাইতেছি। সুবিধা বোধ করিলে, এখনহইতেই তুমি সেখানে যাইয়া থাকিতে পার।" কোন্ দিন কোন্ সময়ে ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আসিবেন, আমার কিছুই জানা ছিল না। আমি সাতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত, বাড়ীতে থাকিয়াই, ঠাকুরের ঢাকা আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, অকস্মাৎ ১৩ই চৈত্র ঠাকুরের জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি অমনি এক মাসের মত আহারের সামগ্রী সংগ্রহ

করিয়া, ছোট দাদার (শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের) সঙ্গে ১৪ই চৈত্র গেণ্ডারিয়া আসিয়া পঁহুছিলাম। শুনিলাম, ঠাকুর গত কল্যই এখানে আসিয়াছেন।

প্রায় দুই বৎসর পরে ঠাকুর ঢাকা পঁহুছিতেছেন, সর্ব্বত্রই এ কথা ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং নানাস্থানহইতে শিষ্য ও শিষ্যাগণ ঠাকুরের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুরের গেণ্ডারিয়া পঁহুছিবার পরদিনহইতেই দীক্ষাস্রোত চলিয়াছে। চৈত্র মাসের বাকি কয়দিনে কত লোক যে ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিলেন, বলিতে পারি না। বরিশাল, ফরিদপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের গুরুভ্রাতাদিগের সমাগমে, এখন আশ্রমে আর স্থান সঙ্কুলন হইতেছে না। আশ্রমসংলগ্ন আমাদিগের সতীর্থ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ, শশী বাবু ও সতীশ বাবু প্রভৃতির বাড়ীও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরে ঢালা বিছানা করিয়া এবং ঐ ঘরের দু'দিকের বারেন্দায় চাটাই মাত্র বিছাইয়া, বহু অবস্থাপন্ন এবং সম্ভ্রান্ত গুরুভ্রাতৃগণ রাত্রি যাপন করিতেছেন। ঠাকুর পূবেরঘরে আসন করিয়াছেন। সেখানেও কয়েকজন গুরুভ্রাতা রাত্রিতে থাকেন। ছোট দাদা, কুঞ্জবিহারী গুহ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আমি কোথাও স্থান না পাইয়া অগত্যা ভাণ্ডারঘরের এক কোণে কোনও মতে রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি।

রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই, খোল করতাল বাজিয়া উঠে। গুরুভ্রাতারা সকলে মিলিত হইয়া, ভোর-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে তিন চারি জন গুরুভাই ঝাঁটা লইয়া সমস্ত আশ্রম ঝাড়ু দিতে থাকেন। কেহ কেহ গোবর জল লইয়া আমতলা, ঠাকুরের আসনকুটীর, আশ্রমের উঠান ও ঘরের চারি দিকের পিড়া ও বারেন্দা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই লেপিয়া রাখেন। গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেকেই আপন আপন রুচি-অনুযায়ী ঠাকুর-সেবার কোনও না কোনও কার্য্য লইয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন। মহাসমারোহের পূজা বা মহোৎসবাদি ব্যাপারে দিনটি যে ভাবে আনন্দ উৎসাহে চলিয়া যায়, আমাদেরও সকলের সেই ভাবে প্রতিদিন অতিবাহিত হইতেছে। কিন্তু ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা, কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র (দাউজী) জন্মগ্রহণ করিবার সময়হইতেই, অত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন, এখন মাতৃবিয়োগ-সংবাদ পাইয়া, আরও কাতর হইয়াছেন। দিদিমা কন্যা-বিয়োগে অতিশয় শোকাতুরা হইলেও, গুরুভগিনীদের সহিত সকাল বেলা এগারটা পর্য্যন্ত আশ্রমস্থ সকলের

আহারের বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। যোগজীবনের স্ত্রী পঞ্চাশ ষাট জন লোকের রান্না প্রতিদিন অবাধে দু'বেলা প্রফুল্লমনে সুচারুরূপে করিয়া যাইতেছেন; দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইতেছি।

সকালে ৭ টার সময়ে ঠাকুরের চা-সেবা হয়, পরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শিখগুরুদিগের উপদেশ ও ভজন-সম্বলিত "গ্রন্থসাহেব" প্রভৃতি পাঠ হইয়া থাকে। বেলা প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের ঘর লোকে পরিপূর্ণ থাকে। আহারের পরে মধ্যাহ্নে ঠাকুরের আসন আমতলায় লইয়া যাওয়া হয়। অপরাহ্ণ ৪ টা পর্য্যন্ত ঠাকুর কাহারও সহিত বড় কথাবার্ত্তা বলেন না—ধ্যানস্থই থাকেন। সুতরাং অধিকাংশ গুরুভ্রাতাই এই সময়ে আপন আপন স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করেন। নিয়ত একটি লোক ঠাকুরের নিকটে থাকা আবশ্যক বলিয়া, আমিই পাঁচটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়া থাকি। ১লা বৈশাখ (১২৯৮ সন) হইতে আহারান্তে ঠাকুর আমাকে প্রত্যহ তাঁহার নিকটে ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। পাঠের সময়ে গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আমতলায় উপস্থিত হইয়া থাকেন; কিন্তু পাঠান্তে সকলেই চলিয়া যান। সুতরাং অপরাহ্ণ পাঁচটা পর্য্যন্ত আমতলা প্রায় নির্জ্জনই থাকে। পাঁচটার পর ধীরে ধীরে আমতলা লোকে পরিপূর্ণ হয়। আমিও ঐ সময়ে ঠাকুরের আদেশানুসারে আমার আহারীয় প্রস্তুত করিবার জন্য চলিয়া আসি। পাঁচটাহইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঠাকুর স্বচ্ছন্দভাবে সকলের সঙ্গে শাস্ত্র, সদাচার, ধর্ম্ম, সাধন প্রভৃতি বিষয়ে আলাপাদি করিয়া থাকেন; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পরে, সমস্ত গুরুভ্রাতা একত্রিত হইয়া বহু খোল করতাল সংযোগে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। এই সঙ্কীর্ত্তনের চিত্র প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। খোল করতালের ধ্বনি, সঙ্কীর্ত্তনের রবে মিলিত হইয়া, আশ্রমটিকে কাঁপাইয়া তুলে। মহাভাবের তরঙ্গ প্রবল বেগে ঘন ঘন উঠিয়া আশ্রমস্থ সকলকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল কি ভাবে যে চলিয়া যায়, কিছুই আমাদিগের লক্ষ্য থাকে না। সঙ্কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর সন্দেশ, বাতাসা, পেঁড়া, বরফি প্রভৃতি মিষ্টান্ন, স্বয়ং নিবেদন করিয়া, হরির লুট দিয়া থাকেন। তৎপরে সকলে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলে, ঠাকুর আহারান্তে দুই এক ঘণ্টাকাল উপস্থিত শিষ্যগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া অবশিষ্ট রাত্রি প্রায় চারিটা পর্য্যন্ত একভাবে ধ্যানস্থ অবস্থায় কাটাইয়া দেন; অতঃপর অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করেন। আশ্রমস্থ সকলের এই ভাবে দিন রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে।

বৈশাখ, ১২৯৮ সাল।

গঙ্গার প্রস্তর—গৌরীশঙ্কর।

৩ই বৈশাখ, শুক্রবার।

আজ মহাভারতপাঠান্তে অপরাহ্নে আমতলায় ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে গুরুভগিনী শ্রীযুক্তা মনোহরা দিদী আসিয়া তাঁহার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা ঠাকুরকে বলিলেন; শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। মা-ঠাকুরুণের দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে, মনোহরা দিদী ৺ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। গত চৈত্র মাসের প্রারম্ভে ঠাকুর যখন হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায় যান, অন্যান্য গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদিগের সঙ্গে মনোহরা দিদীও তথায় গিয়াছিলেন। হরিদ্বারে গঙ্গাগর্ভে ও বালুচড়ায় সুন্দর সুন্দর অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়। সুগোল শুভ্রবর্ণ প্রস্তরকঙ্করে লাল, নীল, সবুজ ও কাল রঙ্গের চক্র, মালার মত, অতি পরিপাটীরূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। স্নানের সময়ে মনোহরা দিদী এক দিন নানা রঙ্গের চক্রবিশিষ্ট একখানা গোলাকার শিলা তুলিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি, গেণ্ডারিয়াতে আসিয়া, ঐ প্রস্তরখণ্ড শয়নের ঘরে টেবিলের উপরে কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি ঐ প্রস্তরখণ্ড লইয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুরের নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, "হরিদ্বারহইতে আসিবার সময়ে সুন্দর একখানা সাদা সুগোল চক্রধারী পাথর আনিয়াছিলাম, এত দিন উহা টেবিলের উপরে কাগজ চাপা রাখিয়াছি; জানি না, কেন উহাতে সময়ে সময়ে মহাদেব ও ভগবতী দেখিতে পাই। গত রাত্রে আবার শুনিলাম, প্রস্তরখানি আমাকে বলিতেছেন, 'গঙ্গাতে বড় আনন্দে ছিলাম, এ অবস্থায় আমাকে এখানে আনিয়া রাখিলে কেন? আমার ক্লেশ হইতেছে।' এরূপ দেখি শুনি কেন, বুঝিতেছি না।" ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"হরিদ্বারের গঙ্গাগর্ভের প্রস্তরকে গৌরীশঙ্কর বলে। মহাদেব ও পার্ব্বতী উহাতে অবস্থান করেন; পূজা না ক'রে এ শিলা রাখ্‌তে নাই।"

দিদী প্রস্তরখণ্ড আনিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন, "ভাই, এই পাথর আমি আর রাখ্‌তে পারব না, তুমি এটি নিয়ে যা হয় কর।" আমি প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া দিলাম। বাড়ীতে গোপাল ঠাকুর আছেন, এই প্রস্তরখণ্ডও সেই সঙ্গেই পূজিত হইবেন।

গোবর্দ্ধনের শিলা—গিরিধারী গোপাল।

হরিদ্বারের গঙ্গাগর্ভের প্রস্তরে মহাদেব ও ভগবতীর প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা শুনিয়া, ৺শ্রীবৃন্দাবনধামের আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় মনে হইল। ঠাকুরের সঙ্গে যখন আমরা শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম, তখন একদিন গুরুভ্রাতা স্বামিজী * গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গিরিধারী গোপাল রূপে ঐ পাহাড়ের প্রত্যেক খণ্ড শিলাতেই জাগ্রত রূপে অবস্থান করিতেছেন। তাই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার সময়ে বার খণ্ড ছোট ছোট সুন্দর শিলা তাঁহার ঝোলাতে ভরিয়া আনিয়াছিলেন। ব্রজবাসীরা গোবর্দ্ধনের শিলা অন্যত্র নিতে দেন না, এই জন্য স্বামিজী শিলা কয়টি গোপনে সংগ্রহ করিয়া ঝোলার ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুরের পার্শ্বের ঘরেই গুরুভ্রাতা শ্রীধরের শয়নঘর ছিল; স্বামিজীও শ্রীধরেরই এক পাশে আসন রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেন, ঝোলা-ঝুলি সর্ব্বদা ঐ আসনের উপরেই পড়িয়া থাকিত। একদিন স্বামিজী খুব প্রত্যূষেই কুঞ্জহইতে পরিক্রমায় বাহির হইলেন। শ্রীধর মধ্যাহ্নে আহারান্তে আপন আসনে বসিয়া আছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, স্বামিজীর আসনের উপরে কয়েকটি বালক খেলা করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীধরকে বলিতে লাগিলেন, "গোবর্দ্ধনে আমরা বেশ আনন্দে ছিলাম, আমাদের এখানে এনে কেন অনর্থক কষ্ট দিচ্ছ? স্নান করাও না, খাবার দেও না, এ ভাবে আর কতকাল আমাদের এখানে রাখ্‌বে?" এই কথা কয়টি বলিয়া বালকগণ অকস্মাৎ অদৃশ্য হইলেন। শ্রীধর জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া চম-

* স্বামিজী—শ্রীহরিমোহন চৌধুরী—বাড়ী ধামরাই, জেলা ঢাকা। ইনি কিছুকাল ঢাকা গবর্ণমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছিলেন। ছেলেবেলাহইতে ইঁহার ধর্ম্মোন্মত্ততা ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। অল্প বয়সহইতে বহু চেষ্টা করিয়াও প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। স্বামিজীর মুখে শুনিয়াছি, ঐ সময়ে তিনি মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া, একদিন অতি নির্জ্জন স্থলে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অকস্মাৎ ঠাকুর উঁহাকে দর্শন দিয়া আশ্বাসিত করিলেন। ঠাকুরের নিকটে দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরেই, স্বামিজী সরকারী চাকরীটি ছাড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ঠাকুরের নিকটে সন্ন্যাস আশ্রমের কতিপয় নিয়ম গ্রহণ করিয়া উদাস ভাবে নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার জীবনের অদ্ভুত ঘটনা সকল যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আমার পূর্ব্ব তিন বৎসরের ডায়েরীতে বিবৃত রহিয়াছে।

কিয়া গেলেন। কারণ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

ঠাকুর শ্রীধরকে বলিলেন—"খাবার কিছু মিষ্টি আর পরিষ্কার এক ঘটী জল এক্ষণি এনে গিরিধারী গোপালদের নিবেদন ক'রে দাও। হরিমোহনের ঝোলার ভিতরে গোবর্দ্ধনের শিলা আছেন, অনুসন্ধান কর্‌লেই দেখ্‌তে পাবে।"

শ্রীধর তখনই স্বামিজীর ঝোলা খুলিয়া বারখণ্ড শিলা দেখিয়া অবাক্ হইলেন; অবিলম্বে খাবার আনিয়া গিরিধারী গোপালদিগকে নিবেদন করিয়া দিলেন। স্বামিজী সন্ধ্যার সময়ে কুঞ্জে আসিলে, ঠাকুর, ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন—"রীতিমত সেবা কর্‌তে না পার্‌লে এ সব শিলা আন্‌তে নাই; কালই ভোরে গোবর্দ্ধনে গিয়ে রেখে এসো।"

স্বামিজীও পরদিন প্রত্যূষেই ঝোলা লইয়া গোবর্দ্ধনে চলিয়া গেলেন। শিলার মাহাত্ম্য ভাবিয়া তিনি সমস্ত রাস্তা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন। সমস্তগুলি শিলা কিছুতেই তিনি রাখিয়া আসিতে পারিলেন না। দশখণ্ড গোবর্দ্ধনে রাখিয়া, অবশিষ্ট দুই খণ্ড কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং কিছুকাল উঁহাদের সেবা পূজা করিয়া, একখণ্ড সতীশকে দিলেন। সতীশ প্রতিদিন খুব শ্রদ্ধার সহিত উহা পূজা করিয়া আসিতেছেন। স্বামিজী অবশিষ্ট শিলাখণ্ড সোণার মাদুলীতে ভরিয়া, দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়াছেন এবং জল ও তুলসীর দ্বারা প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

* সতীশের প্রতি মায়াচক্রীর উৎপীড়ন।

৭ই বৈশাখ, ১৯শে এপ্রিল, রবিবার।

আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় বসিলে, আমিও তাঁহার নিকট আর আর দিনের মত দুই ঘণ্টাকাল মহাভারত পাঠ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীধর ও সতীশ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর

* সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বাড়ী ঢাকা, বাঘিয়াগ্রামে। ইঁহার সাংসারিক অবস্থা তেমন সচ্ছল না থাকায়, পাঠ্যাবস্থায় অনেক ক্লেশ পাইয়াছিলেন। নানা দুরবস্থা ভোগ করিয়াও নিজ অধ্যবসায়গুণে ইনি এণ্ট্রেন্স্ ও এফ্, এ, পরীক্ষায় গবর্ণমেণ্টের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আকস্মিক কোন কারণে পরীক্ষা দিতে বিঘ্ন ঘটিল। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার সুন্দর দখল ছিল। পঠদ্দশার প্রারম্ভেই সতীশের ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। উপাসনাশীল, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মদের সঙ্গলাভ করিয়া ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী হয়েন, এবং উপবীত পরিত্যাগ করিয়া

ধ্যানমগ্ন ছিলেন; একটু পরে ধ্যানভঙ্গ হইলে, উঁহাদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

ঠাকুর সতীশকে বলিলেন—"সতীশ, শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার সময়ে রাস্তায় নাকি তুমি মায়াচক্র দেখেছিলে? ঘটনাটি তোমার মুখে শুনি নাই, বল না শুনি।"

ঠাকুর কোনও কথা সতীশকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই, সতীশ আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়েন। ঠাকুরের আদেশ পাইয়া, সতীশ আজ খুব উৎসাহের সহিত হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আমার মন অতিশয় খারাপ হইয়া গেল। আমি চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সকলই অসার ভাবিয়া তখনই হেড্‌মাষ্টারী চাকরীটি ছাড়িয়া দিলাম ও পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলাম। আপনি শ্রীবৃন্দাবনে আছেন জানিয়া, আপনার সঙ্গে থাকিব সঙ্কল্প করিয়া চলিলাম। আমি সমস্তিপুর হইতে রওয়ানা হইয়া পথে এলাহাবাদের নিকটে একস্থানে অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলাম। তাঁদের সঙ্গে কিছু সময় আমার থাকিতে ইচ্ছা হইল। একটি খুব তেজস্বী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া, তাঁর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে খুব আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন এবং আলাপাদি করিয়া আমার সমস্ত অবস্থা জানিয়া নিলেন। ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াও উদাসভাবে বাহির হইয়াছি জানিয়া, সাধু বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সাধু আমাকে বলিলেন—"তোমরা মন হোয় তো কয় রোজ ইঁহাই রহো।" রাস্তার

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এ সময়ে সতীশের সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, উপাসনার ভাব, ও অসাধারণ উৎসাহ উদ্যম দেখিয়া, আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ইনি যাহা সত্য বুঝিতেন, লঘু গুরু না মানিয়া তাহাই বলিতেন ও করিতেন। এজন্য আমরা উঁহাকে পাগ্‌লা সতীশ বলিয়া ডাকিতাম। ১২৯৪ সনে অগ্রহায়ণ মাসে ইনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষালাভ করেন। ঠাকুরের সঙ্গে ইনি পুরী গিয়াছিলেন।

অচিরে ঠাকুর কলেবর পরিত্যাগ করিবেন জানিতে পারিয়া, সতীশ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চরণে করজোড়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে প্রার্থনা করিলেন, যেন তৎপূর্ব্বেই উঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ঐ সময়ে ঠাকুরের নিকটেও নিজের প্রবল আকাঙ্ক্ষা অতি কাতরপ্রাণে পুনঃপুনঃ নিবেদন করিলেন। ঠাকুর একদিন সতীশকে বলিলেন, "জগন্নাথদেব তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।" ইহার কয়েক দিন পরেই, দুই দিনের জ্বরে, ৭ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার দিনে, রাত্রি প্রায় ১১টার সময়ে, সতীশ নিজ অভিলষিত শ্রীধাম প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহার জীবনের অতি অদ্ভুত ঘটনাসমূহ, আমার পূর্ব্বাপর ডায়েরীতে লিখিত আছে।

ক্লেশে শরীর আমার খুব কাতর হইয়া পড়িয়াছিল; সাধুও আমাকে খুব আদর যত্ন করিলেন। ইহা ভগবানেরই কৃপা ভাবিয়া, দুই চার দিন সাধুর নিকটেই থাকিব স্থির করিলাম। কয়েকদিন থাকিয়া আমি একদিন শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। তখন সাধু আমাকে বলিলেন, "আরে, কাঁহা যাওগে? হামারা সাথ্‌ই রহো, থোড়া রোজ্‌মে সিদ্ধ্‌ বন্‌ যাওগে।" আমি সাধুকে বলিলাম, "মহারাজ, আপ্‌ সিদ্ধ্‌ হ্যাঁয়?" সাধু খুব তেজের সহিত আমাকে বলিলেন, "তব্‌ ক্যা, তোম্‌ হাম্‌কো ক্যা সম্‌ঝা?" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আপ্‌ হাম্‌কো কুছ্‌ সিদ্ধাই দেখ্‌লানে সেক্‌তে?" সাধু বলিলেন "হাঁ, দেখোগে?" এই বলিয়া সাধু আমার কপালে তাঁর কয়েকটি অঙ্গুলি স্পর্শ করাইয়া, হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনটি তুড়ি দিয়া বলিলেন, "আব্‌ মায়াচক্র দেখো।" ঐ সময়ে আমি কেমন যেন হইয়া গেলাম; আমার এক অদ্ভুত অবস্থা হইল; আমি এক অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চক্রাকারে ঘুরিতেছে, শত শত গ্রহ উপগ্রহের উৎপত্তি হইতেছে; তাহারা বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। অসংখ্য জীব জন্তু মায়াচক্রে পড়িয়া স্বর্গে যাইতেছে, আনন্দ করিতেছে, আবার ক্রমে ক্রমে তাহারাই ঘুরিতে ঘুরিতে শত শত ভীষণ নরককুণ্ডে আসিয়া পড়িতেছে, চীৎকার করিতেছে, দগ্ধ হইতেছে। তিন দিন তিন রাত্রি এই মায়াচক্রে কত কি যে দেখিলাম, বলিতে পারি না। এই সমস্ত দেখিয়া কখনও বা আনন্দে মুগ্ধ হইয়াছি, কখনও বা ভয়ে জড়সড় হইয়াছি। যতক্ষণ মায়াচক্র দেখিলাম, ততক্ষণ ইষ্টমন্ত্র একবারের জন্যও আমার স্মরণ হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ চতুর্থ দিনে যেমনই আমার ইষ্টনাম মনে পড়িল, মায়াচক্র অমনি অদৃশ্য হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ঘটনায় সাধুকে আমি একটি অসামান্য সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করিলাম, এবং সন্ন্যাসীর অনুগ্রহ হইলে আমার বিশেষ কল্যাণ হইবে মনে করিয়া, তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলাম। তিনিও আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে থাকিতে বারংবার বলিতে লাগিলেন। ইচ্ছামাত্রেই সন্ন্যাসী আমাকে অনায়াসে সিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, এই বিশ্বাসে আমি তাঁহার নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কয়েকদিন সেখানেই রহিলাম।

একদিন সকালে সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন—"চলো, হিঁয়া আউর নেহি রহেঙ্গে।" বলিবামাত্র আমিও সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। সন্ন্যাসী নিজের আসন গুটাইয়া অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটি বোঝা সাজাইয়া, আমার ঘাড়ে তুলিয়া দিয়া চলিলেন। আমিও তাহা লইয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কতকক্ষণ পরে

আমরা একটি প্রকাণ্ড ময়দানের নিকটে উপস্থিত হইলাম। ময়দানটি এত বড় যে, তার অপর পার ধূ ধূ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী বলিলেন যে, ময়দানটি পার হইয়া যাইতে হইবে। বেলা তখন প্রায় দশটা, সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ময়দানের উপর দিয়া চলিলাম। সঙ্গে আমাদের আর একটি লোকও নাই, ময়দানও জনমানবশূন্য, ধূ ধূ করিতেছে। সন্ন্যাসী খুব দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বিষম ভারী বোঝা ঘাড়ে লইয়া ভয়ঙ্কর রৌদ্রে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলাম। দুর্ব্বল শরীরে ঐরূপ পরিশ্রমে আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসীকে একটু ধীরে ধীরে চলিতে বলায়, তিনি বিরক্ত হইয়া খুব কর্কশ স্বরে বলিলেন—"আরে চল্।" আমি তখন ভাবিলাম, 'এ আবার কেমন সাধু? ক্লেশে আমার প্রাণ যায়, একটু দয়া হতেছে না!' আবার ভাবিলাম—'ইনি তো সিদ্ধ পুরুষ। বোধ হয় আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন।' ইহা ভাবিতেই মনে উৎসাহ আসিল, কিছুক্ষণ আবার খুব চলিলাম, পরে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন বোঝাটি কত ভারী তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহারাজ, যব্ হাম্ নেহি থে, তব্ কোন্ এত্না বোঝা লে যাতে রহে?" সাধু বলিলেন—"আরে হামারা ভূত সিদ্ধ্ হ্যায়, হামারা সব্ চিজ্ ওহি লে যাতে।" সাধুর কথা শুনিয়া আমার মাথা গরম হইল, বিষম রাগও হইল, অমনি মাথার বোঝাটি দুড়ুম্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, "শালা, ভূতের বোঝা আমার ঘাড়ে?" সাধুর অনেক জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সাধু দেখিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং কুৎসিত গালি দিতে দিতে চিম্টা তুলিয়া আমাকে মারিতে দৌড়িয়া আসিলেন। আমার তখন আবার মনে হইল, 'ইনি তো মহাপুরুষ, ইঁহার প্রহারে আমার কল্যাণই হইবে।' সুতরাং না দৌড়াইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সাধুও প্রকাণ্ড লোহার চিম্টাদ্বারা সজোরে আমাকে পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিলেন। আমার তখন মনে হইতেছিল, 'ভিতরে আমার বিষম রিপুর উত্তেজনা, সাধু দয়া করিয়া সেই রিপুগুলিকেই তাড়াইয়া দিতেছেন;' সুতরাং সাধু যেমন পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিলেন, আমিও তেমন এক, দুই, তিন, চার, করিয়া গণিতে লাগিলাম। ক্রমে ছয়টি ঘা মারিয়া সাধু যখন সপ্তম ঘা আমাকে হাঁকিলেন, তখন আমি "দূর শালা! রিপু তো ছয়টা" এই বলিয়া দৌড় মারিলাম। সাধু গালি শুনিয়া আরও রাগিয়া গেলেন; চিম্টা তুলিয়া বিষম যমদূতের মত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। 'এবার আমাকে পাইলে সাধু খুনই করিবেন' নিশ্চয় বুঝিয়া, আমি প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম। সাধু আমাকে ধরে ধরে অবস্থা দেখিয়া, প্রাণ বাঁচাইবার

অন্য উপায় না পাইয়া, সম্মুখে একটা জঙ্গলাকীর্ণ পুরাতন কূপ দেখিয়া তাহাতেই লাফাইয়া পড়িলাম। সাধু আর কি করিবেন? চলিয়া গেলেন। কূপে জল খুব অল্প ছিল, কিন্তু উঠিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া উহার মধ্যেই পড়িয়া রহিলাম। চিম্‌টার আঘাতে নানাস্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। তখন এত কষ্ট হইতেছিল যে মনে হ'ল বুঝি মারা পড়িলাম। 'এবার নিশ্চয়ই মৃত্যু' ভাবিয়া, একান্ত মনে ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিছুকাল পূর্ব্বে, কয়েকটি রাখাল ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহারা কাপড়ে কাপড় বান্ধিয়া নীচে নামিয়া অনেক চেষ্টায় আমাকে উপরে তুলিল। আমার চলিবার সামর্থ্য ছিল না বুঝিয়া, সকলে আমাকে কান্ধে তুলিয়া ময়দানের একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে রাখিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে তাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার খবর তাহারা কোথায় পাইল। একজন বলিল, "সাধুর তাড়াতে যখন তুমি দৌড়িয়া কূয়াতে লাফাইয়া পড়িলে, তখনই আমরা বহুদূরহ'তে দেখিতে পাইয়াছিলাম।" এই বলিয়া উহারা চলিয়া গেল। আমি গাছতলায় পড়িয়া রহিলাম। সাধুর প্রহারে শরীর আমার এত খারাপ হইয়াছিল যে বিষম জ্বর হইল। দুইদিন পর্য্যন্ত আমার পাশ ফিরিবার সামর্থ্য ছিল না। সমস্ত শরীরে ভয়ানক বেদনা হইয়াছিল। তৃতীয় দিনে ক্ষুধা পিপাসায় ও শরীরের যন্ত্রণায় এত অসহ্য ক্লেশ হইতে লাগিল যে, মনে হইল এবার বুঝি প্রাণই যায়। মাথা ঘুরিতে লাগিল, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া, সম্মুখের গাছটিকেই জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলাম— "হে বৃক্ষ, আমার প্রাণ যায়, এ সময়ে একটি ফল দিয়া আমাকে বাঁচাও।" এই প্রার্থনা করিয়া বারংবার বৃক্ষটিকে নমস্কার করিতে লাগিলাম। ভগবানের কি অদ্ভুত দয়া! হঠাৎ ঐ সময়ে টপ্ করিয়া একটি ফল আমার সম্মুখে পড়িল। ফলটি লাল, গোল, শ্রীফলের মত বড়, দেখিতে ঠিক মাকাল ফলের ন্যায়। আমি উহা পাইয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। একটু স্থির হইয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া উহা খাইলাম। ঐরূপ ঠাণ্ডা সুমিষ্ট ফল জীবনে আর কখনও আমি খাই নাই। ফলটি খাওয়া মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে আমার শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর হইল; শরীরটি নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ফলটি কোথা হইতে আসিল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, একটি ফল বা ফুলও বৃক্ষে নাই। গাছটি ঝাপ্‌রা, বট গাছের মত। ফলটি খাইয়া এত সুস্থ হইলাম যে, অনায়াসে তিন ক্রোশ পথ চলিয়া একটি গ্রামে পঁহু-

ছিলাম, কোন কষ্টই আমার বোধ হইল না। তার পর সেই সাধুকে আর আমি দেখিতে পাই নাই।

ঠাকুর বলিলেন—"তাকে আর দেখ্‌বে কি? সে ঐ দিনেই সমস্ত হারায়েছে। তার সিদ্ধি, শুদ্ধি সমস্ত ছুটে গেছে, এখন পাগলের মত সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দিন রাত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। এখন আর তার কিছুই নাই, সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেছে।"

এ সব শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সিদ্ধ হ'য়েও, মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় নাকি?" ঠাকুর বলিলেন—"তা হয় না? সিদ্ধ হ'লেই কি সে ধার্ম্মিক হ'ল নাকি? সিদ্ধ বল্‌তে তোমরা কি মনে কর? ভূতসিদ্ধ, প্রেতসিদ্ধ, ঐশ্বর্য্যসিদ্ধ, সিদ্ধ তো কতই আছে! ধর্ম্মের সহিত কোন প্রকার সংস্রব না রেখেও, লোকে কত বিষয়ে সিদ্ধ হচ্ছে! সিদ্ধ হ'লেই সে ধর্ম্মিক হবে, ইহা কখনও মনে ক'রো না। আজ-কাল সিদ্ধ লোকের অভাব নাই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভূতপ্রেতসিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক লোক নাই কি?" ঠাকুর—"এ সব সিদ্ধদের যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"যাঁহারা ভূতপ্রেতসিদ্ধ, তাঁহারা কি দেবদেবীর রূপও দর্শন করাইতে পারেন?" ঠাকুর—"সকলেই যে পারেন তা নয়, তবে কেহ কেহ পারেন। এবার শ্রীবৃন্দাবনে একটি সাধু এসেছিলেন, তিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাতে পার্‌তেন। তিনি ভাল লোক ছিলেন।"

প্রশ্ন—"সে কি রকম?"

প্রেতের বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ—তৎসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

ঠাকুর—"একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি আমাকে বল্লেন, 'কাল সকালে একা আপনি আস্‌বেন, আপনাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাব।' আমি পর-দিন প্রত্যূষে সাধুর কাছে গেলাম; তিনি আমাকে বস্‌তে দিয়ে সম্মুখের ঘরে দৃষ্টি রাখ্‌তে বল্লেন। আমি সেই ঘরের দিকে দৃষ্টি রেখে ব'সে রইলাম। সাধু আমার কাছে ব'সে জপ কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখি, সুন্দর

পরিষ্কার চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তিদর্শন হ'লেও তেমন একটা ভাব ভক্তির উদয় হ'ল না দেখে, সন্দেহ হ'ল। আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য ক'রে *দেখ্‌লাম, শ্রীবৎসচিহ্ন বা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি ওতে কিছুই নাই।* আমি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে নাম কর্‌তে লাগ্‌লাম। তখন ঐ মূর্ত্তি থরথর কাঁপতে লাগ্‌ল এবং বাবাজীকে বল্লে, 'তুই আমাকে কার কাছে এনেছিস্, আমি যে টিক্‌তে পারি না ;' এই ব'লে অল্পক্ষণের মধ্যেই মাটিতে প'ড়ে গিয়ে চিঁ চিঁ ক'রে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌ল। সাধু তখন অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে বল্লেন,—'ছোড়্ দিজিয়ে মহারাজ। ছোড়্ দিজিয়ে।' আমি বল্লাম—"আমি তো ধ'রে রাখি নাই।" সাধু বল্লেন, 'আপ্ যো নাম কর্‌তে হ্যাঁয়, ওহিসে বান্ধা গিয়া।' ঐ সময় দেখ্‌লাম বিষ্ণুমূর্ত্তি আর নাই, বিকটাকার এক প্রেত মাটিতে প'ড়ে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। আমি তখন ঐ সাধুকে খুব ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'তোমারা কাণমে বিষ্ঠা কাহে রাখা হ্যায়? তোম্ প্রেতসিদ্ধ হো?' সাধু বলিলেন—'হাঁ, মহারাজ। আপ্ ভগবদ্ভক্ত হ্যায়, হামারা মালুম নেহি থে। হামারা প্রেত ভগবদ্ভক্তকি সাম্‌নেমে ঠাহার্‌ণে নেহি সেক্‌তে।' আমি তাকে বল্লাম—"বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাও ব'লে লোকের নিকট হ'তে প্রতারণা ক'রে তুমি টাকা পয়সা আদায় কর কেন?' সাধু বল্লেন—'আপনি অনুসন্ধান কর্‌লে জান্‌তে পার্‌বেন যে সকলকে আমি এ মূর্ত্তি দেখাই না। যেসকল লোকের অর্থ মদ, বেশ্যা ও নানাপ্রকার বিলাসিতায় নষ্ট হয়, এই মূর্ত্তি দেখায়ে কেবল তাদের নিকট হ'তে প্রচুর অর্থ আদায় ক'রে থাকি ; কিন্তু ঐ অর্থ হ'তে একটি পয়সাও আমি নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করি না। আমার যাহা কিছু আবশ্যক, ভিক্ষা দ্বারাই সংগ্রহ করি। যেসকল স্থানে জলাভাব, ঐ অর্থ দ্বারা সেখানে পুকুর বা ইন্দারা কাটায়ে দিই, দুর্গমস্থলে রাস্তা প্রস্তুত করাই ও দুঃখী দরিদ্রদের যথা-সাধ্য সাহায্য করি। আপনি আর একে কষ্ট দিবেন না, ছেড়ে দিন্।' আমি তখন চ'লে এলাম। আস্‌বার সময় সাধু খুব কাতর হ'য়ে আমাকে বল্লেন, 'যতদিন আপনি শ্রীবৃন্দাবনে থাক্‌বেন কাহাকেও আমার প্রেতসিদ্ধির

কথা বল্‌বেন না।' সাধুর কথামত, যত কাল শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম কাকেও এ বিষয় বলি নাই, আজই তোমাদের নিকট বল্লাম। এই সাধু ভাল লোক ছিলেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—ভূত প্রেতও যখন বিষ্ণুমূর্ত্তি বা দেবদেবীর রূপ ধারণ ক'রে দর্শন দিতে পারে, তখন প্রকৃত রূপ এবং কপট রূপ বুঝ্‌তে পারব কি উপায়ে?

ঠাকুর বলিলেন—"ঐ রূপের প্রতি দৃষ্টি স্থির রেখে, খুব তেজের সহিত নাম কর্‌তে থাক্‌লেই কপট রূপ কখনও টিঁক্‌বে না, অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। যথার্থ কোনও দেবদেবীর দর্শনমাত্রেই ঐ দেবদেবীর ভাব প্রাণে উদয় হবে। নাম কর্‌তে কর্‌তে ঐ রূপটি আরও উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—উজ্জ্বল পরিষ্কার রূপ তো প্রথম প্রথম প্রেতেরও দর্শন হয়েছিল, বলিলেন। যথার্থ রূপ ও কপট রূপের আকৃতিতে কি কোন রূপ বৈলক্ষণ্য থাকে না?

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তাও থাকে। ভূতপ্রেতাদি দেবদেবীর আকার ধারণ কর্‌তে পার্‌লেও ঐ সকল দেবদেবীর চিহ্ন ধারণ কর্‌তে পারে না। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এ সকল যেমন বিষ্ণুর চিহ্ন, সেইরূপ সকল দেবদেবীরই বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে। যখনই যে দেবদেবীর দর্শন হবে, লক্ষণগুলি তখনই মিলায়ে নিতে হয়। ঐ সময় খুব নাম কর্‌তে হয়; নাম কর্‌লে সমস্তই ধরা পড়ে। সতীশ নাম না ক'রেই তো গোলে প'ড়েছিল। নাম কর্‌তেই মায়াচক্র অদৃশ্য হ'লো, শুন্‌লে তো?"

জিজ্ঞাসা করিলাম—শঙ্খ চক্র বা এরূপ কোন বিশেষ চিহ্ন তো সদ্‌গুরুর নাই; সুতরাং ভূত প্রেত সদ্‌গুরুর রূপ ধ'রে এলে, কি প্রকারে তাহা বুঝ্‌তে পারব?

ঠাকুর বলিলেন—"ভূত প্রেত কি, দেবদেবী ঋষি মুনিরাও সদ্‌গুরুর রূপ ধারণ কর্‌তে পারেন না। সদ্‌গুরুর রূপ দর্শন হ'লে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ক'রো না।"

গৈরিক ত্যাগ করিতে বলায়, ঠাকুরের সহিত সতীশের ঝগড়া।

সতীশ মায়াচক্রীর হাতহইতে রক্ষা পাইয়া অচিরে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

১০ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল, বুধবার। সে সময়ে পাগ্‌লা সতীশের সঙ্গে ঠাকুরের যেরূপ কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, আজ ঠাকুর তাহা তুলিয়া শ্রীধরের সঙ্গে আমোদ করিতে লাগিলেন।

পরিধানে ছেঁড়া গৈরিক বসন—হাতে লম্বা বাঁশের দণ্ড, চেহারা অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ, সতীশ ঠাকুরের নিকট দাউজীর মন্দিরে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। বিশ্রামান্তে একটু সুস্থ হইলে ঠাকুর সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"**সতীশ! তুমি গৈরিক নিয়েছ কেন? বীর্য্যধারণ না হ'লে গৈরিক নিতে নাই; শাস্ত্রে নিষেধ আছে; তুমি গৈরিক ছাড়।**"

সতীশ বলিল—"আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, গৈরিক ও দণ্ড আমার সন্ন্যাসের চিহ্ন, ইহা ছাড়্‌ব কেন?" শ্রীধর তখন বলিলেন, "সতীশ! গুরুবাক্য অগ্রাহ্য করিস্ না, ভয়ানক অপরাধ।"

সতীশ মাথা ঝাড়া দিয়া হাত নাড়িয়া খুব তেজের সহিত বলিল, "যাঃ যাঃ যাঃ বেটা। গুরু! গুরু কে? গুরু তো পরমহংসজী। দীক্ষার সময় উনি তো বলেছিলেন—**পরমহংসজী দীক্ষা দিচ্ছেন?** উনিও পরমহংসের শিষ্য, আমিও পরমহংসের শিষ্য। উনি তো আমার গুরুভাই। সাধুসঙ্গ কর্‌তে এসেছি।"

ঠাকুর বলিলেন—"**তুমি গৈরিক নিয়ে আমার কাছে তো থাক্‌তে পাবে না, অন্যত্র গিয়ে থাক।**"

সতীশ বলিল—"আজ তো আমি আপনার অতিথি।"

ঠাকুর বলিলেন—"**অতিথিরূপে এসেছ? তা হ'লে তোমাকে আর কিছুই বল্‌বার নাই—আজ তবে এখানেই থাক।**"—এই বলিয়া ঠাকুর সতীশের আদর যত্ন করিতে আমাদিগকে আদেশ করিলেন। দিন রাত সতীশ আমাদের উপর হুকুম চালাইয়া ও খুব স্ফূর্ত্তি করিয়া কাটাইল। পরদিন সকালে ঠাকুর সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন—"**সতীশ! এক তিথির অধিক সময় অতিথির তো থাক্‌বার নিয়ম নাই, এখন তুমি অন্যত্র যাও।**" পাগ্‌লা সতীশ খুব চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"তা কেন? শাস্ত্রে আছে, এক রাত্রি কারো সঙ্গে বাস কর্‌লেই, সে বান্ধব হয়। সুতরাং আপনি এখন তো আমার বান্ধব হইয়াছেন, বান্ধবশূন্য হইয়া কারো কোথাও থাকা উচিত নয়। এখন আর অন্যত্র যাইব না।" এই বলিয়া সতীশ আপন আসনে আরো আঁটিয়া বসিল। সতীশকে গৈরিক ত্যাগ করিতে ঠাকুর বিস্তর বলিলেন। কিন্তু সতীশ কিছুতেই উহা ত্যাগ করিল না। শ্রীবৃন্দাবনে পাগ্‌লা সতীশকে লইয়া এবং শ্রীধরের পাগ্‌লামী লইয়া ঠাকুর অনেক সময় আনন্দ করিতেন। ঠাকুর যাহাদের সঙ্গে,

এবং দশজনার নিকটে যাহাদের কথা প্রসঙ্গে এরূপ আমোদ করেন, সেই সতীশ ও শ্রীধরই ধন্য!

ঠাকুরের প্রতি শ্রীধরের * আকর্ষণ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীধর মাথা গরম হইলে সময়ে সময়ে বিষম পাগলামী করিতেন। এক দিন সামান্য বিষয় লইয়া গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামিনী বাবুর সহিত ভয়ানক ঝগড়া বাধিল।

---

* শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গার সন্নিকট সদরদি গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া কিছুকাল ইনি পুলিশের চাকরী করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ন্যায়পরতা ও কার্য্য-দক্ষতা গুণে ইনি সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতেই জীবনে ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য শ্রীধরের অসাধারণ উৎকণ্ঠা ছিল। ক্রমে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মদের সঙ্গ লাভ করিয়া ইঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবল অনুরাগ জন্মে। অচিরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যহ নিয়মিত রূপে আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকালের মধ্যেই ভগবৎকৃপায় শ্রীধরের কয়েকটি অলৌকিক উপলব্ধিও প্রত্যক্ষদর্শন লাভ হইল। শ্রীধর তাহাতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। মহতের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কোন অবস্থাই স্থায়ী হইবে না বুঝিয়া, শ্রীধর সদ্গুরুর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন; এবং অল্প সময়ের মধ্যে ৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আমি সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় এখানে এসেছি—আপনি দয়া ক'রে আমাকে দীক্ষা দিন্।" পরমহংসজী বলিলেন—"সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা নিতে হ'লে, সেই বিজয়ের কাছে যা। * * * *।" শ্রীধর, আর ওখানে অপেক্ষা না করিয়া এবং করসঙ্কেতে ইঙ্গিত পাইয়া, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে প্রচারকনিবাসে ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দীক্ষা লাভ করিলেন।

দীক্ষাগ্রহণের পর শ্রীধর ঠাকুরের সঙ্গছাড়া প্রায় কখনও হন নাই। শ্রীধরের ন্যায় সোজা চাল চলন ও স্বাভাবিক সরলতার দৃষ্টান্ত লোকসমাজে অতি বিরল। উঁহার প্রগাঢ় ভজনানুরাগ এবং অসাধারণ গুরুনিষ্ঠা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীধরের আনন্দ উৎসাহ একেবারেই নিবিয়া গেল। যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন, দীর্ঘনিশ্বাসই উঁহার নিত্য সহচর ছিল। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্রীধর, দিন কি ভাবে কাটাও?" শ্রীধর বলিলেন, "ভাই! সকাল বেলা থেকে ভাব্তে থাকি কতক্ষণে সন্ধ্যা হবে, আবার সন্ধ্যা হ'লে ভাবি কতক্ষণে সকাল হবে—এই ভাবেই দিন যাইতেছে।"

১৩০৯ সালে, শ্রীধর কিছুকাল কলিকাতা বাদুড় বাগানে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মৈত্র মহাশয়ের বাসায় ছিলেন। ১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ত্রয়োদশী তিথিতে অকস্মাৎ জ্বরে পড়িয়া রাত্রি দশটার পর শ্রীধর কয়েকটি গুরু-ভ্রাতাকে ডাকিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন—"ওহে, তোমরা আমার নিকটে এসো, আজ আমি দেহত্যাগ কর্ব্বো।" জ্বরের জ্বালায় মাথা গরম হইয়া শ্রীধর ঐ সব বলিতেছেন ভাবিয়া, গুরুভ্রাতারা কেহ তাঁহার কথা

শ্রীধর মাথা গরমে কোনও কোনও বার পনের দিন পর্য্যন্ত কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য থাকিতেন। কামিনী বাবু শ্রীধরকে ঐ সময়ে ভয় দেখাইয়া বলিলেন—'সাবধান হও, ঝগড়া কর্‌লে মার খাবে।" শ্রীধর ঐ কথা শুনিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া বড় রাস্তায় যাইয়া এক পুলিশের লোকের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং খুব ব্যস্ততার সহিত চীৎকার করিয়া পুলিশকে বলিলেন—"বাঙ্গালা মুল্লুক হ'তে এক ভয়ঙ্কর ডাকাত আসিয়া আমাদের কুঞ্জে রহিয়াছে, সে আমাকে খুন কর্ত্তে চায়—শীঘ্র তাকে ধর, না হ'লে এখনই আমাদের মেরে কেটে একাকার কর্‌বে।" পুলিশ শ্রীধরের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কুঞ্জে আসিল। কামিনী বাবুকে দেখাইয়া তখন শ্রীধর বলিল—"ইস্কো পাকড়ো।" এই সময় আর আর যাঁহারা ছিলেন, শ্রীধরকে পাগল বুঝাইয়া, পুলিশকে বিদায় করিলেন। ঠাকুর এই ব্যাপার শুনিয়া শ্রীধরকে খুব ধমকাইয়া বলিলেন—"শ্রীধর! এখনই যেয়ে কামিনী বাবুর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাও, না হ'লে এস্থানহ'তে এ মুহূর্ত্তেই চলে যাও।"

শ্রীধর বলিল—"মার্‌তে যে চায় তার দোষ হলো না! সে ডাকাত নয়! ডাকাতকে পুলিশের হাতে দেওয়াই অপরাধ হ'ল! এজন্য আবার ক্ষমা! আমি ডাকাতের নিকট কিছুতেই ক্ষমা চাইব না।"

ঠাকুর শ্রীধরকে শাসন করিয়া বলিলেন—"এখনি তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও, এক্ষণি যাও।"

শ্রীধরও 'এমন সঙ্গে আর কখনও থাক্‌ব না—এখনি যাইতেছি' বলিয়া, তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া কুঞ্জহইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া শ্রীধর কান্দিতে কান্দিতে কাতর হইয়া ফিরিলেন ও ঠাকুরের পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন।

গ্রাহ্য করিলেন না। ভোর বেলা সকলে শ্রীধরের অসুখের খবর লইতে গিয়া দেখিলেন, শ্রীধর বিছানা হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া উল্টাভাবে, মাথার দিকে পা এবং পায়ের দিকে মাথা রাখিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া রহিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া, কোন সাড়া না পাওয়াতে সকলেরই মনে সন্দেহ জন্মিল এবং স্পর্শ ও ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল, শ্রীধর চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সরল ভাবে ভূমিসংলগ্ন ললাট এবং সম্মুখের দিকে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় সুপ্রসারিত দেখিয়া ঐ সময় সকলেরই এরূপ ধারণা হইল যে তিনি কাহারও দর্শন পাইয়া তাঁহাকে যথারীতি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহার পবিত্র দেহ সুসজ্জিত করিয়া নিমতলার ঘাটে লইয়া গিয়া অগ্নিসংস্কার করিলেন। শ্রীধর অপুত্রক ছিলেন, নানা স্থানের গণ্য-মান্য গুরুভ্রাতারা সমবেত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবে ১১ই মাঘ রবিবার শ্রীধরের পারলৌকিক ক্রিয়া সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। শ্রীধরের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলি আমার পূর্ব্বাপর ডায়েরীতে লিখিত রহিয়াছে।

ঠাকুর বলিলেন—“শ্রীধর, গিয়েছিলে তো আবার এলে কেন?”

শ্রীধর হাউ হাউ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন—“কি কর্ব্বো? ছেড়ে যে থাক্‌তে পারি না।” ঠাকুর শ্রীধরের কথা শুনিয়া ছল ছল চক্ষে শ্রীধরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—“তবে যাও, গিয়ে ক্ষমা চাও।” শ্রীধর যাইয়া অমনি কামিনী বাবুর পায়ে পড়িলেন ও ক্ষমা চাহিলেন। ধন্য শ্রীধর! অদ্ভুত তোমার গুরুপ্রেম! অদ্ভুত তোমার গুরুর প্রতি আকর্ষণ!

ঠাকুরের উপর সতীশ ও শ্রীধর উভয়েরই অসাধারণ ভালবাসা, প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল; তাই ইহারা সময়ে সময়ে ঠাকুরের সহিত ঝগড়া করিত এবং মনোগত না হইলে ঠাকুরের কথায় প্রতিবাদ বা বিপরীত কার্য্য করিতেও কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করিত না। শ্রীধর ও সতীশের এইরূপ বাহ্য অবাধ্যতা, যে ঠাকুরের প্রতি উঁহাদের অসামান্য অনুরাগেরই নিদর্শন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরশুরামের প্রতি মাধবের কৃপা।

বৈশাখ, ১১ই—১৫ই, এপ্রিল, ২৩শে—২৭শে।

সম্প্রতি গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে পরশুরাম আসিয়াছেন। ঠাকুর অনেক সময়ে পরশুরামের কথা বলিয়া থাকেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে এই পরশুরামের কথা যেমন শুনিলাম, লিখিয়া রাখিতেছি। পরশুরাম ধামরাই গ্রামের এক জন বেশ অবস্থাপন্ন তাঁতী ছিলেন; তেজারতী কারবারাদিতে গ্রামে দশজনের উপরে বেশ আধিপত্য করিয়া আসিতেছিলেন। আটটি পুত্রসন্তান—সকলেই উপযুক্ত, বিষয়-কার্য্যে দক্ষ এবং উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন। ছয়টি কন্যাও ভাল ঘরে সৎপাত্রে পরিণীতা হইয়াছিলেন। সুখে স্বচ্ছন্দে পরশুরাম দিন কাটাইতেছিলেন। অকস্মাৎ দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। অল্প সময়ের মধ্যে দেখিতে দেখিতে আটটি পুত্রই একে একে দেহত্যাগ করিলেন। কিয়ৎ কাল পরে পাঁচটি কন্যারও মৃত্যু হইল। একটিমাত্র যুবতী কন্যা বাঁচিয়া রহিলেন; তিনিও দুরদৃষ্টক্রমে বিধবা হইলেন। পরশুরাম কান্দিতে কান্দিতে অন্ধ হইলেন। অতিবৃদ্ধ পতিকে ত্যাগ করিয়া, শোকসন্তপ্তা স্ত্রীও ইহলোক হইতে বিদায় নিলেন। বিধবা একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত, পরশুরামের সংসারে আর কেহই রহিল না।

পিতার দুরবস্থা দেখিয়া বিধবা কন্যাটি পরশুরামের নিকটে আসিলেন এবং প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই সময় গ্রামের দশটি লোক, যাঁহারা পরশুরামের নিকট ঋণগ্রস্ত ছিলেন, সকলেই অনুমান করিলেন পরশুরাম অবিলম্বে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া কন্যাকে দিয়া যাইবেন। পাপিষ্ঠ দেনাদারেরা একজোট হইয়া অসহায়া কন্যাটির উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং বিষম কৌশল সৃষ্টি করিয়া অকালে বৃদ্ধ অন্ধের একমাত্র অবলম্বন বাল-বিধবাটির প্রাণ নষ্ট করিল। কন্যার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পাষণ্ডগণ, এক দিন রাত্রিতে পরশুরামের গৃহে প্রবেশ করিয়া সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া, কাগজপত্র যাহা কিছু ছিল লুটপাট্ করিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধ অন্ধ শূন্য ঘরে পড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। গ্রামের একটি সামান্য অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ, পরশুরামের দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়া করিয়া, তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু গ্রামের ঐ দুর্ব্বৃত্তদের তাহা সহ্য হইল না। তাহারা সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিল—'নির্ব্বংশে লোককে বাড়ীতে নিয়ে স্থান দিয়েছ, শীঘ্রই তুমিও নির্ব্বংশ হবে; তোমার সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রব রাখিলে আমাদেরও বংশ থাকিবে না। এখনই তোমার বাড়ী থেকে ওকে তাড়ায়ে দেও, না হ'লে সবাই মিলে তোমাকে একঘরে কর্‌ব।' ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া পরশুরামকে সকল অবস্থা জানাইলেন; পরশুরাম শুনিয়া বলিলেন—'আমাকে স্থান দিলে আপনি বিপন্ন হইবেন; শীঘ্র আমাকে মাধবের মন্দিরে রাখিয়া আসুন।' পরশুরামের জেদ দেখিয়া, ব্রাহ্মণ অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতা শ্রীশ্রীমাধবের বাড়ীতেই রাখিয়া আসিলেন। মাধবজীকে যিনি যাহা ভোগ দিতেন, দয়া করিয়া পরশুরামকে প্রসাদের কিছু অংশ প্রদান করিতেন। পরশুরাম তাহাই মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। পরশুরামের সকল দিকই শূন্য হইয়াছে; এখন আর কি লইয়া থাকিবেন? দিবারাত্র কেবল 'মাধব মাধব' নামই জপ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই অন্ধ পরশুরামের প্রতি দয়াল মাধবের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। এক দিন মাধব পরশুরামকে বলিলেন—"পরশুরাম, আমাকে তুমি দেখ্‌বে?" পরশুরাম বলিলেন—"ঠাকুর, আমি যে অন্ধ।" মাধব বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি একবার আমার দিকে তাকাও না?" পরশুরাম মাথা তুলিয়া মাধবের দিকে চাহিতেই দয়াল মাধবের অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেইদিনহইতেই আশ্চর্য্যভাবে উঁহার বাহ্য দৃষ্টিশক্তিও খুলিয়া গেল। পরশুরাম আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া দিনরাত দয়াল মাধবের নামে বিভোর!

এখন প্রায় সর্ব্বদাই মাধবের দর্শন পান। সকালে বিকালে প্রত্যহ প্রতিঘরে যাইয়া মাধবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গ্রামের সকলেই এখন উঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সম্মান করেন। এখন আর পরশুরামের কেহই শত্রু নাই, পূর্ব্ব শত্রুগণও এখন পরশুরামের কৃপা-ভিখারী এবং একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। এই পরশুরাম এখন আমাদের গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি আমাদের ঠাকুরকে 'মাধব' বলিয়াই ডাকেন; যখন তখন 'মাধব', 'আমার দয়াল মাধব' বলিয়া স্তব স্তুতি করেন। পরশুরামের অবস্থা দেখিয়া আশ্রমস্থ সকলেই অবাক্ হইয়া যাইতেছেন।

এক সময়ে পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরশুরাম, এখানে এলে কেন?" পরশুরাম বলিলেন—"আজ্ঞা, জান্‌তে পার্‌লাম, মাধব গেণ্ডারিয়ায় আছেন।"

প্রশ্ন।—"তুমি বুড়ো মানুষ, রাস্তা চিনে এলে কিরূপে?"

পরশুরাম বলিলেন—"আমি তো আশ্রম চিনি না; ঢাকাতে আস্‌লাম। একটি কালো মেয়ে, ১৪।১৫ বৎসর বয়স, আমাকে বলিল—'তুমি গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে যাও তো আমার সঙ্গে এস।' আশ্রমের কাছে এসে আমাকে বলিল, 'এই আশ্রম, যাও।' তার পর আর সেই মেয়েটিকে দেখ্‌তে পেলাম না। তখন সকলই বুঝিলাম। সে তো আর মেয়ে নয়। আমি আশ্রমে এসে দেখি—আমার 'মাধব' এখানে।"

পরশুরামের বয়স আশির উপরে। তিনি সর্ব্বদাই মাধবের নামে দিশাহারা। শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় আহারের সময়ে পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পরশুরাম, ডাল কেমন লাগে?"

পরশুরাম চমকিয়া অমনি বলিলেন—"আজ্ঞা হ! যা কইলেন, কিষ্টনাম বড় মিঠা।" পরশুরামের অনেক কথায়ই এইপ্রকার আত্মহারা ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পরশুরাম সর্ব্বদাই সকলের নিকট বলিয়া থাকেন—"মাধব আমার বড় দয়াল। তিনি আমার ছেলে মেয়ে সমস্ত জঞ্জাল নিয়া তাঁর দুর্লভ চরণ আমাকে দিয়াছেন। এত দয়া মাধব না করলে আমার কি সাধ্য ছিল মাধবের নাম লই?" পরশুরাম এসব কথা বলিতে বলিতে কান্দিয়া অস্থির হন, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। 'মাধব আমার বড় দয়াল,' পুনঃপুনঃ এই কথাই তিনি বলিতে থাকেন।

পরশুরামের সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রশংসাবাদে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ সংশয় জন্মিয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, 'ঠাকুর তো প্রায় সকলেরই এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইঁহার সম্বন্ধেও বোধ হয় তাহাই হইবে।'

সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি আমতলায় ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছেন, কীর্ত্তন হইতেছে—ইতিমধ্যে পরশুরাম তাঁহার কাণে তিন বার "গুরু সত্য", "গুরু সত্য", "গুরু সত্য" এই কথা বলিয়া পিঠে কয়েকটি চাপড় মারিলেন। ঐ সময়ে কুঞ্জ বাবু অকস্মাৎ কেমন হইয়া গেলেন। তাঁহার ভিতরে এক অদ্ভুত শক্তির খেলা হইতে লাগিল। তিনি হাত পা আছড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ঠাকুর যখন ধামরাই গিয়াছিলেন, তখন পরশুরামের সহিত মাধবের মন্দিরে তাঁহার দেখা হয়। পরশুরাম ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, "আমি যেন মাধবের দর্শন পাই।" ঠাকুর তখন বলিলেন, "**আপনি ত মাধবের দর্শন পেয়ে থাকেন, তিনি ত আপনার নিকটেই রয়েছেন।**" তাহাতে পরশুরাম বলিলেন—"এই মাধব নয়, ইঁহার ভিতরে যে আর এক মাধব আছেন, তাকে নিয়ত দেখ্‌তে চাই, তিনি মধ্যে মধ্যে উঁকি দিয়ে থাকেন।"

স্বপ্ন প্রারব্ধ এবং বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

বৈশাখ, ১৬ই হইতে ৩১শে।

আজ কাল অরুণোদয়ে স্নান করিয়া আসি। আসনে বসিয়া স্থিরভাবে একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিয়া হোম করিয়া থাকি। পরে প্রাণায়াম কুম্ভকের সহিত কিছুক্ষণ নাম জপ করিয়া গীতা এক অধ্যায় পাঠ করি। তৎপরে ১১ টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকট যাইয়া বসিয়া থাকি। ঠাকুর এগারটার সময় শৌচে যান। শ্রীধর ঐ সময়ে কূয়াহইতে জল তুলিয়া, লেঙ্গটি ও বহির্ব্বাস লইয়া ঠাকুরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকেন। ঠাকুর পায়খানা হইতে আসিয়া গা ধুইয়া আসনে গিয়া বসেন। আহার বারটার মধ্যেই শেষ হয়। আহারের পর আসন আমতলায় লইয়া যাই। ঠাকুর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমতলায়ই বসিয়া থাকেন। ঠাকুর আমতলায় বসিলে পর, দুই ঘণ্টা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পাঠ করি; পাঠ শেষ হইলে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটেই বসিয়া থাকি এবং অবসর বুঝিয়া সময়ে সময়ে নানা সংশয়যুক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করি। এক দিন কথায় কথায় ঠাকুরকে আমার কয়েকটি স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলাম।

ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন—"**সকল স্বপ্নই অলীক নয়। অতীত জীবনের চিত্র অনেক সময় স্বপ্নে দেখা যায়। ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনারও কখন কখন স্বপ্নে আভাস পাওয়া যায়। মাথা বা পেট গরম হ'লেও অনেক সময়ে এলো মেলো স্বপ্ন দেখা যায়। যে সকল স্বপ্ন দেখ্‌ছ, তার কতকগুলি জীবনে পরিণত হচ্ছে, আর কয়েকটি**

ভবিষ্যতে বুঝ্‌বে।" এই বলিয়া ঠাকুর একটু থামিলেন। ভাগলপুরে ১২৯৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে অর্দ্ধতন্দ্রাবস্থায় যে দৃশ্য বা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা ঠাকুরকে বলিলাম, শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন—"প্রকৃতিকে তৃপ্ত কর্‌তে হবে। প্রকৃতিই এসে তোমাকে ঐরূপ বলেছিলেন। দুই উপায়েই প্রকৃতির তৃপ্তি সাধন করা যায়। এক বৈধ ভোগ-দ্বারা, আর এক সাধনদ্বারা। সাধনদ্বারাই তোমাকে প্রকৃতির তৃপ্তিসাধন কর্‌তে হবে। তোমার পক্ষে সাধনই একমাত্র উপায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর মানুষ যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা কি শুধু পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রারব্ধের প্রভাবে না, স্বাধীন ইচ্ছায়? আর এইরূপ আশ্রিত ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়া নূতন কর্ম্মফলের সৃষ্টি করিতে পারেন কিনা?

ঠাকুর বলিলেন—"বাস্তবিক সদ্‌গুরুর আশ্রয় একবার নিলে মানুষ কখনই আর নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি কর্‌তে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের ভোগই মাত্র কর্‌তে থাকে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে মানুষ দুষ্কর্ম্ম কর্‌তে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল দুষ্কর্ম্মে কখনই আবদ্ধ থাক্‌তে পারে না। দুষ্কর্ম্ম কর্‌বার সময়ে, সেটা দুষ্কর্ম্ম ব'লে বুঝ্‌তে পারে এবং তা থেকে বিরত থাক্‌তে একটা চেষ্টাও ভিতরে ভিতরে থাকে। শুধু প্রারব্ধেই যেন বাধ্য করিয়া ঐ সব কর্ম্ম করায়ে নেয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে যে নূতন কর্ম্ম কর্‌তে পারে না—এও তার একটি প্রমাণ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভোগ কার হয়? আর এই ভোগের শেষই বা কোন্ সময়ে, কিসে হ'য়ে থাকে?"

ঠাকুর বলিলেন—সংস্কারবশতঃ ভোগটি দেহেরই হ'য়ে থাকে। শরীরটি যখন মানুষের একেবারে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়, তখনই ভোগের শেষ হ'য়ে থাকে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ মানুষ কি উপায়ে লাভ করিতে পারে?"

ঠাকুর বলিলেন—"বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ এক নামসাধন দ্বারাই লাভ হ'য়ে থাকে। শ্বাসেপ্রশ্বাসে নাম কর্‌লেই দেহটি সাত্ত্বিক হ'য়ে যাবে। দেখ, শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারাই দেহ রক্ষিত হতেছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য দেহের প্রতি পরমাণুতে হতেছে। রক্ত শ্বাসপ্রশ্বাসেই বিশুদ্ধ হতেছে, এবং দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হতেছে। এক কথায়, দেহের ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতি শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারাই চল্‌ছে। এই শ্বাস

প্রশ্বাসের সঙ্গে নামটি যখন গেঁথে যাবে, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসেই যখন আপনা আপনি নাম চল্‌তে থাক্‌বে, তখন যেমনি শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য সমস্ত দেহে হবে, তেমনি নামের কার্য্যও প্রতি পরমাণুতে হবে। নামটি শ্বাসপ্রশ্বাসে মিলিত হ'য়ে গেলে, ক্রমে দেহটিও নামময় হ'য়ে যাবে। দেহ নামময় হ'লে উহাদ্বারা আর অন্য কার্য্য হওয়া সম্ভব হবে না। শুধু সাত্ত্বিক কর্ম্মই হবে। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম কর। চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে সমস্তই সহজ হ'য়ে আসে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্বাসপ্রশ্বাসে যাহাদের নাম অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহাদের শরীরে কি বিশেষ কোনও চিহ্ন প্রকাশ পায়? যদি কেহ বলে যে আমার শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম হয়, তার বাহিরের কোন্ লক্ষণ দ্বারা উহা সত্য বলিয়া বুঝিব?"

ঠাকুর বলিলেন—"মুখে বল্‌লেই ত আর হবে না। শরীরেও যে তাদের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাবে। শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম গেঁথে গেলে শরীরের চর্ম্মের উপরে এইপ্রকার চিহ্ন পড়বে। লক্ষ্য কর্‌লেই দেখতে পাবে।"

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের অঙ্গুলির পৃষ্ঠভাগে একপ্রকার চক্রাকার চিহ্ন দেখাইলেন। দুই হাতেরই সমস্ত অঙ্গুলির পৃষ্ঠে ঐ প্রকার কোঁকড়া কোঁকড়া ওঙ্কারবং চিহ্ন দেখিয়া অবাক্ হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"অস্থি মাংস রক্তে যখন নাম হইতে থাকে তখন ঐ সকলে কি নামের ছাপ পড়ে?"

ঠাকুর বলিলেন—বৃক্ষের শিরায় নামের স্বাভাবিক ছাপ তো শ্রীবৃন্দাবনে চক্ষে দেখে এসেছ। মানুষের শরীরের প্রতিপরমাণুতে যখন নাম হ'তে থাকে, তখন অস্থি, মাংস, রক্তেও নামের ছাপ প'ড়ে যায়। মুসলমান্‌দের ধর্ম্মগ্রন্থে একটি ফকির সম্বন্ধে লেখা আছে যে, যখন তাঁহার রক্তপাত হ'ল, প্রত্যেক ফোঁটা রক্তে "আয়েনুল্ হক্" এই শব্দ অঙ্কিত রয়েছে দেখ্‌তে পাওয়া গেল। এবার অর্দ্ধকুম্ভসময়ে ৺শ্রীবৃন্দাবনে, যমুনার চড়াতে এক দিন সাধুদের দর্শন কর্‌তে গিয়েছিলাম, বালির উপরে একখানা হাড় দেখে তুলে নিলাম, দেখ্‌লাম সমস্ত হাড়খানিতে দেবনাগর অক্ষরে "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ" লেখা রয়েছে। হাড়খানা আমি সাধুদের দেখালাম, তাঁহারা খুব আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন। কোনও

বৈষ্ণব মহাপুরুষের অস্থি স্থির ক'রে তাঁরা সেখানি নিলেন এবং খুব সমারোহের সহিত মহোৎসব ক'রে যমুনার চড়াতেই উহা সমাধিস্থ কর্‌লেন।"

এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ পরে শ্রীধর ও সতীশের নিকটে বিষয়টির আগাগোড়া জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, ৺শ্রীবৃন্দাবনে অর্দ্ধকুম্ভমেলায় যমুনার চড়ায় বহুসংখ্যক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও সাধুরা আসন করিয়াছিলেন। একদিন সকালে ঠাকুর অকস্মাৎ আসনহইতে উঠিয়া আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, যমুনার চড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুদের নিকটে না যাইয়া, না বসিয়া, সোজা চড়ার উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। একস্থানে পঁহুছিয়া অল্প বালির ভিতর হইতে একখানা অস্থি বাহির করিয়া লইয়া বলিলেন—"দেখ, কোনও মহাপুরুষের অস্থি, 'হরেকৃষ্ণ' নাম লেখা রহিয়াছে। ঠাকুর অস্থিখানি আনিয়া সাধুদের দেখাইলেন। সাধু সন্ন্যাসীরা অস্থিখানি "হরেকৃষ্ণ" নামে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিকটহইতে ঐ অস্থিখানি চাহিয়া লইয়া, খুব আনন্দের সহিত সমস্ত সাধুরা মিলিয়া, সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব করিয়া, মহা সমারোহে কেশীঘাটের সন্নিকটে যমুনার চড়ায় সমাধিস্থ করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে আমি শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে থাকিতে না পারায় তৎসাময়িক অনেক ঘটনাই আমার জানা নাই। ঠাকুর সময়ে সময়ে কথাপ্রসঙ্গে কোনও ঘটনার উল্লেখ করিলে, তাহা যেমন শুনি লিখিয়া রাখি। অতি সংক্ষেপে ঠাকুর যাহা বলিয়া যান, তাহা পরিষ্কার রূপে জানিতে শ্রীধর, সতীশ প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবনাবস্থান সময়ের অনেক অদ্ভুত ব্যাপার এখন শুনিতেছি।

ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদাই বিনয়ী।

আজ ঠাকুর কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। আমি ঐ সময়ে অনুপস্থিত থাকাতে ছোট দাদা (শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) আমার ডায়েরীতে উহা তুলিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ প্রশ্নের উপরে এই সকল উপদেশ, তাহা আমি জানি না। লেখা যেমন পাইলাম তেমনই তুলিয়া রাখিলাম।

ঠাকুর।—**"ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রপথ ধ'রে সর্ব্বদাই চল্‌তে হবে। যদি কোন সাধুবাক্য ঋষিবাক্য থেকে অন্য প্রকার হয়, তবে ঋষিবাক্যই গ্রহণ কর্‌তে হবে।**

লোভ-মোহ-ইন্দ্রিয়-দমনাদি নিয়মগুলির উপরে সর্ব্বত্রই দৃষ্টি রাখ্‌বে। না হ'লে সাধনে বিস্তর অনিষ্ট হবে। যে সকল নিয়ম পদ্ধতির উপরে মনুষ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত র'য়েছে, তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম কখনও করা উচিত নয়। কোনও প্রাণীর, এমন কি, উদ্ভিদেরও, কষ্টের কারণ হবে না। হরিদাসকে সকলের সঙ্গে একত্র ভোজন করতে মহাপ্রভু কত অনুরোধ ক'রেছেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তা করেন নাই। বরং নিজেকে অত্যন্ত নীচু মনে ক'রে সর্ব্বদা তফাৎ তফাৎ থাক্‌তেন। রূপ সনাতন যদিও ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন, তথাপি সমাজের ও সকলের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চল্‌তেন। কখনও সাধারণের সঙ্গে একত্র ভোজনাদি করেন নাই। প্রকৃত ধার্ম্মিক কিনা, স্বভাব দিয়েই ধরা যায়। ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদাই বিনয়ী।"

দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর একটি গল্প বলিলেন—"একদিন পোপ্ দেখ্‌লেন বহু লোক একটি স্ত্রীলোকের কাছে যাচ্ছেন। ঐ স্ত্রীলোকটির উপর খৃষ্ট আবির্ভূত হয়েছেন, এইরূপ প্রচার। পোপ্ বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন। পোপ্‌কে তাঁহার কার্ডিনেল্ বল্‌লেন—'আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি একবার দেখে আসি।' স্ত্রীলোকটির নিকটে কার্ডিনেল্ উপস্থিত হ'য়ে বল্‌লেন—'ওরে, আমার জুতোটা খুলে দে তো?' কার্ডিনেলের এইরূপ অবজ্ঞাসূচক কথা শুনে স্ত্রীলোকটি গ্রাহ্যই করলেন না। দর্শকমণ্ডলীও ঐপ্রকার ব্যবহার দেখে অবাক্ হ'লেন। কার্ডিনেল্ স্ত্রীলোকটির অগ্রাহ্যভাব দেখে অমনি চ'লে এলেন, এবং আনুপূর্ব্বিক পোপের নিকটে জ্ঞাপন ক'রে বল্‌লেন—'ঐ স্ত্রীলোকটি ভণ্ড, কখনই খৃষ্ট উহাতে আবির্ভূত নন। যদি খৃষ্টই আবির্ভূত হ'তেন, তা হ'লে নিশ্চয় তিনি বিনয়ী হ'তেন এবং যা বলেছিলাম করতেন।............"

ঠাকুর বলিলেন—"জ্ঞানের সম্যক্ ব্যবহার কর্‌বে। কাকেও সহজে বিশ্বাস কর্‌বে না। আবার বিশ্বাস ক'রেও সহজে তাকে অবিশ্বাস কর্‌বে না। জ্ঞান ও ভক্তি এ সকলই প্রকৃতির। দেখ, রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজে নিরক্ষর ছিলেন। অথচ মহা মহা জ্ঞানী লোকে তাঁর নিকটে ব'সে জ্ঞানলাভ করতেন। আবার

মহাভক্ত লোকেরাও তাঁর চরণতলে ব'সে কত ভক্তির উপদেশ শুন্‌তেন। তাঁকে জ্ঞানীরা মহাজ্ঞানী এবং ভক্তেরা মহাভক্ত মনে কর্‌তেন।"

আসন ও হোম বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

১লা বৈশাখহইতে নিত্য হোম করিতে ঠাকুর আদেশ করিয়াছেন। প্রত্যহ সকালে স্নানানন্তর নাম প্রাণায়াম করিয়া আমি হোম করিয়া থাকি। ১০৮ টি ত্রিপত্র বিল্বপত্র এক ছটাক ঘৃতের সহিত মিলাইয়া মন্ত্র মনে মনে জপ করি—"অগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া আহুতি দেই। ঠাকুর বলিয়াছেন—"বেল, বট, অশ্বত্থ বা যজ্ঞডুম্বুর কাষ্ঠে হোম কর্‌বে। এই মন্ত্র প'ড়ে প্রজ্বলিত অগ্নিতে "অগ্নয়ে স্বাহা" ব'লে আহুতি দিবে।" এই বলিয়া হোমের মন্ত্রটি বলিয়া দিলেন। গেণ্ডারিয়া-আশ্রমের পুকুরের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় বনের মধ্যে একখানা ঘর করিয়াছেন। ঐ ঘরে কেহই কোনও সময়ে থাকে না। নির্জ্জন পাইয়া, কুঞ্জ বাবুর সম্মতি অনুসারে, ঐ ঘরেই আমার আসন করিয়াছিলাম। উপস্থিত সেই স্থানে বড়ই বিঘ্ন দেখিতেছি, আশ্রম হ'তেও একটু তফাৎ; কি করিব জানি না।

আজ ঠাকুর আহারানন্তর আমতলায় যাইয়া বসিয়াই নিজহইতেই বলিতে লাগিলেন—"উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হ'য়ে আসন ক'রে হোম কর্‌বে। ভগবৎপ্রীতি-ইচ্ছায় বা নিষ্কাম হ'য়ে যা কিছু কর্‌বে তা উত্তরমুখ হ'য়ে ক'রো, আর সকাম বা সঙ্কল্পিত কার্য্য পূর্ব্বমুখ হ'য়ে করা ব্যবস্থা। হোম কর্‌বার সময়ে হোমধূম শরীরে লাগাতে হয়। না হ'লে দেহেতে হোমের ক্রিয়া তেমন হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই হোমের উপকারিতা কি?"

ঠাকুর বলিলেন—"হোমের উপকারিতা অনেক আছে, তাহা এখন জেনে প্রয়োজন নাই। ঠিক্‌মত হোম ক'রে যাও, উপকারিতা নিজেই অনুভব কর্‌তে পার্‌বে। হোম ক'রে হোমের ফোঁটা কপালে দিও। হোমের বিভূতি দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র কর্‌তে হয়। মধ্যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও ব্রাহ্মণের করা ব্যবস্থা।"

আমি হোম বিভূতিদ্বারা সকালেই ত্রিপুণ্ড্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া হোমান্তে হোমের ফোঁটা ধারণ করি। স্কন্ধহইতে আরম্ভ করিয়া উভয় হস্তে পাঁচটি স্থানে এবং উভয় পার্শ্বে, দুইটি

স্তনে, নাভি, বক্ষ, কণ্ঠ, কণ্ঠের বিপরীত মেরুদণ্ডের উপরে ও পৃষ্ঠে নাভিমূলের বিপরীত স্থলে, সর্ব্বত্রই ত্রিরেখা দিয়া থাকি।

জ্যৈষ্ঠ।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ও আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মে স্ত্রীলোকের সংস্রব।

জ্যৈষ্ঠ, ৪ঠা—১৩ই।

আমাদের দেশে হীন জাতি ছোট লোকদের ভিতরে, মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে, স্ত্রীলোকসংস্রবে যে সকল বীভৎস কাণ্ড অহরহঃ সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে বৈরাগী বৈষ্ণব কথাটার উপরেই যেন সাধারণ লোকের একটা অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে। উপস্থিত ভদ্রসমাজেরও দুই এক জন লোক এ সকল সম্প্রদায়ে প্রবেশ করাতে, সাধারণ লোকসমাজের যে কি বিষম ক্ষতি হইতেছে, বলা যায় না। আজ কয়েকটি ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, ইতর শ্রেণীর বাউল বৈষ্ণবদের ভিতরে স্ত্রীলোক লইয়া যে সাধন ভজনের ব্যবস্থা আছে শুনিতে পাই, তাহা কি মহাপ্রভুর ধর্ম্ম?"

ঠাকুর শুনিয়া কাণে হাত দিয়া বলিলেন—"**রাম! রাম!! মহাপ্রভু শাস্ত্র-সদাচারবিরুদ্ধ কোন অনুষ্ঠানই করেন নাই, বলেনও নাই। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" মহাপ্রভু মাত্র ইহাই প্রচার করেছেন। নাম কি ভাবে কর্‌তে হবে তাও বলেছেন—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥' স্ত্রীলোক হ'তে মহাপ্রভু কত তফাৎ থাক্‌তেন এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের ঐ সংস্রব থেকে কত সাবধানে রাখ্‌তেন, চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ কর্‌লেই তা বেশ বুঝা যায়। শুধু এদিকে কেন? প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, স্ত্রীলোকের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রেখে বৈষ্ণবসমাজে ধর্ম্মবিষয়ে বিষম অধোগতি হয়েছে। শ্রীবৃন্দাবনেও দেখ্‌লাম—সংযোগী না হ'লে কারো ওখানে থাকা সহজ নয়।"**

এই বলিয়া ঠাকুর একটি ঘটনার কথা বলিলেন। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবনে বাস-সময়ে আমিও তথায় ছিলাম। এই ঘটনাটি আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা আছে ; সুতরাং তৎকালীন ডায়েরীহইতে এই স্থলে বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনে একদিন একটি ভদ্র ঘরের যুবতী ব্রাহ্মণরমণী ব্যস্ততার সহিত আসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! আমি এ সময়ে কি করিব বলুন।" ঠাকুর তাঁহাকে বিষয়টি কি জিজ্ঞাসা করায়, স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিলেন, "অল্প বয়সে বিধবা হইয়া আমি তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলাম, চারি ধাম পরিক্রমা করিয়া কিছু কাল হইল শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতেছি। এতকাল বেশ ছিলাম, কিছুদিনহইতে কতকগুলি বৈষ্ণব আমার পিছনে বড়ই লাগিয়াছে। তাহারা দিনরাত আমাকে জ্বালাতন করিতেছে। ভেক গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণব নিয়া সংযোগী হইয়া, নাকি যুগল উপাসনা করিতে হয়, না হ'লে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করা নাকি মহা অপরাধ, সকলে আমাকে এইরূপ বলিতেছেন। অনেক বৈষ্ণবই নিয়ত আমার নিকট আসিতেছেন, আর ভেক্ দিতে চাহিতেছেন। আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, কিছু কাল হইল বিধবা হইয়াছি। এখন কি বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়া যুগল উপাসনা করিতে আপনি আমাকে বলেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"দুষ্ট লোকেরা আপনার সর্ব্বনাশ কর্‌তেই এসকল পরামর্শ দিতেছে। শাস্ত্রে বরং ইহার বিরুদ্ধেই আছে, যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহাদের অধোগতি হয়। সংযোগী না হ'লে যুগল উপাসনা করা যায় না, এরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই। যুগল উপাসনা বরং নাই হবে; এসব দুষ্ট লোকের পাল্লায় প'ড়ে, স্ত্রীলোকের সার সতীত্ব ধর্ম্মে কিছুতেই জলাঞ্জলি দিবেন না।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি খুব সন্তুষ্টা হইলেন। বৈষ্ণবদের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব না রাখিয়া আপন মনে সাধন ভজন করিবেন সঙ্কল্প করিলেন।

সতীর রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্।

যৌবনাবস্থায় এই স্ত্রীলোকটি যখন একাকী চারি ধাম পর্য্যটন করিয়াছেন, তখন কোনও প্রকার দুষ্ট লোকের উপদ্রবে পড়িয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করায়, স্ত্রীলোকটি তাঁহার এক দিনের অদ্ভুত একটি ঘটনার বিষয় বলিয়াছিলেন। ঠাকুর অনেক সময়ে এই

ঘটনাটি বলিয়া থাকেন। যথার্থ সতীর সহায় ভগবান্। তিনিই তাহাকে রক্ষা করেন। এই ভদ্রমহিলা বাঙ্গলা দেশের কোন গ্রামের একটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের কুলবধূ। স্বামি-পুত্রাদি সত্ত্বেও ধর্ম্মের আকর্ষণে ইনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন। পদব্রজে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইবার প্রত্যাশায়, স্বামীর চরণে পড়িয়া কিছুদিন অনুমতি প্রার্থনা করেন। স্বামী তাঁহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিয়া কিছুকাল ঘরে রাখিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে একদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে, তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে, পাগলের মত ছুটিয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের পথে চলিতে লাগিলেন। সমস্ততীর্থদর্শনমানসে নিতান্ত অসহায় অবস্থায়ও মনের আবেগে তিনি, একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র অবলম্বন করিয়া, একাকী ছুটিতে লাগিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে ভগবৎকৃপায় নীলাচলে উপস্থিত হইয়া, তিনি শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া, পরে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে চলিলেন। সেতুবন্ধের পথে তাঁহাকে যে আকস্মিক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের নিকটে যে কথোপকথন হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীধর স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "একাকী যৌবনাবস্থায় নানা স্থানে ভ্রমণকালে কোথাও কোন প্রকার বিপৎ ঘটে নাই তো?" স্ত্রীলোকটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবান্ যাহার সহায়, তাহার আবার বিপৎ কি? তবে এক দিনের একটি ঘটনার কথা আপনাদিগের শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি—শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবকে দর্শন করিয়া রামেশ্বর সেতুবন্ধে যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ভাল সঙ্গী না জুটাতে, একাকীই দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলাম। একদিন সমস্ত রাস্তা চলিয়া বিশ্রামের কোনও নিরাপৎ স্থান না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। পথ অতিশয় দুর্গম, একান্ত নির্জ্জন; একটানা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিলাম। সন্ধ্যার একটু পরেই কোনও নির্জ্জন স্থানে সাধুদের একখানি কুটীর দেখিতে পাইলাম। নিকটে যাইয়া দেখি, কয়েকটি শান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। উঁহাদিগকে দেখিয়া ভরসা হইল। তাই ঐ স্থানে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু রাত্রি একটু অধিকহইতেই সন্ন্যাসীরা কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, অন্য একটি আড্ডায় চলিয়া গেলেন। একটিমাত্র বলিষ্ঠ যুবক সন্ন্যাসী ঐ স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গভীর নিশীথে যখন চারিদিক অন্ধকারময়, নিস্তব্ধ, তখন সাধুটি নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং নানাপ্রকার কথা বলিতে বলিতে ভিতরের দুষ্টাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। আমি তখন বড়ই সঙ্কটে পড়িলাম। কিছুক্ষণ আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। অবলা নারী নির্জ্জন স্থলে নিশাকালে

অতিবলিষ্ঠ কামুকের হাতে পড়িয়া কি উপায়ে রক্ষা পাই, ভাবিতে লাগিলাম। সাধুকে দু' চার বার হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া, তাঁহার চেষ্টা থামাইতে প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। সাধু মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, আমাকে টানাটানি করিতে লাগিলেন। আমি তখন আর কি করিব? "মা জগদম্বে! মা জগদম্বে!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। সাধু মহাবলিষ্ঠ, বিষম উত্তেজনার অবস্থায় সজোরে আমাকে যেমনি মাটিতে টানিয়া ফেলিল, অকস্মাৎ একটি প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া লাফাইয়া উহার ঘাড়ে পড়িল এবং মুখে করিয়া পলকের মধ্যে অদৃশ্য হইল। পরদিন নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা আসিয়া দেখিলেন, কিছু তফাতে এক স্থানে সাধুর মৃত দেহ ঘাড়-মট্‌কান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসীরা বলিলেন, আর কখনও তাঁহারা এই গ্রামে বাঘ আসিতে দেখেন নাই, অথবা বৃদ্ধদের মুখেও কখন এই গ্রামে কোন কালে বাঘ আসিয়াছিল এমন কথা শুনেন নাই। ঐ সাধু বহুকাল ঐ কুটীরেই বাস করিতেছিলেন। জগদম্বার কৃপা অতি অদ্ভুত!

স্ত্রীলোকটি যখন এই কথা ঠাকুরের কাছে বলিয়াছিলেন, আমি তখন সেখানেই থাকিয়া ঐ সমস্ত কথা শুনিয়াছিলাম। ঐ প্রকারের আরও একটি ঘটনা ঠাকুর সেই সময়ে বলিয়াছিলেন; তাহা সেই সময়ের ডায়েরীহইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

যথার্থ সতী বিপন্না হইলে ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করেন, ইহার প্রমাণ দেখাইতে ঠাকুর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোনও এক গ্রামে একটি ভদ্রলোকের বাস ছিল। যৌবনাবস্থায়ই রোগগ্রস্ত হইয়া তিনি আফিং ধরিয়াছিলেন। এক দিন স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, তিনি নিজ যুবতী স্ত্রীকে মাত্র সঙ্গে লইয়া, পদব্রজে রওয়ানা হইলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পথিমধ্যে আফিমের অভাব হইল, ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া পড়িলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ধরাশায়ী হইয়া ঘন ঘন হাই তুলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে দুঃসহ ক্লেশ প্রকাশপূর্ব্বক স্ত্রীকে বলিলেন—"ওগো! আর আমি সইতে পারি না, শীঘ্র আফিং আনিয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাও।" স্বামীর ঐ অবস্থা দেখিয়া বিষম বিপদ আশঙ্কা করিয়া, স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ করিলেন, এবং কোথায় আফিং পাওয়া যাইবে অনুসন্ধান করিয়া অস্থিরচিত্তে বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অবশেষে জানিতে পারিলেন, 'ঐ গ্রামে এক ব্যক্তির নিকট আফিং আছে; কিন্তু তিনি ভয়ঙ্কর মাতাল।' যুবতী অগত্যা মাতালের দ্বারেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। আফিমের অভাবে স্বামীর জীবন সংশয়াপন্ন জানাইয়া, অতিরিক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত হইয়া, করজোড়ে অতি

কাতরভাবে মাতালের নিকট আফিং প্রার্থনা করিলেন। মাতাল বলিল—"ওগো, স্বামীর জন্য যদি যথার্থই দরদ থাকে, তবে আফিং নিতে পার; মদ, গাঁজা যাহা চাহিবে দিতে পারি, কিন্তু মূল্য নিয়া দিব না; কিছুক্ষণের জন্য তোমার দেহটি আমাকে দান করিতে হইবে, না হ'লে দিব না নিশ্চয় জানিও।" স্ত্রীলোকটি বহু অনুনয় বিনয় করিলেও মাতাল কিছুতেই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না। যুবতী নিরুপায় হইয়া স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার স্বামীকে জানাইলেন। স্বামী তখন আফিমের অভাবে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন; সুতরাং কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "ওগো! আমার প্রাণ যায়, যেখান থেকে যে ভাবে পার, আফিং আনিয়া দিয়া আমাকে বাঁচাও।" যুবতী বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। একদিকে স্ত্রীলোকের সার ধর্ম্ম সতীত্বের নাশ, আর একদিকে স্ত্রীর আরাধ্য দেবতা পতির অপমৃত্যু। সতী ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে মাতালের নিকট উপস্থিত হইয়া, মাতালের চরণ ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "আপনি আমার এই দেহ গ্রহণ করিয়া ইহার বিনিময়ে আমার স্বামীর জীবন দান করুন। আমাকে এই পাপে নরকে যাইতে হয় আপত্তি নাই, আপনার যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু শীঘ্র আফিং দিয়া আমার মরণাপন্ন স্বামীকে রক্ষা করুন।"

ভগবানের কি অদ্ভুত দয়া! সতীর কি অদ্ভুত শক্তি! যুবতীর করস্পর্শে মাতালের কি এক অবস্থা হইল, মাতাল চমকিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ যুবতীর চরণে মস্তক রাখিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল, "মা, আমায় ক্ষমা কর; তোমার কৃপায় আজ আমার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল। আমি অত্যন্ত দুরাচার, মদ, গাঁজা, আফিং সমস্ত নেশাই করিয়া থাকি, কিন্তু আজহইতে আমি সমস্ত নেশা ত্যাগ করিলাম, তোমার যত ইচ্ছা আফিং লইয়া যাও। মা, তোমার মত দুর্দ্দশা আমার স্ত্রীরও তো ঘটিতে পারে। জীবনে আর নেশা বস্তু স্পর্শ করিব না।" যুবতী আফিং নিয়া স্বামীর নিকটে পঁহুছিলেন; দেখিলেন, স্বামী বসিয়া খুব কান্দিতেছেন। স্বামীর হাতে আফিং দিতেই তিনি উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আহা! আমার জন্য তোমার সার সতীত্ব-ধর্ম্ম তুমি অনায়াসে বিসর্জ্জন দিলে! ধিক্ আমার জীবনে! এ জীবন যাওয়াই তো ভাল। আর কখনও আফিং স্পর্শ করিব না, প্রাণ যায় যাক্। তুমিই ধন্যা, তুমিই যথার্থ সতী।" স্ত্রী তখন কান্দিতে কান্দিতে স্বামীর চরণে ধরিয়া, ভগবানের অদ্ভুত কৃপায় তিনি যে ভাবে এই বিষম সঙ্কটে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহা জানাইয়া স্বামীকে শান্ত করিলেন।

হোমের উপকারিতা ও প্রার্থনায় অনুতাপ।

আজ মাসাধিক কাল হইল, নিয়মিতরূপে অনুদয়ে বুড়ীগঙ্গায় স্নান তর্পণ করিয়া আশ্রমে আসি এবং বেলা নয়টা পর্য্যন্ত আসনে স্থিরভাবে বসিয়া থাকি। বাড়ীহইতে যজ্ঞডুম্বুরের কাষ্ঠ ও বিশুদ্ধ গব্যঘৃত আনিয়া রাখিয়াছি। সকালে কিছুক্ষণ গায়ত্রীজপান্তে, অখণ্ডিত বিল্বপত্রদ্বারা ঠাকুরের আদেশ অনুসারে প্রজ্জলিত অগ্নিতে ১০৮টি আহুতি দেই। আহুতি দিয়াই হোম-ধূম শরীরে পাখা করিয়া লাগাইয়া থাকি, এবং খুব উদ্যমের সহিত প্রাণায়াম ও নাম করি। কিছুদিনযাবৎ পবিত্র হোমগন্ধ, আসন ছাড়িয়াও, সময়ে সময়ে অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু আজকাল হোমগন্ধ আমাকে আর ছাড়িতেছে না। প্রায় সর্ব্বদাই যেখানে সেখানে এই অদ্ভুত হোমগন্ধ পাইয়া, আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি। নিয়ত হোমগন্ধ আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। এই পবিত্র হোমগন্ধের প্রভাবে চিত্তের প্রফুল্লতা, মনের উৎসাহ উদ্যম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নাম সুস্পষ্টভাবে, খুব তেজের সহিত, রসাল হইয়া প্রতিনিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছে। গন্ধ নামের, এবং নাম গন্ধের, প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছে। মন আর অন্য দিকে যায় না, গন্ধে মাতিয়া নামেতে নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অনুদয়ে স্নান করিয়া অপরাহ্ণ ছয়টা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকি; অবসন্নতা, ক্ষুধা তৃষ্ণা বুঝি না। পূর্ব্বে যাঁহারা আমার গায়ে ঘর্ম্মের দুর্গন্ধ পাইয়া সময়ে সময়ে বিরক্ত হইয়া তফাৎ থাকিতেন, আজকাল তাঁহারাও এই হোমগন্ধ পাইয়া আমার গা ঘেঁষিয়া বসেন, গায়ে হোমগন্ধ হইয়াছে বলিয়া পরস্পর আলোচনা করেন। আমি কিন্তু গায়ের গন্ধ কিছুই বুঝি না, সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র হোমগন্ধ পাইয়া দিশাহারা হইয়া যাইতেছি। বিশুদ্ধ গব্যঘৃত খাইতে না বলিয়া, ঠাকুর আমাকে কেন অনর্থক আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন, সময়ে সময়ে আমার এই খট্‌কা উঠিত। আশ্চর্য্য ঠাকুরের দয়া! এই ভাবে না বুঝাইলে আমার কিছুতেই শান্তি হইত না। ঠাকুর! দয়া কর। এই ভাবেই প্রতি সংশয়ের হাতহইতে রক্ষা করিও। জয় ঠাকুর !!

আশ্রমের পশ্চিম দিকে শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণাংশে প[illegible] মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের রান্নার ও থাকিবার দু'খান[illegible] আছে। যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া আহারাদি ব্যাপারে [illegible] হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া উঁহারা আনন্দে ভজন সাধন করিতে করিতে দিন কাটাইতেছিলে[illegible] সম্প্রতি ঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত আশ্রমেই হইয়াছে

তাঁহাদের রান্নাঘরটি শূন্য পাইয়া আমার আসন ঐ ঘরে আনিবার সুযোগ পাইলাম। জঙ্গলের ভিতরে দরজা-শূন্য ফাঁকা ঘরে আসন, বস্ত্র ও হোমের ঘৃতাদি সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া ঠাকুরের নিকটে সারাদিন থাকায় উদ্বেগশূন্যহইতে পারিতেছি না। গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে বাঘের অভাব নাই, সাপও বিস্তর; রাত্রিতে ঐ ঘরে যাইয়া একাকী আমাকে থাকিতে অনেকে নিষেধ করিতেছেন। একটু তফাৎ থাকি বলিয়া, রাত্রিতে যে আনন্দ সকলে ঠাকুরকে নিয়া ভোগ করেন আমি তাহাতে বঞ্চিত।

আর একটি ঘটনায় আমার চিত্তকে বিষম অস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একদিন আমি আশ্রমে রান্নায় নিযুক্ত আছি, ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনসহ অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমার হোমের কাষ্ঠগুলি একটু ভিজা ছিল বলিয়া, ভালরূপে শুকাইয়া লইবার মানসে উহা আসনঘরের উত্তর দিকের একটা অনাবৃত স্থানে রৌদ্র পাইবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলাম। বৃষ্টি আরম্ভহইতেই, 'হায় ঠাকুর, কি হইল? কাঠগুলি ভিজিয়া গেল,' ভাবিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কল্য ভিজা কাষ্ঠে কি প্রকারে হোম করিব চিন্তায় অস্থির হইয়া মনে মনে ঠাকুরকে জানাইলাম; 'তাঁর দয়া হ'লে সবই সম্ভব, না হ'লে আর উপায় নাই,' বুঝিয়া অগত্যা স্থির হইলাম। আহারান্তে রাত্রে বৃষ্টি থামিলে আসনে যাইয়া দেখি, সমস্তগুলি কাঠ ঘরের মধ্যস্থলে সাজান রহিয়াছে। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাত্রির অধিকাংশ সময় ভাবিতে লাগিলাম, 'কাঠগুলি কে ঘরে আনিয়া রাখিল?' পরে ২।৩ দিন সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম, কে উহা ঘরে নিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সকলেই বলিলেন, "জানি না।" পণ্ডিত দাদা বলিলেন, "এ বিষয়ে আর অনুসন্ধান কেন? অন্যদ্বারা হ'লেও উহা তো ঠাকুরই করাইয়াছেন।" সাধারণের নিকটে ঘটনাটি সামান্য বোধ হইলেও এই ব্যাপারে আমার চিত্তটিকে অত্যন্ত আলোড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। হায়! হায়! আমার ব্যস্ততা দেখিয়া ঠাকুরেরই এই কর্ম্ম!

পণ্ডিত দাদাদের রান্নাঘরেই আমার আসন করিলাম।

৬

বিস

কর্ম্ম কিসে শেষ হয়?

আফি

কাম্মাজ নির্জ্জন পাইয়া পাঠান্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুনিতে পাই, কর্ম্মই জীবের বন্ধন। এই কর্ম্ম কিসে শেষ হয়? কর্ম্ম করিয়াই কি কর্ম্মকে শেষ করিতে হয়?" ঠাকুর বলিলেন—"তা কি কখনও হ'য়ে থাকে? কর্ম্ম ক'রে কেহই কর্ম্মকে শেষ

কর্‌তে পারে না। কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে মানুষ আরও কর্ম্মে জড়িত হ'য়ে পড়ে। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম শেষ করা যায় বটে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। উহা অভ্যাস করা সহজ নয়। সাধনদ্বারা কর্ম্ম শেষ করাই সহজ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিলেও কর্ম্ম শেষ হ'তে এত বিলম্ব হয় কেন? সদ্‌গুরুর আশ্রয়াদি নিয়াও কি আবার সাধন ভজন ক'রে প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ কর্‌তে হবে।"

প্রশ্নটি শুনিয়া ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেলে কর্ম্ম আপনা আপনি শেষ হ'য়ে আসে। আগুনের উপরে রাশীকৃত কাঠ চাপায়ে রাখ্‌লে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে ধীরে ধীরে যেমন উহা দগ্ধ হ'তে থাকে, পরে একটু বাতাস পেলেই একবারে দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাঠ জ্বালায়ে দিয়ে একেবারে ভস্ম ক'রে ফেলে, সেইরূপ গুরুপ্রদত্ত শক্তিও, বহুজন্মের কর্ম্মরূপ আবর্জ্জনার নীচে থেকে, ধীরে ধীরে কার্য্য কর্‌তেছে এবং ঐ সমস্ত আবর্জ্জনা ধীরে ধীরে নষ্ট কর্‌তে কর্‌তে গুরুকৃপায় যখন উহা একবার দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌বে তখনই সমস্ত কর্ম্মরাশি মুহূর্ত্তমধ্যে নষ্ট ক'রে প্রকৃত শান্তির অবস্থাতে নিয়ে যাবে। গুরুশক্তি আপনা আপনি কার্য্য করে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"যে সকল দুষ্কার্য্য প্রারব্ধহেতু করা হয়, তাহা যে প্রারব্ধেরই কার্য্য, তাহা কি প্রকারে জানা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন—"একটি কার্য্যে নিতান্ত অনিচ্ছা থাক্‌লেও এবং পুনঃপুনঃ বিরত হ'তে চেষ্টা ক'রেও যখন অবশ হ'য়ে তা ক'রে ফেল, তখন উহা প্রারব্ধ বশতঃই হ'ল জান্‌বে। ঐপ্রকার কার্য্য হওয়ার পরে যথার্থ অনুতাপ এলেই ঐ প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যায়। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম করতে পার্‌লে সমস্ত প্রারব্ধই খুব শীঘ্র নষ্ট হয়। এত সহজে আর কিছুতেই হয় না।"

জীবন্মুক্তের কর্ম্ম; প্রারব্ধক্ষয়ের উপদেশ।

জ্যৈষ্ঠ ১৩ই—৩১শে; জুন, ১৮৯১।

আজ জিজ্ঞাসা করিলাম—"মানুষ যখন একেবারে নিঃস্বার্থ হ'য়ে যায়, জীবন্মুক্ত হ'য়ে যায়, তখনও কি তার কর্ম্ম থাকে?"

ঠাকুর বলিলেন—"মানুষের যত দিন স্বার্থ আছে, তত দিন আর তার কর্ম্ম কোথায় ? মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখনই তার যথার্থ কর্ম্ম আরম্ভ হয়। স্বার্থ নষ্ট হ'য়ে মুক্তাবস্থা লাভ কর্‌লে, সমস্ত সংসারের জন্য অবিশ্রান্ত খাটতে হয়। নিঃস্বার্থ না হ'লে প্রকৃত কর্ম্মের আরম্ভই হয় না। জীবন্মুক্ত হ'লেই যথার্থ কর্ম্মের আরম্ভ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রারব্ধে যাহা আছে, তাহা ভোগ না ক'রে কি উপায় নাই ? সমস্ত প্রারব্ধই কি ভুগে শেষ কর্‌তে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ভগবান্ যেটুকু প্রারব্ধ ভোগ করাবেন, তাহা কোন প্রকারেই ছাড়াতে পার্‌বে না। তবে যাহারা প্রফুল্লমনে কর্ম্ম ক'রে যায়, ঝাঁ ক'রে তাদের কর্ম্ম শেষ হ'য়ে যায়। আর বেগারের মত কর্ম্ম কর্‌লে, ক্রমে অনেক কর্ম্মে জড়িয়ে ধরে। কর্ম্মকে কখনও উপেক্ষা কর্‌তে নাই। কর্ত্তব্যবোধে প্রফুল্লমনে কর্ম্ম ক'রে যাও, তা হ'লেই খুব শীঘ্র প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যাবে।"

কিছু দিন হইল ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম শেষ করা যায় না, সাধন দ্বারাই কর্ম্ম শেষ করা সহজ।" আবার এখন বলিলেন—"ভগবান্ যেটুকু প্রারব্ধ ভোগাইবেন, কিছুতেই ছাড়াইতে পারিবে না। প্রফুল্লমনে কর্ম্ম করিয়া যাও, শীঘ্র প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যাবে।" এই দুইপ্রকার কথার সামঞ্জস্য করিতে গিয়া আমি এই বুঝিলাম যে, ভগবানই সকলের কর্ত্তা, তাঁরই ইচ্ছায় প্রারব্ধভোগ। সাধন ভজন করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিলে, তাঁহার কৃপায় মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত প্রারব্ধ শেষ হইতে পারে। সুতরাং একান্তপ্রাণে তাঁকেই ডাকি। কিন্তু ভগবান্ যে কি, তাহা তো কিছুই জানি না। অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে কি ভাবে ডাকিতে হয়, পূজা করিতে হয়, তাহা তো বুঝিতেছি না। শূন্যে ঢিল মারিবার মত, লক্ষ্য স্থির না করিয়া নাম করিতেছি মাত্র। মনে এই খট্‌কা উপস্থিত হইল, নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে প্রাণ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে কিছুতেই তো ধারণা করিতে পারিতেছি না। তাঁর পূজা আর কিরূপে করিব ? শূন্যে যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান হইতেছি। গুরুর ধ্যানে ও পূজায় ভগবানের পূজা হয় না কি ? আমাকে পরিষ্কাররূপে ইহা বুঝাইয়া দিন্।"

গুরুই ভগবান্।

ঠাকুর বলিলেন—" অগ্নি তো সকল স্থানেই আছে ; কিন্তু সেই অগ্নি কি কেউ ধর্‌তে পারে ? না তাহাদ্বারা কোনও কাজ হয় ? আগুনের আবশ্যক হ'লে সর্ব্বত্র যে আগুন আছে, শূন্যে যে আগুন র'য়েছে, তা হ'তে কেহ উহা নিতে পারে না। প্রদীপ, ধুনি, চুল্লী ইত্যাদি যে সকল স্থানে ঐ অগ্নি জ্বলন্তভাবে বিশেষরূপে প্রকাশিত র'য়েছে, সেখানেই যেয়ে আগুন নিয়ে থাকে। সে রকম, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হ'লেও, কেউ তাঁকে ধর্‌তে পারে না। গুরুতে ঈশ্বরের চিৎ শক্তির প্রকাশ দেখে, তথায়ই পূজা কর্‌তে হয়। গুরু তো আর মানুষ নন্। গুরুই ভগবান্, গুরুর পূজাই ঈশ্বরের পূজা। "

সাধকজীবনে শুষ্কতার আবশ্যকতা।

অনেক সময় নাম করিতে করিতে অত্যন্ত নৈরাশ্য, উদ্বেগ ও শুষ্কতা আসিয়া উপস্থিত হয় ; তখন নাম করিতে জ্বালা হয়। তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—" সাধনের সময়ে কখনও কখনও বড়ই নিরাশ হই, শুষ্কতা ও জ্বালা আসিয়া অস্থির করে, সাধন ভজন এই সময়ে ভাল লাগে না। কত কাল এই শুষ্কতা ভোগ হবে ? এইরূপ হয় কেন ? "

ঠাকুর বলিলেন—" দেখ, এই বর্ত্তমান গ্রীষ্মকাল কেমন ভয়ানক ! পুকুর, খাল, বিল, সমস্ত শুখায়ে গেছে। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে সবাই অস্থির হতেছে, সকল প্রাণীই হাহাকার কর্‌তেছে। গাছপালাও পূর্ব্বের মত নাই, দেখ্‌লেই মনে হয় যে কি এক বিষম অবস্থা। বাস্তবিক প্রকৃতির পক্ষে এমন দারুণ অবস্থা আর কখনও হয় না। কিন্তু ভেবে দেখ, এই গ্রীষ্মকাল না হ'লে বর্ষা আসে না, প্রকৃতি আবার নূতন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয় না। এই গ্রীষ্মকালই প্রকৃতির নূতন সৌন্দর্য্যের কারণ। গ্রীষ্ম হয় ব'লেই আমরা বর্ষার এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য অনুভব করি। সাধনের অবস্থাও ঠিক এইপ্রকার। সাধনের সময়ে শুষ্কতা, নৈরাশ্য, জ্বালা ইত্যাদি বিবিধপ্রকার দুঃখের অবস্থা ভোগ কর্‌তে হয় ব'লেই, ধর্ম্মের এত সৌন্দর্য্য। নৈরাশ্য বা শুষ্কতা না এলে ধর্ম্মের আনন্দই থাক্‌ত না। এই সকল

অবস্থার ভিতর দিয়ে মানুষ যখন ধর্ম্মের উচ্চতম শৃঙ্গে উপনীত হয়, তখনই যথার্থ শান্তি লাভ করে। তা না হওয়া পর্য্যন্ত এ সকল অবস্থা হ'তে মানুষ কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ কর্‌তে পারে না। এখন এ সকলই প্রয়োজন। যদি শান্তির অবস্থা একবার লাভ হয়, তা হ'লে আর কিছুতেই তা নষ্ট হয় না।"

অসময়ে শাস্ত্রপাঠের ও সাধুসঙ্গের অপকারিতা।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে এবং অনেক সাধুর সঙ্গ করাতে ধর্ম্মজীবনের কল্যাণ হয়, না অনিষ্ট হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"সমস্ত কার্য্যেরই তো একটা প্রণালী আছে। অসময়ে অনিয়মে কোন কার্য্যেরই সুফল লাভ হয় না, বরং ক্ষতিই হয়। শাস্ত্রপাঠ ও সাধুসঙ্গ করারও একটা সময় আছে, অবস্থা আছে। অসময়ে এলো মেলো ভাবে ওসব কর্‌লে কোন উপকারই হয় না, বরং অনিষ্টই হয়। শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা এবং অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ আছে। প্রকৃতির অনুযায়ী পন্থা ধ'রে কিছু দূর অগ্রসর হ'লে, অবস্থানুরূপ শাস্ত্র পাঠ কর্‌তে হয়। নিজের সাধন-পথে একটা নিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও শাস্ত্রপাঠ বা কোনও সাধুসঙ্গ করাই ঠিক নয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, ওরকম করায় লোকের বিষম ক্ষতি হয়। আপন সাধন ভজনের পথে নিষ্ঠা একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়।"

গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে নিত্য সঙ্কীর্ত্তন ও ভাবাবেশ।

গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে নানা দিক্‌হইতে গণ্য মান্য বহু গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে দর্শন করিতে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়াছেন। আজকাল সাধু সন্ন্যাসী, বাউল, উদাসী এবং মুসলমান্ ফকিরেরাও আশ্রমে আসিতেছেন, যাইতেছেন, কেহ বা থাকিতেছেন। গুরুভ্রাতারা আপন আপন রুচি অনুযায়ী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ দলে, স্থানে স্থানে বসিয়া, কোথাও স্থির ভাবে নাম, প্রাণায়াম করিতেছেন, কোথাও উৎসাহের সহিত ধর্ম্মালোচনায় ব্যস্ত আছেন, কোথাও বা কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া সময় কাটাইতেছেন। ঠাকুরের সেবার কার্য্য লইয়া কাহারও কাহারও ভিতরে প্রতিযোগিতা এবং ঝগড়া বিবাদও চলিতেছে। সকলেই

একই ভাবে মত্ত; উদয়াস্ত যে কি ভাবে যাইতেছে কাহারও লক্ষ্য নাই; কেমন যেন একটা নেশাতে দিনরাত চলিয়া যাইতেছে। প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময়ে সকলে একত্র মিলিত হইয়া ঠাকুরের নিকট, কখনও আশ্রমের পূবেরঘরে, কখনও বা আমতলায়, খুব উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই সঙ্কীর্ত্তন এক মহাব্যাপার। বরিশাল, বানরিপাড়া, ঢাকা ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুরুভ্রাতারা একত্র হইয়া, খোল করতাল লইয়া যখন উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন, তখন সকলেরই দৃষ্টি একমাত্র ঠাকুরের উপরে। ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই ঘন ঘন কম্পিত হইতে থাকেন, পুনঃপুনঃ চাপিতে চেষ্টা করিয়াও স্থির থাকিতে না পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠেন; উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া "হরিবোল, হরিবোল" ধ্বনি করিতে থাকেন। ঠাকুরের হুঙ্কারে, হরিবোল ধ্বনিতে, চারি দিকে স্ত্রীলোক পুরুষের ভিতরে যেন কি এক অদ্ভুত শক্তি প্রবেশ করে। দেখিতে দেখিতে দুই চারি মিনিটের মধ্যেই মহা হুলস্থূল ব্যাপার আরম্ভ হয়, সকলে যেন কেমন একপ্রকার হইয়া যান। কেহ কেহ "জয় রাধে, জয় রাধে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, কেহ কেহ "হরিবোল, হরিবোল" ভীষণ রব ছাড়িয়া নির্নিমেষে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বহির্ব্বাস উড়াইয়া ঠাকুরকে পরিক্রমা করিতে থাকেন, কেহ বা "নিতাই, নিতাই" বলিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে মল্লবেশে ঠাকুরের সম্মুখীন হইতে থাকেন, আবার কেহ কেহ বা কিঞ্চিৎকাল নিষ্পন্দ অবস্থায় দাঁড়ান থাকিয়া ঠাকুরের দিকে একটানা দৃষ্টি রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান। সকলেই কোনও না কোনও ভাবে মাতোয়ারা, ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া দিশাহারা। খোলের ধ্বনি ও সঙ্কীর্ত্তনের রব, গুরুভ্রাতাদের হুঙ্কার ও গর্জ্জনে মিলিত হইয়া, অদ্ভুত তাড়িৎপ্রবাহে দর্শকমণ্ডলীকেও কাঁপাইয়া তুলে। এই সময়ে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পর্দ্দার আড়ালে স্ত্রীমহলেও বিষম কান্নার রোল উঠিয়া পড়ে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় কেহ কেহ নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুরের দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকেন, কেহ কেহ মূর্চ্ছিতাবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াও গড়াইয়া গড়াইয়া ঠাকুরের চরণসমীপে আসিয়া লুটাইতে থাকেন, আবার কেহ বা পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে ঠাকুরকে ধরিতে যাইয়া বাধা পাইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন ও ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকেন। আমরা কয়েকটি গুরুভাই সাধারণের স্পর্শহইতে ঠাকুরকে বাঁচাইয়া রাখিতে ঠাকুরের চারি দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকি; এবং ভাবাবেশে উন্মত্ত, মুগ্ধ, মূর্চ্ছিত ও ঠাকুরের দিকে ধাবিত, স্ত্রীলোক পুরুষদিগকে, অবস্থা বুঝিয়া, সরাইয়া দেই। আশ্রমে আজকাল প্রত্যহই এইরূপ মহা আনন্দ, মহা উৎসব! ধন্য ঠাকুর! ধন্য ঠাকুর!! তোমার সঙ্গলাভে আমরাও ধন্য!

সাধন কি? সাধকের ও সিদ্ধের কর্ত্তব্য কি? ধর্ম্ম হইল কিনা কিসে বুঝিব?

আহারান্তে ঠাকুর যখন আমতলায় বসেন, কিছুক্ষণ লোকের ভিড় তেমন থাকে না। পাঠান্তে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"মানুষের অশান্তির মূল কি?"

ঠাকুর বলিলেন—"**মানুষের সমস্ত অশান্তিই ধৈর্য্যের অভাবে। ধৈর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। চঞ্চলতাই অশান্তির একমাত্র কারণ।**"

একটু থামিয়া ঠাকুর নিজহইতেই আবার বলিতে লাগিলেন—"**মানুষের কোন বিষয়েই চঞ্চল হওয়া ঠিক নয়। মানুষ যখনই যা কর্‌বে, স্থির ভাবে বিচার ক'রে করা উচিত। হঠাৎ কোনও কাজই করা সঙ্গত নয়। সকল বিষয়েই খুব ধৈর্য্য ধ'রে কার্য্য কর্‌তে হয়। ধৈর্য্যই ধর্ম্ম, ধৈর্য্যই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।**"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাদের সাধন কি? নামজপ করাই কি সাধন?"

ঠাকুর বলিলেন—"**সদ্‌গুরুপ্রদত্ত নাম জপ করাকে সাধন বলে না। সদ্‌গুরু-প্রদত্ত নাম গুরুশক্তিপ্রভাবে, আপনা আপনি অনন্ত কাল চল্‌বে। সকল বিষয়েই চঞ্চলতা পরিত্যাগ ক'রে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত বিচার ক'রে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই যথার্থ সাধন। সকল বিষয়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করাই সাধন।**"

বিচারপূর্ব্বক কার্য্যের কথা শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাধক সাধনের অবস্থায় তো সমস্ত কার্য্যই বিচারপূর্ব্বক করবে। সিদ্ধ হ'লে কি আর বিচার ক'রে কার্য্য করবে না?"

ঠাকুর বলিলেন—"**সিদ্ধ পুরুষের কাছে যেসকল বিষয় আস্‌বে, তিনি তা ভগবানের সম্মুখে নিয়ে ধর্‌বেন। যেসব বিষয়ে ভগবানের জ্যোতিঃ সুস্পষ্টরূপে পড়েছে দেখ্‌তে পাবেন, তাহাই কর্ত্তব্য ব'লে স্বীকার কর্‌বেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা সমস্ত কাজই ভগবানের ইঙ্গিত অনুসারে করেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা নিজ ইচ্ছায় কিছুই করেন না। তাঁরা ভগবানের ইচ্ছার পশ্চাতে দাঁড়ায়ে নিশান ধরেন মাত্র।**"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ধর্ম্ম যথার্থই প্রকৃতিগত হয়েছে কিনা কিসে বুঝ্‌ব?"

ঠাকুর বলিলেন—আগুন যেমন সকল অবস্থাতেই একপ্রকার থাকে, কোন অবস্থায়ই উহার উত্তাপ নষ্ট হয় না, সেইপ্রকার আপদে বিপদে, আনন্দে উল্লাসে, কোন অবস্থায়ই যাহার ধৈর্য্য নষ্ট না হয়, সত্য ও ধর্ম্ম একই রকম থাকে, বিনয় ও সমতার কিছুমাত্র ভাবান্তর না হয়, তাহারই ঐসকল ধর্ম্ম প্রকৃতিগত হয়েছে জান্‌বে। সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বিনয় ও মিত্রতা ঠিক থাক্‌লে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়েছে বুঝ্‌বে। বিপদে সম্পদে, নিন্দাতে ও প্রশংসাতেই, মানুষের যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়েছে কিনা পরীক্ষা হয়।"

এই সকল উপদেশের সময়ে ঠাকুর অনেক গল্প ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন। ধর্ম্ম সহজ জিনিস নয়, এ জীবনে কি আর তাহা লাভ হইবে ?

ভাব বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য উপদেশ

নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্রাহ্ম, এমন কি মুসলমান্, খৃষ্টান্ প্রভৃতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গণ্য মান্য অবস্থাপন্ন লোকসকলও সাধন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলে কিছুকাল একস্থানে বাস করায়, সময়ে সময়ে আচার ব্যবহারের পার্থক্যবশতঃ ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে তর্ক, কলহ, বাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে ও নানা বিষয়ে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়। এই সমস্ত মতামতের ও আচার ব্যবহারের বিরোধ মীমাংসার জন্য, সময়ে সময়ে উভয় পক্ষই স্পর্দ্ধার সহিত ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হন। সাধারণের, সাধারণ অনুষ্ঠানের উপরে কেহ কিছু করিলেই, তাহা অসার প্রতিপন্ন করিতেও ঠাকুরের নিকটে কত সময়ে কত প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু সমস্যার ভিতরে উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট রাখিয়া ঠাকুর আশ্চর্য্যভাবে প্রতি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন।

আজ ঠাকুর সকলকে বলিলেন—"সকলেরই অবস্থায় সহানুভূতি কর্‌তে হয়। অন্যের মতের সঙ্গে অনৈক্য বা অবস্থার সঙ্গে অমিল হ'লেই, তাহা একেবারে উড়ায়ে দিতে নাই। অন্যের অবস্থার বিচার কর্‌তে হ'লে, ঐ অবস্থা নিজের ব'লে অনুভব কর্‌তে হয়, এক ইঞ্চি তফাৎ থাক্‌লেও এক জনের অবস্থার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, দোষ বা গুণ অন্য জনে ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। মতের

অনৈক্য, অবস্থার পার্থক্য, এ সমস্ত তো সংসারে চিরকালই থাক্‌বে। ভগবানের রাজ্যে কোনও দুটি বস্তুই ঠিক একমত নয়। কোন না কোন অংশে কিছু পার্থক্য থাক্‌বেই। এই নানা বিচিত্রতার মধ্যেও একটি সুন্দর শৃঙ্খলা আছে। যত দিন মানুষ তাহা দেখ্‌তে না পায়, ততদিনই গোলমাল করে। বাস্তবিক সকলেই একপ্রকার হ'লে প্রকৃতির একটা সৌন্দর্য্যই থাকে না। নানাপ্রকারের ফুলগাছে বাগানের যেমন একটা চমৎকার শোভা হয়, শুধু এক প্রকারের গাছে সেই রকমটি কখনও হয় না। এ সংসারও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশে এক সুন্দর শোভা ধারণ করেছে। মানুষ যখন তা দেখ্‌তে পায়, তখন সমস্ত বিরোধই ছুটে যায়, প্রকৃতির বিচিত্রতার ভিতরে ভগবানের আশ্চর্য্য সৃষ্টিশৃঙ্খলা ও অদ্ভুত কৌশল দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে যায় ও পরমানন্দ লাভ করে। কিছুতেই তারা আর বিচলিত হয় না, অশান্তি ভোগ করে না। নিজের স্থানে নিজে ঠিক থেকে অন্যের অবস্থা মাত্র দেখে যেতে হয়; তবেই ক্রমে শান্তি।

" সব্‌ছে রসিয়ে, সব্‌ছে বসিয়ে, সব্‌ছে লী জিয়ে কাম,
হাঁ জী, হাঁ জী কর্‌তে রহিয়ে, বৈঠিয়ে আপন ঠাম। "

দুর্গাচরণ বাবুর প্রতি ফকিরের অত্যাচার।
সম্পূর্ণ ক্ষমার স্থলে ভগবানের দণ্ড।

আমাদের গুরুভ্রাতা গেণ্ডারিয়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাহা মহাশয় ফকিরদের সঙ্গে কিছু দিন মিশিয়া কতকগুলি বুজরুকী শিখিয়াছেন। সময়ে সময়ে দুর্গাচরণ, ঠাকুরের নিকটেও ঐসকল বুজরুকী দেখাইয়া খুব আমোদ করেন। আমরাও খুব আমোদ পাই, তামাসা করি। গাঁজা খাইতে আমাদের সকলের নিষেধ থাকিলেও, ফকিরদের চক্রে পড়িয়া দুর্গাচরণ গাঁজা খাইতে বেশ অভ্যাস করিয়াছেন। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় একদিন দুর্গাচরণকে বলিলেন, " দুর্গা-চরণ, গাঁজাটা কেন খাও ? " দুর্গাচরণ একটু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, " আপনারা সাধারণতঃ যেসব স্থলে বিচরণ করিতেছেন, তাহাহইতে একটু উপরে উঠিতে হইলেই, গাঁজায় একটু দম্ দিয়া নিতে হয়। " গাঁজা খাইলেও দুর্গাচরণ অতিশয় বিনীত ও নিরীহ প্রকৃতির ভাল মানুষ। গেণ্ডারিয়ার একটি প্রভাবশালী ফকিরকে দুর্গাচরণ প্রত্যহ

দু' চার পয়সার গাঁজা দিয়া থাকেন। দিন দুই হইল দুর্গাচরণের হাতে পয়সা না থাকায় তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফকির সাহেবকে গাঁজা দিতে পারেন নাই। তাই একটু ভীত হইয়া, আশ্রমে আসিয়া আমতলায় ঠাকুরের নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ফকির সাহেব সময়ে গাঁজা না পাইয়া দুর্গাচরণকে তালাস করিতে করিতে অপরাহ্ণে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরের নিকটে দুর্গাচরণকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, ক্রোধে অগ্নি-মূর্ত্তি হইয়া পড়িলেন। হাতে একখানা বেত ছিল, তাহাদ্বারা অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় সজোরে দুর্গাচরণের পৃষ্ঠে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আরে শালা, গুরুকা সাম্‌নে আয়্‌কে বৈঠা হ্যায়! তুঝ্‌কো মার্‌নেছে তেরা গুরু হামারা ক্যা করেগা?" দুর্গাচরণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ফকির সাহেবকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু কোনও প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া, মার খাইয়া ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ঠাকুর দুই একবারমাত্র ফকিরের দিকে তাকাইয়া স্থির হইয়া রহিলেন। ফকির সাহেবও খুব দম্ভের সহিত হাতের বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে আশ্রমহইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া দুর্গাচরণকে বলিলেন—"**দুর্গাচরণ, ফকির সাহেব অন্যায়রূপে তোমাকে এত প্রহার কর্‌লেন, আর তুমি চুপ ক'রে র'লে, একেবারে কিছুই বল্‌লে না!**"

দুর্গাচরণ বলিলেন—"প্রভো! আপনার সাক্ষাতে আমি কিরূপে উহাকে বল্‌ব? আমি তো ঠাকুরের-ই উপরে সব ছেড়ে দিয়েছিলাম।"

ঠাকুর বলিলেন—"**আহা! ওরূপ কর্‌তে নাই। প্রতিফল দিতে সমর্থ হ'য়েও অত্যাচার ভোগ ক'রে যাঁরা ভগবানের হাতে একেবারে ছেড়ে দেন, তাঁরা অত্যাচারীর দফা শেষ করেন। আশ্রম হ'তে বাহির হ'য়েই ফকির সাহেব কি বিষম বিপদে প'ড়েছেন, অনুসন্ধান নিলেই সমস্ত জান্‌তে পার্‌বে।**"

দুর্গাচরণ আশ্রমহইতে বাহির হইয়া, ফকির সাহেবের অনুসন্ধান নিলেন; পরে আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "ফকির সাহেব বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে লোহার পুলের নিকটে উপস্থিত হইয়া এক ব্যক্তিকে অনর্থক গালাগালি করিতে থাকেন। নিকটে পাহারাওয়ালা ছিল, সে ফকির সাহেবকে গালাগালি করিতে নিষেধ করায় ফকির সাহেব কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান-শূন্য হইয়া হস্তস্থিত বেত্রদ্বারা পুলিশকে কয়েক ঘা আঘাত করেন; তাহাতে দু' চার জন

পাহারাওয়ালা একত্র হইয়া উঁহাকে ধরিয়া নিয়া যায়। আজ শুনিলাম, ফকির সাহেব পাগল হইয়াছেন অনুমানে, তাঁহাকে ঐ দিন পাগ্‌লাগারদে দেওয়া হয়। জেলের দারোগা এবং ডাক্তারের নিকট নীত হইলে, ফকির সাহেব নানাপ্রকার অশ্লীল ভাষায় তাঁহাদিগকে গালি দেন। এই অপরাধে সেই দিনহইতে তাঁহার উপর প্রত্যহ সকালে ও বিকালে পাঁচ পাঁচটি করিয়া দশ ঘা বেতের আদেশ হইয়াছে। প্রতিদিন ফকির সাহেব বেত্রাঘাত ভোগ করিতেছেন।” ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং ফকির সাহেবের মুক্তির জন্য কয়েকটি ভদ্র লোককে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল পদস্থ লোকের চেষ্টায় অচিরেই ফকির সাহেব কারামুক্ত হইবেন।

দুর্গাচরণ ফকির সাহেবের প্রতিশোধ নিলে, তাঁহার আর এই বিষম দুর্দ্দশা ঘটিত না অনুমানে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেহ অন্যায়রূপে অত্যাচার করিলেই কি তার প্রতিহিংসা নেওয়া উচিত?”

ঠাকুর প্রশ্ন শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—“রাম! রাম!! প্রতিহিংসা কি আর মানুষে নেয়, অত্যাচারীকে সর্ব্বদাই ক্ষমা কর্‌বে; অত্যাচারীর মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা কর্‌বে। তবে যিনি অত্যাচার করেন, তাঁরই কল্যাণের জন্য, ভিতরে সম্পূর্ণ ক্ষমা ও শান্তি রেখে, বাইরে একটু কৃত্রিম ক্রোধ দেখায়ে দু' চার কথায় কিছু শাসন ক'রে দিতে হয়। ইহাতে প্রতিফলও দেওয়া হ'ল, অত্যাচারীকে বিষম দণ্ড হ'তে রক্ষাও করা হ'ল। সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা ক'রে ভগবানের হাতে একেবারে ছেড়ে দিলে, অত্যাচারীকে অত্যন্ত দণ্ড পেতে হয়। গয়াতে এরূপ একটি ঘটনা হয়েছিল। গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম, তখন কিছুদিন একটি পরমহংসও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একদিন, পরমহংসের একটি শিষ্য, একাদশীতে নিরম্বু উপবাস ক'রে, দ্বাদশীর দিনে সকালে উঠে ফল্গুতে যেয়ে স্নান কর্‌লেন; বিষ্ণুপদ দর্শন কর্‌তে একটু বিলম্ব হ'ল। সঙ্গে তিনি একটি গোপাল ঠাকুর সর্ব্বদাই রাখ্‌তেন। দ্বাদশীর পারণের সময় অতীত হ'য়ে যেতেছে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন, এবং তাড়াতাড়ি একটি ময়রার দোকানে উপস্থিত হ'য়ে দোকানদারকে বল্‌লেন—'পারণের সময় চলে যেতেছে, আমাকে একটু মিষ্টি দেও, গোপাল ঠাকুরকে ভোগ চড়ায়ে আমি একটু জল

খাব।' দোকানদার তাঁর কথায় কর্ণপাতই কর্‌লে না। সাধু তিন চারবার চেয়েও, 'হাঁ, না' কোনও উত্তর না পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে একখণ্ড বাতাসা নিতে যেমনি হাত বাড়ালেন, অমনি দোকানদার ও তার ছেলে, দোকান থেকে লাফায়ে রাস্তায় প'ড়ে, সাধুকে ধ'রে দারুণ প্রহার কর্‌তে লাগ্‌ল। পূর্ব্বদিন নিরম্বু উপবাস ক'রে সাধু কাতর ছিলেন, তার উপরে এইরূপ প্রহার, একেবারে প'ড়ে গেলেন। রাস্তার লোকেরা বহু চেষ্টায় সাধুকে ছাড়ায়ে দিলেন। সাধু, দোকানদারদের একটি কথাও না ব'লে, উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি ক'রে একটু হেসে নমস্কার ক'রে বল্‌লেন —"ভালারে, দয়াল গুরুজী, তেরা লীলা!" এইমাত্র ব'লে সাধুটি পাহাড়ের দিকে চ'লে গেলেন। পরমহংসজী পাহাড়ে একটি চটানের উপর স্থিরভাবে বসেছিলেন, হঠাৎ চমকে উঠ্‌লেন, এবং চটান হ'তে লাফায়ে নীচে প'ড়ে খুব দ্রুতবেগে গোদাবরী নামক রাস্তার দিকে ছুটে চল্‌লেন। রাস্তার ধারে শিষ্যকে দেখে পরমহংসজী বল্‌লেন, "ক্যা রে বাচ্চা? ক্যা কিয়া?" শিষ্য বল্‌-লেন—'মৈ তো কুছ্ নেহি কিয়া, গুরুজী!' পরমহংসজী বল্‌লেন—'বহুৎ কিয়া। বড়া বুরা কাম্ কিয়া। রামজীকা উপর বিল্‌কুল্ ছোড়্ দিয়া! আকে দেখো, রামজী উস্কা ক্যায়্‌সা হাল্ কিয়া।' এই ব'লে শিষ্যটিকে নিয়ে পরম-হংসজী ময়রা-দোকানের ধারে যেয়ে উপস্থিত হলেন। দেখ্‌লেন—ময়রার সর্ব্বনাশ হয়েছে। সাধুকে মেরে ময়রার ছেলে জ্বালানি কাঠ আন্‌তে যেমনি কাঠের ঘরে ঢুকেছিল, অমনি একটি কেউটে সাপ উহাকে দংশন করে। ময়রা ঘি জ্বাল দিতেছিল, সর্পাঘাতে ছেলে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে শুনেই, উনুনের উপর ঘি রেখে দৌড়িয়ে যেয়ে ছেলেকে ধর্‌ল, আর টানাটানি ক'রে ছেলেকে রাস্তায় এনে ফেল্‌ল। এদিকে উনুনের ঘি জ্ব'লে ময়রার ঘরের চালা ধর্‌ল। পরমহংসজী যেয়ে দেখ্‌লেন, রাস্তায় ছেলেটি মড়ার মত প'ড়ে আছে, ঘরগুলি হু হু ক'রে জ্ব'লে যেতেছে, রাস্তায় লোক দাঁড়ায়ে হাহাকার কর্‌ছে। বিষম ব্যাপার! পরমহংসজী শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে এলেন, শিষ্যকে খুব গাল্ দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন—'বিনা অপরাধে কেহ অত্যাচার

করলে; ক্রোধ না হ'লেও মুখে অন্ততঃ একটা গালি দিয়ে আস্‌তে হয়। মানুষে সামান্য প্রতিফল দিলেও অত্যাচারী রক্ষা পায়, রামজীর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিলে, রামজী গুরুতর শাস্তি দেন। ভগবানের দণ্ড বড়ই বিষম।”

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আশ্রমের অবস্থা।

বৈশাখ মাসের মধ্যভাগে নানাদেশহইতে দীক্ষাপ্রার্থী বহু লোক দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে শত শত স্ত্রীলোক ও পুরুষের দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষার সময়ে গুরুভ্রাতাভগ্নিদের উপরে পরলোকগত বিবিধ অবস্থার আত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ সময়ে উঁহাদের নানা প্রকারের ভাবোচ্ছ্বাস ও অদ্ভুত কথাবার্ত্তা, স্তবস্তুতি, কান্না, অনুতাপ এবং অবস্থার বিচিত্রতা দেখিয়া, একেবারে অবাক্ হইয়া যাই। নিয়ত নবাগত লোকের সমাগমে, প্রায় দেড়মাসযাবৎ এই আশ্রম সর্ব্বদাই যেন সর-গরম হই রহিয়াছে। দিনে রাত্রে লোকের উৎসাহ উদ্যমের বিরাম নাই; আনন্দের একটা স্রোত ্যেন একটানা চলিতেছে। আহারনিদ্রা বাদে, অবশিষ্ট সময় গুরুভ্রাতারা উল্লসিত প্রাণে ঠাকুরেরই সঙ্গ করিতেছেন। ঠাকুরের নিকটে বসিয়াই সকলের আনন্দ, তাঁর কথাতেই সকলে পরিতৃপ্ত, তাঁর দর্শনেই সকলে মুগ্ধ এবং ঝগড়া বিবাদেও, দেখিতেছি, মাত্র তাঁহারই প্রসঙ্গ।

এসময়ে ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ।

প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে কিছুদিনযাবৎ এখন আর ঘরের বাহিরে টে`কা যায় না। আহারান্তে মধ্যাহ্নে ঠাকুর পূবেরঘরেই বসিয়া থাকেন। এক্‌রামপুর হইতে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়াই, ঠাকুর পূবেরঘরের উত্তর দিকে দক্ষিণমুখ হইয়া আসন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবনবাসকালে গেণ্ডারিয়ার গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের আসনের স্থানটি পাকা গাঁথাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনহইতে আসিয়া পাকা গাঁথুনির উপর আর বসেন নাই, ঐ ঘরের দক্ষিণ দিকে উত্তরমুখ হইয়া আসন করিয়াছেন।

ঠাকুর অতি প্রত্যূষে আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যান; শৌচান্তে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল আশ্রমেরই ভিতরে, আমতলার দিকে পা-চালি করেন। পরে কখনও সাধনকুটিরে, কখনও বা পূবেরঘরে আসনে আসিয়া বসেন। প্রায় সাতটার সময়ে চা-সেবা হয়। তৎপরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়, ভাবে গদগদ হইয়া, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

এই পাঠ শুনিতে বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হন। আমি কিন্তু শুধু ঠাকুরকে দেখিতে এবং ঘোষ মহাশয়ের অবস্থা লক্ষ্য করিতেই ঘরে গিয়া বসি। চরিতামৃতগ্রন্থ নমস্কার করিয়া গৌরচন্দ্রিকা পাঠ করিতে করিতেই কুঞ্জ বাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া পড়ে। কিছু কিছু পাঠ করিয়াই পুলকাশ্রুকম্পনে তিনি অবসন্ন হইতে থাকেন। চরিতামৃতের কোন শ্লোকই পরিষ্কার-রূপে উচ্চারণ করিবার তাঁহার আর ক্ষমতা থাকে না। ঠাকুর, ঘোষ মহাশয়ের অস্পষ্ট ভাব-বিহ্বল গদগদ স্বর শুনিয়াই, যেন ডুবিয়া যান। এই পাঠ শেষহইতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। পরে ঠাকুর নিজেই গ্রন্থসাহেব এবং আরও কয়েকখানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন। বেলা প্রায় এগারটাপর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া যায়। এগারটার পরেই ঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া শৌচে যান। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই গা ধুইয়া আসনে আসেন। তিলকসেবা ও ঔষধ সেবনাদিতে প্রায় বারটা হয়।

মধ্যাহ্নে প্রায় বারটার সময়ে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়। তাঁহার ভোজনের পরেই মহাভারতপাঠ আরম্ভ করি। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল মহাভারতপাঠ হয়। পরে ঠাকুর পদ্মাসনে স্থির ভাবে বসিয়া থাকেন। এ সময়ে বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে ঘরে কেহ প্রবেশ করেন না; কথাবার্ত্তাও বন্ধ থাকে। ঠাকুর একখানা পুস্তক হাতে মাত্র রাখিয়া চোখ বুজিয়া থাকেন। অবিশ্রান্ত এক ধারায় অশ্রুবর্ষণ হইয়া, পরিধেয় বহির্বাস পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। ঠাকুর আবেশে, দেহ স্থির রাখিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকেন। পনের বিশ মিনিট কাল এক একবার সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকেন, আবার ধীরে ধীরে উঠিয়া বসেন। প্রত্যহই প্রায় পাঁচটা পর্য্যন্ত এইভাবে কাটিয়া যায়। তৎপরে ঠাকুর আসনহইতে উঠিলে আসন আমতলায় নিয়া পাতিয়া দেই।

অপরাহ্নে সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হন। আম-তলা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় সন্ধ্যাপর্য্যন্ত কাটাইয়া দেন। আমি এই সময় আহারের চেষ্টায় থাকি; সুতরাং এই সময়ের কোন ঘটনাই বিশেষ-রূপে সাক্ষাৎভাবে জানি না। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। রাত্রি প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত মহা আনন্দ উৎসব হইয়া থাকে। প্রায় দশটার সময়ে ঠাকুরের রুটি তরকারি হালুয়া প্রভৃতি ভোগ হয়। আহারান্তে রাত্রি চারিটা পর্য্যন্ত ঠাকুর একভাবে একাসনে বসিয়া থাকেন। চারিটার পর অর্দ্ধঘণ্টাকাল শয়ন করেন। যোগজীবন-প্রভৃতি তিন চারিটি গুরুভ্রাতা রাত্রিকালে ঠাকুরের ঘরে থাকেন। প্রায় পাঁচটার সময়ে ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া ভোরকীর্ত্তন করেন। দিন রাত্রি ঠাকুর এইভাবে অতিবাহিত করিতেছেন।

আষাঢ়।

পরমহংস গৌর শিরমোণির দৃষ্টান্ত—দোষে গুণদর্শন।

আষাঢ়,
১৮৯—:৫ই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরমহংস কাহাকে বলে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"দুধে জলে মিলায়ে হংসের নিকটে ধর্‌লে, হংস জলের অংশ ত্যাগ ক'রে, শুধু দুধের অংশই গ্রহণ করে। সেইরূপ এই অনিত্য মিথ্যা সংসারে যাঁহারা কেবল সার সত্যই গ্রহণ করেন, তাঁহারাই পরমহংস। পরমহংসেরা কেবল সারই গ্রহণ করেন, গুণই দেখেন; দোষ কখনই তাঁহারা দেখেন না। পরমহংসেরা সর্ব্বদাই গুণগ্রাহী হন।"

পরমহংসদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কথা বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে একটি বিষয়বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বহুকাল নির্জ্জনে ভজন সাধন ক'রে পরমানন্দে ছিলেন। ভগবানের চক্র! একবার তাঁর স্ত্রীসঙ্গ হ'লো। বৈষ্ণবসমাজে এই কথা প্রচার হ'য়ে পড়ায়, সর্ব্বত্র তাঁর নিন্দা আলোচনা হ'তে লাগ্‌ল। পতিত হয়েছেন ব'লে, বৈষ্ণবসমাজ ঘৃণার সহিত তাঁর সংশ্রব ত্যাগ কর্‌লেন। গৌর শিরোমণি মহাশয় এই কথা শুন্‌তে পেলেন। একদিন শিরোমণি মহাশয়ের কুঞ্জে মহোৎসব। সমস্ত বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হলেন। সেই সময়ে তিনি ঐ বৈষ্ণব সাধুটিকেও নিমন্ত্রণ কর্‌লেন। সেবার সময়ে আর আর বৈষ্ণবদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বস্‌তে ঐ সাধুটিকেও তিনি অনুরোধ কর্‌লেন। তখন সমস্ত বৈষ্ণব, শিরোমণি মশায়কে বল্‌লেন, "প্রভো, আপনি যা বল্‌বেন বা কর্‌বেন তাই আমাদের শিরোধার্য্য। তবে আমাদের প্রার্থনা যে, এঁর সঙ্গে আমাদের এক পংক্তিতে বস্‌তে আদেশ কর্‌বেন না। ইনি বিষম কুকর্ম্ম ক'রে পতিত হয়েছেন।" শিরোমণি মশায় করজোড়ে সকলকে নমস্কার ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লেন, "আপনারা এরূপ কথা আর বল্‌বেন না। ইনি মহাত্মা। আমাদের প্রতি ইঁহার বড়ই দয়া। এইরূপ একজন মহাত্মা পুরুষও যদি ঐরূপ একটা

গর্হিত আচরণ করেন, সমাজে তাঁকেও যে কত লাঞ্ছনা, নিন্দা, অপমান ও ঘৃণা ভোগ করতে হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের প্রতি দয়া করেই, ইনি এই বিষম ভোগ স্বীকার করেছেন।" এই ব'লে সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে ঐ দীনভাবাপন্ন কাতর বিরক্ত সাধুকে নমস্কার কর্‌লেন এবং সকল বৈষ্ণবকে বল্‌তে লাগলেন, "আমাকেও আপনারা ত্যাগ করুন; সত্যি সত্যি বল্‌ছি, আমি এঁর চেয়েও অনেক অপরাধের কার্য্য করেছি।" এই ব'লে তিনি নিজ জীবনের অতীত ঘটনা সকল বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। তখন সকল বৈষ্ণব, কাণে হাত দিয়া, "প্রভো, থামুন্ থামুন্" বল্‌তে বল্‌তে সাধুকে নিয়ে এক পংক্তিতে সেবা কর্‌তে বস্‌লেন। কেহ গুণেও দোষ দেখেন; কেহ বা গুণকে গুণ, আর দোষকে দোষ দেখেন; কারও চক্ষে আবার দোষই পড়ে না; দোষেও তিনি গুণই দেখেন। সকলই অবস্থাতে হয়।

সাধকজীবনে দুর্দ্দশা। অসারত্ববোধই নির্ভরের হেতু।

একদিন পাঠান্তে ছোট দাদা ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন—"রাধাকৃষ্ণসংবাদে রাধা কি জীবাত্মা, না অন্য কিছু?"

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—এসকল বিষয় অত্যন্ত দুরূহ, এখন বল্‌লে এ সব বিষয় কিছু বুঝ্‌তে পার্‌বে না। অসময়ে বল্‌লে, অবস্থা না হ'লে, ভাবার্থ কেহ হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারে না; কথার বিকৃত অর্থ ধ'রে নিলে, আত্মার অনিষ্ট করে, আর বর্ণিত বিষয়ও দূষিত করে। দেখ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চৈতন্যচরিতামৃত লিখে জীবগোস্বামীকে নিয়ে দিলেন। জীবগোস্বামী মহাশয়, ঐ গ্রন্থ পাঠ ক'রে, উহা প্রচার কর্‌তে নিষেধ ক'রে বল্‌লেন—যদিও এ গ্রন্থদ্বারা ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে, তথাপি ইহাদ্বারা সাধারণ জনসমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট কিছুই হবে না।

সর্ব্বদা নাম কর্‌তে থাক, ভাব, লীলা প্রভৃতি সমস্তই খুলে যাবে। তখন চৈতন্য কে, খৃষ্ট কে, লীলা কি, আপনা আপনি প্রকাশ হবে। সাধন কর্‌তে কর্‌তে ধীরে ধীরে পাঁচটি অবস্থা লাভ হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

এই সকল অবস্থা লাভ করতে হ'লে প্রথম কর্ম্ম করতে হয়, খুব সাধন করা হয়। এ সময় লোভমোহাদি রিপুসকলদ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে, সাধক পুনঃ পুঃ বিষম পরীক্ষায় পড়তে থাকেন; কখনও পরীক্ষায় পরাজিত হন, আবার কখনও ব জয়লাভ করেন। সমুদ্রমধ্যে নাবিক একখানি নৌকা নিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকলে, সে যেমন কখন উর্দ্ধে কখন বা নীচে তরঙ্গের সঙ্গে উঠে নেবে চলতে থাকে, সাধকও সেইরূপ নানা অবস্থার পরীক্ষাতে উঠে প'ড়ে চলতে থাকেন। এই পরীক্ষার সময়ে অনেক সাধকই সাধন ভজন একেবারে ছেড়ে দেন। নানাপ্রকার ক্লেশ, অশান্তি, শুষ্কতা ও নৈরাশ্যে প'ড়ে একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে যান, কিন্তু সারা দিনে যদি এই সময়ে অন্ততঃ চার পাঁচটি বারও নাম করতে পারেন, কোন না কোন-প্রকারে উদ্ধার পান। এই বিষম দুঃসময়ে নামস্মরণই উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এইরূপ পরীক্ষা প্রলোভনে পতিত হওয়াও উন্নতির একটি লক্ষণ। অনেকের দুই তিন জন্ম পর্য্যন্ত এসমস্ত পরীক্ষাই জীবনে আসে না। দীক্ষাগ্রহণের পরে সাধনের অবস্থাতে এসকল প্রলোভন পরীক্ষায় না পড়লে, নিজেকে শোচনীয় অবস্থাপন্ন মনে করতে হয়। এই সকল পরীক্ষায় প'ড়েই মানুষের উন্নতির অবস্থা আরম্ভ হয়। ক্রমে এই সব দুরবস্থায় প'ড়ে নিজেকে যখন একেবারে অপদার্থ জ্ঞান হয়, 'নিজের কোন ক্ষমতাই নাই, নিজ শক্তিতে একটি সামান্য তৃণও তুলতে পারে না' মানুষে বুঝে, ভক্তি তখন হ'তেই বিকসিত হ'তে থাকে। আত্মশক্তি অসার হ'তেও অসার; একমাত্র "ভগবচ্ছক্তিই সার" বুঝলে, তখন সে ভগবানের উপরই নির্ভর করে, এবং ভগবানের কৃপায় তখন তার হৃদয়ে ভগবৎতত্ত্বও প্রকা-শিত হ'তে থাকে।" কিছুকাল পরে নিজহইতেই আবার বলিতে লাগিলেন---"অহঙ্কারটি নষ্ট হ'লে শীত, গ্রীষ্ম, মান, অপমানাদি কিছুরই আর বোধ থাকে না; কারণ, আমিত্ব থাকলেই এই সব থাকে। মানুষ যখন ভগবানে যুক্ত হ'য়ে যায়, তখন সুখ দুঃখ যা কিছু তাদের উপস্থিত হয়, সে সমস্ত ভগবানই গ্রহণ ক'রে থাকেন। ভগবানের কৃপায় ভক্তদের সে সব কিছুই ভোগ করতে হয় না। এই নিয়মেই প্রহ্লাদ অগ্নি, জল, হস্তী ইত্যাদি হ'তে অনায়াসে রক্ষা পেয়েছিলেন।

...বদ্ভক্তেরা ইচ্ছা কর্‌লে অনায়াসেই সমস্ত ভোগ হ'তে মুক্ত থাক্‌তে পারেন, কিন্তু তাঁরা কখনও তা করেন না। ভক্তেরা সমস্ত ভোগ নিজেরাই করেন। প্রকৃতির মধ্যেও এই একটি সাধারণ নিয়ম দেখা যায় যে, যদি পরস্পর এক জনে অন্য জনকে যথার্থ ভাল বাসে, তবে একের কষ্ট হ'লে, অন্যেও তা ভোগ করে; একের শরীরে বেত মার্‌লে, অপরের শরীরেও তার চিহ্ন পড়ে।"

ঐকান্তিক ভালবাসার পরিণাম শুভ—দুইটি দৃষ্টান্ত।

এক দিন মহাভারতপাঠের সময়ে অনেক লোক উপস্থিত হইলেন। পাঠান্তে অনেক কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। সরলপ্রাণে একান্তভাবে সমস্ত চিত্ত একটি স্থানে বসাইতে পারিলে, তাহাহইতেই ক্রমে পরমবস্তুলাভের উপায় হয়। এমন কি, একটি স্ত্রীলোককে ধরিয়াও জীবনের যথার্থ কল্যাণ লাভ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে, ঠাকুর দুইটি গল্প বলিয়াছিলেন, যথা—

"কলিকাতা তালতলায়, কোনও ষ্টুডেণ্টস্‌ মেসের পাশে, একটি সাহেবের বাসা ছিল। সাহেবের একটি অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ছিল। মেসের কোনও ছেলের নজর তাহার উপরে পড়িল। কিছু দিন পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, একে অন্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িল। এক দিন ছেলেটি স্থির থাকিতে না পারিয়া, সাহেবের বাড়ীতেই প্রবেশ করিল। সে দিন সাহেব টের পাইয়া উহাকে খুব ধম্‌কাইয়া দিলেন। কয়েক দিন পরে আবার এক দিন ছেলেটি সাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করায় ধরা পড়িল। সেই দিন সাহেব, দ্বারওয়ান্‌ দ্বারা কিছু অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মেয়েটিরও ভাব-গতিক দেখিয়া সাহেব বুঝিলেন অবস্থা সহজ নয়। মেয়েটিকে অবিলম্বে তফাৎ করা আবশ্যক মনে করিয়া, সাহেব এক দিন মেয়েটিকে লইয়া অন্যত্র যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ছেলেটি তাহা বুঝিতে পারিয়া, রাস্তায় যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব গাড়ী আনাইয়া মেয়েটিকে লইয়া যেমন তাহাতে চাপিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি ছেলেটি দৌড়িয়া গিয়া মেয়েটিকে জড়াইয়া ধরিল। সাহেব তখন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা ছেলেটিকে দারুণ প্রহার করিতে লাগিলেন। মেয়েটি তখন সাহেবের লাঠি ধরিয়া মার থামাইয়া দিয়া পিতাকে বলিল, "তোমার ব্যবহার তো ভয়ানক কসাইয়ের মতন দেখিতেছি! কি দোষ পাইয়া উহাকে এরূপ দারুণ প্রহার করিলে? বহুকাল উনি আমাকে ভাল বাসিয়া

আসিতেছেন, আমিও উঁহাকে মনে প্রাণে ভাল বাসি। উঁর কোনও অপরাধ নাই।"—ইত্যা বলিয়া মেয়েটি সাহেবের সঙ্গে খুব ঝগড়া করিতে লাগিল। সাহেব আর অপেক্ষা ন করিয়া, কন্যাটিকে লইয়া ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া গেলেন, এবং সেখানেই তাহাকে র আসিলেন।

এদিকে ছেলেটি সাহেবের প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া রাস্তায় অনেক ক্ষণ পড়িয়া রহিল সংজ্ঞা লাভ করিয়া 'সে কোথায় গেল, সে কোথায় গেল?' বলিতে বলিতে চারি উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ঐ সময়ে একটি ভাল ফকির, ঐ অবস্থায় উ দেখিতে পাইয়া, উহার পিছন ধরিলেন। অবসর বুঝিয়া ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা কর সমস্ত ব্যাপার জানিয়া লইলেন। ছেলেটি কাঁদিতে কাঁদিতে ফকির সাহেবকে বলি 'ফকির সাহেব! আমাকে দয়া করুন। তাকে পাই, আর না হারাই, এমন উপায় বলি দিন্।' ফকির সাহেব ঐ সময়ে ছেলেটির কাণে একটি মন্ত্র দিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, এ মন্ত্র তুমি অবিশ্রান্ত জপ কর, আর মনে মনে সেই মেয়েটির মূর্ত্তি ধ্যান কর।' এই বলি ছেলেটিকে বাজারের মধ্যে একটি বটগাছের তলায় বসাইয়া দিলেন। ছেলেটি তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় একাসনে থাকিয়া, নয়ন মুদ্রিত করিয়া, মন্ত্রজপসহ মেয়েটির রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। ওদিকে মেয়েটিও, ছেলেটির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্তের মত হইয়া, এক দিন বাহির হইয়া পড়িল, এবং খোঁজ করিতে করিতে অনুসন্ধান পাইয়া, ছেলেটির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েটি তখন ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে, যার জন্যে এত ক্লেশ পাইয়াছ, সে যে আসিয়াছে, এখন চোখ্ মেল।" ছেলেটি কণ্ঠস্বর শুনিয়া একপাশে তাকাইয়া তাহাকে দেখিল, আবার সম্মুখের দিকে চাহিয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে ব্যস্ততার সহিত দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিল, "এ আবার কি? তুমি? না, তুমি? আমি ত দুটি একই আকৃতি দেখিতেছি। কাল থেকে সর্ব্বদাই তো তুমি আমার নিকট রহিয়াছ। আবার তুমি কে?" সাহেবের মেয়েটি, কিছু ক্ষণ উহার ভাবগতিক দেখিয়া, অবশেষে ছেলেটি পাগল হইয়াছে স্থির করিয়া, চলিয়া গেল। ফকির সাহেবের মন্ত্রপ্রভাবে এবং ছেলেটি একান্তচিত্তে ধ্যান ও মন্ত্রজপ করাতে, ভগবান্‌ই তাহার নিকট মেয়ের রূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন।"

এই গল্পটির পরে ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"**স্ত্রীলোকেই হউক, আর যাতেই হউক, সমস্তটি প্রাণ একটা স্থানে ঢেলে দিয়ে, একান্তপ্রাণে একচিত্তে বস্‌তে পার্‌লেই তো হয়! তা কি আর সহজ কথা? তা আর হয় কই? প্রকৃত**

সৌহার্দ্দ আজকাল বড়ই দুর্ল্লভ। এক জনে অন্য জনকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসে, এ বড় দেখা যায় না। অনেক দিন হ'ল শান্তিপুরের একটি ঘটনা দেখেছিলাম। সেরূপ ঘটনা এখন আর শুনা যায় না।"

ঠাকুর এই বলিয়া, ঘটনাটি এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"শান্তিপুরের এক পাড়ার ভিতরে অল্পবয়সে একটি ছেলে ও মেয়েতে ভালবাসা হয়। যেমন উহাদের বয়স হইতে লাগিল, ভালবাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পাড়ার সকলে উহাদের অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া নানা কুকথা বলিতে লাগিল। মেয়েটি এক দিন ছেলেটিকে বলিল, 'দশ জনে নানা কথা বলিতেছে, আর তুমি আমার নিকটে এরূপ এস না।' ছেলেটি ঐ কথা শুনিয়া উন্মত্তের মত হইয়া গেল; দিনরাত বিষম যন্ত্রণা পাইতে লাগিল। অবিলম্বেই মেয়েটির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরে মেয়েটি যখন শ্বশুরবাড়ী চলিল, ছেলেটিও কাঁদিতে কাঁদিতে তার পিছনে পিছনে চলিল। সকলে উহাকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। ঐ সময়ে একটি সন্ন্যাসী ছেলেটিকে দেখিয়া বলিলেন—'আহা! তুমি যদি কোনও দেবতাকে ঐরূপ ভালবাস্‌তে, তা হ'লে এতদিনে উদ্ধার হ'য়ে যেতে। তুমি কোনও দেবতাকে ভাল বাস?' ছেলেটি বলিল 'হাঁ, আমি রামকে বড় ভাল বাসি।' সন্ন্যাসী তাহাকে দীক্ষা দিয়া, রামনাম জপ করিতে বলিয়া গেলেন। পাড়ায় এক বাড়ীতে রামমূর্ত্তি আছেন; ছেলেটি প্রত্যহ সেখানে গিয়া, ঠাকুরের নিকট বসিয়া বসিয়া জপ করিত। জপের সময় ছেলেটির দরদর ধারে অশ্রুবর্ষণ হইত। রামজীকে ভোগ লাগাইয়া, সে প্রত্যহ প্রসাদ পাইত। এমন দেখা গিয়াছে, খাবার নিয়া দুই তিন দিন রামজীর সম্মুখে বসিয়া কান্দিতেছে, তথাপি রামজী প্রসাদ করিয়া না দিলে আহার করে নাই। ঐ ছেলেটি বেশী দিন আর টিকিল না, কিছুকাল পরেই মরিয়া গেল।"

প্রকৃতিতে আসক্তির ছাপ।

আমাদের গুরুভাই বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত রাজকুমার দত্ত শ্রীবৃন্দাবনহইতে আসিবার সময় একটি পিতলের কমণ্ডলু লইয়া আসিয়াছেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের আহারান্তে, ঠাকুর আসনকুটীরে আসিয়া বসিবার পরে, রাজকুমার বাবু কমণ্ডলুটি লইয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এটি আপনার জন্য আনিয়াছি, আপনি এটি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।"

ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইয়া সেটি হাতে নিলেন, এবং এদিক ওদিক দেখিয়া উহা মাটিতে রাখিয়া বলিলেন—"আমার একটি কমণ্ডলু র'য়েছে, এটি নিয়ে অশ্বিনীকে দিন্। অশ্বিনীর বোধ হয় জলপাত্র নাই। আমার আর আবশ্যক নাই।"

রাজকুমার বাবু আর জেদ না করিয়া কমণ্ডলুটি লইয়া গেলেন। আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। আমি ঠাকুরকে বলিলাম—"গ্রহণ করিলেন এই ভাব দেখাইয়া, হাতে লইয়া আবার ফিরাইয়া দিলেন কেন? অশ্বিনীর বোধ হয় জলপাত্র আছে।"

ঠাকুর বলিলেন—"থাক্‌লেও ওটি অশ্বিনীকে দেওয়া ভাল। অশ্বিনীর ওটি নিতে ইচ্ছা হয়েছিল।"

আমি বলিলাম—"নেওয়ার ইচ্ছা শুধু অশ্বিনীর কেন, অন্য লোকেরও ত হ'য়ে থাক্‌তে পারে।"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা হ'তে পারে। তবে একটি জিনিষ দেখে সাধারণ ভাবে নেওয়ার ইচ্ছা এক, আর তাতে আসক্তি হওয়া স্বতন্ত্র কথা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন বস্তুতে কারও একটা আসক্তি হ'লে বস্তুটি মাত্র দেখে, তাহা কি প্রকারে জানা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন—"যার যে বস্তুতে আসক্তি হয়, ঐ বস্তুতে তার একটা আকৃতির ছাপ পড়ে। বস্তুটির দিকে তাকালেই ঐ আকৃতিটি বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি যে কি বল্‌লেন, কিছু বুঝ্‌লাম না। স্বচ্ছ বস্তুর উপরে শুধু মানুষের কেন, সকল বস্তুরই তো প্রতিবিম্ব পড়ে। বস্তুটি সরায়ে নিলে আর তো প্রতিবিম্ব থাকে না। খুব স্বচ্ছ নির্ম্মল না হ'লে প্রতিবিম্বও তো পড়ে না। আর প্রতিবিম্ব পড়্‌লেও তাহা স্থায়ী হয় কই?"

ঠাকুর বলিলেন—"স্বচ্ছ বস্তুতে শুধু নয়। মানুষ যে কোনও বস্তু দেখে, তাতেই তার একটা আকৃতি পড়ে। স্বচ্ছ বস্তুতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা সাধারণে চক্ষে দেখ্‌তে পায় মাত্র। আয়নার কাছে দাঁড়ালে চেহারা পড়ে, আর স'রে গেলে তা থাকে না সত্য; কিন্তু ফটো তুল্‌বার সময়ে, কাঁচে যে ফটো পড়ে, তাহা বদ্ধ হ'য়ে যায়, আর উঠে না। তার কারণ, কাঁচে যে আরক থাকে তাতেই আকৃতি বদ্ধ

হ'য়ে পড়ে। সেইপ্রকার সাধারণ ভাবে সকল বস্তুতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা স্থায়ী হয় না। আসক্তিরূপ আরক যে বস্তুতে লেগে থাকে, তাতে চেহারা পড়্‌লে আর উঠে না, থেকে যায়। চোখ্ যাঁদের একটু পরিষ্কার হয়েছে, দৃষ্টি মাত্রেই তাঁরা তা দেখ্‌তে পান। এসকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হ'লেই মাত্র জানা যায়, না হ'লে শুনে কিছুই বুঝা যায় না। যে কোন বস্তুতে লোভ হবে, তাতেই আকৃতি বদ্ধ হ'য়ে পড়্‌বে, জেনো।"

আমি এসকল কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আসক্তিতে ক'রে বিষয়েতে যে চেহারা পড়ে, তাহা কতকাল স্থায়ী হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"যত কাল যে বিষয়েতে আসক্তি থাক্‌বে, তত কালই তাতে আকৃতি স্থায়ী হবে। আসক্তি নষ্ট হ'লে, আকৃতিও আর থাকে না; ফটোর আরক নষ্ট হ'য়ে গেলে, যেমন আকৃতিও আর থাকে না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"শাস্ত্রে নাকি আছে যে, বিষয়ে আসক্তিই সংসারাবৃত্তির কারণ? বিষয়ে আসক্তিহেতু যে আকৃতি পড়ে, তাহাতেই কি পরলোকগত জীবকে সংসারে টানিয়া আনে?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তাও বটে। সংসারে আস্‌বার আরও সব গুরুতর কারণ থাকে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"যে বিষয়ের সম্বন্ধে মনের যে প্রকার ভাব হয়, ঐ বিষয়েতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা কি সেই ভাবেরই অনুরূপ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ঠিক সেইরূপ।"

আমি বলিলাম—"তবে তো বড় বিষম! গোপন তো কিছু করা যায় না!"

ঠাকুর বলিলেন—"সাধ্য কি যে গোপন কর্‌বে, প্রকৃতিতে যে চেহারা আপনা আপনি নিয়ত পড়্‌ছে, তাতে আর কারও কি হাত আছে? যার চোখ্ আছে, প্রকৃতির দিকে তাকালেই তো মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত নাড়ীনক্ষত্র দেখে নিবে। গোপন কি আর কেউ কিছু কর্‌তে পারে!"

সাধনের অবস্থায় ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য।

অবসর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"যথাসাধ্য সাবধানে থাকিয়া নিয়মম সাধন করিয়া যাইতেছি—অথচ রিপুর উত্তেজনার ক্রমশঃ বৃদ্ধিই তো দেখিতেছি। এইরূপ হইতেছে কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা হয়। যখন যে রিপু একেবারে নষ্ট হবার উপক্রম হয়, তখন তাহা খুব প্রবল হ'য়ে উঠে; নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রদীপের মত। ঐ সময়ে রিপুর উত্তেজনা এতই বৃদ্ধি হয় যে, অনেকের সাধন ভজনেও অবিশ্বাস এসে পড়ে। এই সময়টি বড়ই বিষম। সর্ব্বদাই প্রায় উন্মত্তের মত থাক্‌তে হয়। এই সময়ে গুরুদত্ত নাম যদি একেবারে ত্যাগ না করে, তা হ'লে কিছু কালের মধ্যেই সাধক নিরাপদে উত্তীর্ণ হ'য়ে, উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করে; না হ'লে বিষম দুরবস্থায় প'ড়ে যায়। নাম সর্ব্বদা কর্‌লে আর কোন ভয়ই থাকে না। কত অবস্থাতে পড়্‌তে হবে, তখন নামই একমাত্র অবলম্বন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"মানসিক কোন প্রকার উত্তেজনাই যখন থাকে না, কোন প্রকার কল্পনাও যখন মনে একেবারে আসে না, তখন অকস্মাৎ ইন্দ্রিয় বিষম উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে কেন? এরূপ অবস্থায় কি করা যাইবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"স্নায়ুগুলি খুব দুর্ব্বল হ'লে, অনেক সময়ে ঐরকম হ'য়ে থাকে। ঐ সময়ে কখনও এক স্থানে ব'সে থাক্‌তে নাই, বেড়াইও; না হয় কারও. কাছে যেয়ে গল্প ক'রো। আমার যখন ঐ রকম হ'ত, আমি কয়েক ঘড়া জল অম্‌নি মাথায় ঢেলে দিতাম; কখনও বা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ায়ে হয়রান্ হ'লেই ব'সে পড়্‌তাম। তোমার ঐ সময় স্নান বা দৌড়ান সহ্য হবে না, আসন হ'তে উঠে বেড়ায়ো, তা হ'লেই তোমার আর কোনও ক্ষতি হবে না।"

গুরুদক্ষিণা, গুরুর আনুগত্য ও গুরুর সঙ্গ বিষয়ে প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"পূর্ব্বকালে উপনয়নের পরে গুরুগৃহে থাকিয়া আপন আপন সঙ্কল্প বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া, যখন শিষ্য গৃহে ফিরিতেন, গুরুদক্ষিণা দিয়া যাইতেন। আমাদের কি কোনও সময়ে গুরুদক্ষিণা দিতে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"মোক্ষার্থীদের আর গুরুদক্ষিণা নাই। যাঁরা গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়ন কর্‌তেন, তাঁরাই অধ্যয়ন শেষ ক'রে গুরুদক্ষিণা দিয়ে যেতেন। সদ্‌গুরু দীক্ষা দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আপনার ক'রে নেন্। তাঁকে আর গুরুদক্ষিণা দিবে কি? আমাদের ওসব নাই।"

দীক্ষাদানমাত্রেই সদ্‌গুরু তো শিষ্যকে আপনার করিয়া নেন, কিন্তু শিষ্য যদি গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখেন, তা হ'লে আর বিশেষ লাভ কি হইল? গুরুর অনুগত হ'লেই গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ। তা না হ'লে আর গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যোগ কি? নানাপ্রকার সংশয়ে সর্ব্বদাই তো গুরুতে মতি চঞ্চল করিয়া দিতেছে, সুতরাং এখন আর উপায় কি?—এইরূপ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুরুর অনুগত কি উপায়ে হওয়া যায়?"

ঠাকুর বলিলেন—"গুরুর অনুগত কি প্রকারে হওয়া যায়, তা বলা যায় না। বৃক্ষ কি উপায়ে বড় হয়, ফুল ফলে সুশোভিত হয়, তা কি কেউ বল্‌তে পারে? জল, উত্তাপাদি এসব পেয়ে বৃক্ষ বড় হয়, ফল ফুলে শোভিত হয়, এ পর্য্যন্তই বলা যায়; সেরূপ যথামত গুরুর আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে কর্‌তে মানুষও তেমনি শ্রদ্ধাভক্তি আনুগত্য লাভ করে, এই মাত্র বলা যায়। ঠিক আদেশমত চল্‌তে চেষ্টা কর্‌লেই অনুগত যে কিরূপে হয় বুঝ্‌বে।"

গুরুর নিকটে থাকিয়া গুরুতে নিয়ত ভগবদ্‌বুদ্ধি রাখা অতিশয় কঠিন। সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গুরুতেও অনেক সময়ে চেষ্টা, কার্য্য ও ভুল ভ্রান্তি দেখা যায়। বরং তফাৎ থাকিয়া গুরুতে ভগবদ্‌জ্ঞান সহজ। এই সংশয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুরুর সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া তাঁর সেবা শুশ্রূষা করাতে বেশী উপকার, না তফাৎ থাকিয়া তাঁর আদেশমত সাধন ভজন করাতে জীবনের অধিক কল্যাণ হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"সকলের পক্ষে একরূপ নয়। এক প্রকৃতির লোক আছে, গুরুর নিকটে থাক্‌লে ক্রমশঃ গুরুর প্রতি তাদের সন্দেহ বৃদ্ধি হয়; সুতরাং তেমন উপকার হয় না। আবার কারও গুরুর নিকটে থাকাতেই বেশী উপকার হয়; প্রকৃতি বুঝে। সকলের একরকম নয়। তবে গুরুর নিকটে থাক্‌লে ক্ষতি কারোই হয় না; সেবা শুশ্রূষায় থাক্‌লে, বাৎসল্যভাবই কিছু বেশী হ'তে দেখা যায়।"

ঠাকুরের কথায় এই বুঝিলাম যে, নিকটে থাকিয়া গুরুতে সন্দেহাদি হ'লেও বাৎসল্য

ভাবে যে মমতা ও আকর্ষণ জন্মে, তাহা মহামূল্য। গুরুতে মমতা ও ভালবাস তাঁহাতে সমস্ত সদ্ভাবারোপের হেতু হয়।

বিধিমার্গ ও চঞ্চলতা বিষয়ে উপদেশ।

এক দিন নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার কি আবার সংসারে আস্‌তে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন—**"দেখ, খুব চেষ্টা ক'রে এবার সব সেরে নিতে পার্‌লে, আর আস্‌বে কেন? বাসনাটি জয় করতে পার্‌লে আর আসতে হবে না। বাসনা থেকে গেলেই আবার আস্‌তে হবে।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম—"মোক্ষই যখন আমাদের লক্ষ্য, তখন বিধিপথে আর চল্‌বার প্রয়োজন কি?"

ঠাকুর বলিলেন—**"যত কাল ইন্দ্রিয়দমন না হয়, বিধিমার্গ ধ'রে চল্‌তেই হবে; কিন্তু ঐ সাধনের উদ্দেশ্য একমাত্র মোক্ষই থাক্‌বে। ইন্দ্রিয়দমনের জন্যই বিধিমার্গে চলা প্রয়োজন। অবস্থাটি হ'য়ে গেলে, আর নিজের জন্য বিধির আবশ্যক হয় না। ওটি না হওয়া পর্য্যন্ত, বিধি মেনে চল্‌তেই হবে।"**

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"পূর্ব্বকালে সমস্ত যোগী ঋষিরাই কি মোক্ষের সাধক ছিলেন, না অন্য ভাবেরও ছিলেন?"

ঠাকুর বলিলেন—**"হাঁ, অনেকে মোক্ষের সাধক ছিলেন, আবার অনেকে ত্রিবর্গের সাধকও ছিলেন। সকলে এক প্রকারের ছিলেন না; কত প্রকারেরই ছিলেন।"**

এক দিন ছোট দাদা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নাম করিবার সময়ে মন তো স্থির কিছুতেই হয় না, কি করিব?"

ঠাকুর বলিলেন—**"মন কি সহজেই স্থির হয়? মন স্থির হ'লে ত হ'য়েই গেল। প্রথম প্রথম মন খুব অস্থিরই থাকে, নাম কর্‌তে বিষম বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু এ সময় নাম ছেড়ে দিতে নাই; ঔষধ গেলার মত অনিচ্ছাতেও নাম কর্‌তে হয়। জোর ক'রে এ সময়ে নাম না কর্‌লে হয় না। নাম কর্‌তে কর্‌তে এক**

বার যদি উহা বেশ অভ্যস্ত হ'য়ে যায়, তা হ'লে আর কোন মুস্কিলই থাকে না। নাম খুব অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়্‌তে নাই, সর্ব্বদাই খুব চেষ্টা রাখ্‌তে হয়। চেষ্টা খুব ক'রে যাও, ভগবানের কৃপায় সময়ে সবই হবে।"

আসনের মর্য্যাদা।

আহারান্তে পূবেরঘরে বসিয়া, আজ ঠাকুর আমাকে একটি আসন দেখাইয়া বলিলেন—"এই প্রকার আসন ক'রে সর্ব্বদা বস্‌তে চেষ্টা কর। এটি এমন অভ্যাস কর্‌বে যে, যেখানে সেখানে বস্‌তে হ'লেই এই আসন ক'রে বস্‌তে পার।"

আষাঢ়, ১৬ই—৩২শে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আসন কত প্রকার আছে? এই আসন কি সব চেয়ে ভাল?"

ঠাকুর বলিলেন—"চৌরাশি লক্ষ জীব, আসনও চৌরাশি লক্ষ। তন্মধ্যে চৌরাশিটি প্রধান বলেছেন, এই চৌরাশি আসনের মধ্যে আবার পদ্মাসন ও সিদ্ধাসন শ্রেষ্ঠ। সিদ্ধাসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার উপকারিতা অসাধারণ। সমস্ত আসনেরই একটা একটা প্রয়োজন আছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাধু সন্ন্যাসীরা যেমন বস্‌বার স্বতন্ত্র আসন রাখেন, আমরাও কি সাধন ভজনের জন্য সেরূপ আসন রাখ্‌তে পারি?"

ঠাকুর বলিলেন—"এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, ইচ্ছা কর্‌লে তাঁরা সকলেই স্বতন্ত্র আসন রাখ্‌তে পারেন। তবে আসনের মর্য্যাদা রক্ষা করতে না পার্‌লে, তা না নেওয়াই ভাল।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আসনের মর্য্যাদা কি প্রকারে রক্ষা কর্‌তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"আসন নিয়মমত একটা স্থানে পেতে রেখে, প্রতি-দিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্ততঃ কিছুক্ষণ তাতে ব'সে সাধন ভজন কর্‌তে হয়। ধর্ম্মবিষয়ে যাহা কিছু অনুষ্ঠান, ঐ আসনে ব'সেই কর্‌তে হয়। অন্য কাকেও ওতে বস্‌তে দিতে নাই। অন্যে বস্‌লেই, আসনের গুণ নষ্ট হ'য়ে যায়। আসনের পবিত্রতারক্ষাই আসনের মর্য্যাদারক্ষা। আসন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখাতেই বেশী উপকার। আসন অল্প সময়ের জন্যও তুল্‌তে হ'লে, অন্ততঃ

একটি তৃণও ঐ স্থানে ফেলে রাখ্‌তে হয়, আসনের স্থানটি কখনও একেবারে শূন্য রাখ্‌তে নাই।"

জীবন্মুক্তের কথা—মৃত্যু ও অপমৃত্যু।

আজ মহাভারতপাঠের পরে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"যাঁহারা জীবন্মুক্ত হ'য়ে যান, তাঁহারা ইচ্ছা কর্‌লে আবার কি সংসারে আস্‌তে পারেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ইচ্ছা কর্‌লে আর পার্‌বেন না কেন?"

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সংসারে এলে, সংসারের পাপস্রোতে প'ড়ে তাঁদের কোনও অনিষ্ট হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন—"অনিষ্ট কি তাঁদের আর হ'তে পারে? তাঁরা সংসারে এসে কিছুকাল সংসারের জন্য কার্য্য ক'রে চ'লে যান। সঙ্গদোষে প'ড়ে তাঁদের ভোগের ইচ্ছা হ'লেও, ওতে তাঁরা একেবারে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন না, উপর হ'তেই নানাপ্রকার বাধা আসে। তেমন দেখ্‌লে মহাপুরুষেরাই তাঁদের সরায়ে নিয়ে যান, যেমন লালের হয়েছিল।"

আমি বলিলাম—"লাল তো বিষ খেয়ে মরেছিল। অপমৃত্যু ঘটাতে কি তাকে দণ্ড পেতে হয় নাই?"

ঠাকুর বলিলেন—"লাল বিষ খেয়েছিল বটে, কিন্তু উহার দেহত্যাগের মুহূর্ত্তেই মহাপুরুষেরা মৃত্যুকে আহ্বান ক'রে, ওর জীবাত্মাকে গ্রহণ কর্‌তে বলেন; তাতেই ওর অপমৃত্যু ঘটে নাই, কোন অপরাধেও পড়্‌তে হয় নাই; দণ্ডও হয় নাই।"

এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার বুঝিবার জন্য প্রশ্ন করাতে ঠাকুর বলিলেন—প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে মৃত্যু এসে জীবাত্মাকে গ্রহণ কর্‌লেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়; আর অকস্মাৎ কোনও দুর্ঘটনায় জীবাত্মা দেহে থাকা সত্ত্বেও প্রাণবায়ু বহির্গত হ'য়ে গেলে, ঐ মৃত্যু অস্বাভাবিক হয়। উহাই অপমৃত্যু; ওরূপ হ'লেই অসদ্গতি হ'য়ে থাকে।"

রুদ্রাক্ষধারণের আদেশ ; ব্রহ্মচর্য্যের জন্য উৎকণ্ঠা।

সকাল বেলা আমার নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া, এগারটাপর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে বসিয়া থাকি। আজ দেবীভাগবত পাঠ করিতে করিতে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"তুমি রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ কর্‌লে বিশেষ উপকার পাবে। ভাল পাকাদানা বড় বড় রুদ্রাক্ষ একশ আটটি আনায়ে নেও। কাশীতে ভাল রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায়। খাঁটি রুদ্রাক্ষ পরীক্ষা ক'রে নিতে হয়। নিত্যহোম যাঁহারা করেন, 'যোগপাট' তাঁদের ধারণ কর্‌তে হয়। একটি যোগপাটও আনিয়ে নেও।"

ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কাশীতে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ভারতী (তারাকান্ত গাঙ্গুলী) মহাশয়কে একশত আটটি বড় বড় খাঁটি রুদ্রাক্ষ এবং একটি যোগপাট পাঠাইতে লিখিলাম।

ঠাকুর আমাকে এক বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছিলেন। তাহা ত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই এক বৎসর কতপ্রকার বিষম প্রলোভন পরীক্ষাতে পড়িয়া, ঠাকুরকে ডাকিয়া, তাঁরই অসাধারণ কৃপায় মরিতে মরিতে রক্ষা পাইয়াছি ; উহা মনে হইলে, ভয়ে প্রাণ জড়সড় হয় ; আতঙ্কে অস্থির হই। ঠাকুরের দুর্লভ সঙ্গলাভে সম্পূর্ণ নিরাপদে পরমানন্দে দিন যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহা ত জানি না এই সৌভাগ্য আমার আর কত দিন। যদি কর্ম্মবিপাকে সঙ্গচ্যুতই হই, এ বৎসর আবার কোন্ মুখে, কি সাহসে, ঠাকুরের নিকটে ব্রহ্মচর্য্য লইতে যাইব? এই ব্রতে অটল থাকিতে পারিব, ব্রতদানকালে এরূপ অভয় তিনিই দয়া করিয়া দিয়াছিলেন। এখন একান্তপ্রাণে অহর্নিশ নাম করিতে করিতে এই প্রার্থনাই করিতেছি, ঠাকুর আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে, এবারও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দিয়ে, আমাকে তাঁর শান্তিপ্রদ শ্রীচরণের অনুগত সেবক করিয়া রাখুন।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম বৎসর অতীত।

৩২শে আষাঢ়, বুধবার।

আজ প্রত্যূষে স্নানান্তে জপ, হোম, প্রাণায়াম ও পাঠ সমাপন করিয়া, বেলা প্রায় নয়টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—"আজ আমার ব্রহ্মচর্য্যের এক বৎসর পূর্ণ হইবে।"

ঠাকুর বলিলেন—"কাল থেকে আবার এক বৎসরের জন্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য নিও। নিয়ম যা ছিল তাই থাক্‌বে, বিশেষ কিছু আর কর্‌তে হবে না। ওসব নিয়মই আরও দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালন ক'রে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আগামী বৎসরেও কি হোম কর্‌তে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, হোমটি কর্‌তেই হবে। ব্রাহ্মণের জন্য ত নিত্য-হোমের ব্যবস্থা। গায়ত্রী, হোম কি ত্যাগ কর্‌তে আছে?"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তর্পণ যেমন করিতেছি, এখনও কি তেমনই করিব?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তর্পণটি প্রতিদিনই কর্‌বে। ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ এসব নিত্যকর্ম্ম; এর একটিও বাদ দিতে নাই। যথাসাধ্য এ সকল প্রতিদিনই কর্‌তে হয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ সব যজ্ঞ কি প্রকারে কর্‌তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—

"ব্রহ্মযজ্ঞ—ঋষিপ্রণীত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, সন্ধ্যাগায়ত্রীজপ ইত্যাদি।

পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধতর্পণাদি; অন্ততঃ প্রতিদিনই তর্পণটি কর্‌তে হয়।

দেবযজ্ঞ—হোম, পূজা, যা ক'রে থাক।

ভূতযজ্ঞ—জীবসেবা—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা ইত্যাদি সর্ব্বজীবে সেবা—প্রতিদিনই কর্‌তে হয়।

নৃযজ্ঞ—অতিথিসেবা।

অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

এই সকল প্রতিদিন কেহ নিয়মমত ক'রে গেলে, কিছুদিনেই বুঝ্‌তে পারে এর কি উপকারিতা।"

শ্রাবণ।

দ্বিতীয় বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ।

সকাল বেলা ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিতেই ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"এবার আবার এক বৎসরের জন্য তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দেওয়া হ'লো। এ বৎসরে বিশেষ নিয়ম—পৃষ্ট না হ'য়ে কথা বল্‌বে না; জিজ্ঞাসিত বিষয়েও প্রয়োজন বোধ হ'লেই উত্তর দিবে; উত্তরটি যত সংক্ষেপে হয়, ততই ভাল। খুব প্রয়োজনীয় বিষয়ই মাত্র জিজ্ঞাসা কর্‌বে। এই মত চল্‌তে পার্‌লে খুব উপকার পাবে। পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখ্‌বে। অন্ধকারেও ঐদিকে লক্ষ্য রাখ্‌বে। তার পর নিত্য হোম কর্‌বে এবং অধিক পরিমাণে গায়ত্রী জপ কর্‌বে।"

১লা শ্রাবণ।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"যে সব গ্রন্থ পাঠ ও যে ভাবে হোম এত দিন করেছি, ঠিক তেমনই কি কর্‌ব?"

ঠাকুর বলিলেন—"প্রত্যহ ভোর বেলা স্নান ক'রে এসে, চণ্ডী ও গীতা এক অধ্যায় ক'রে নিত্য পাঠ কর্‌বে। পরে কিছুকাল ইষ্টনাম জপ ক'রে, অন্ততঃ একশত আট বার গায়ত্রী জপ কর্‌বে। তার পর একটু হোম ক'রো। কাঠের বিশেষ নিয়ম রাখ্‌বার আর আবশ্যক নাই। ঘৃতেরও একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ না রাখ্‌লেও চল্‌বে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্রহ্মচর্য্য কি এক বৎসর করেই নিতে হয়?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা কিছু নয়। বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে হয়। তবে তোমাকে এবারও এক বৎসরের জন্যই দিলাম। এক বারে বেশী-কালের জন্য দিতে ভরসা হয় না; যদি নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে ফেল। এক বার ব্রত ভঙ্গ হ'য়ে গেলে, বড় দোষ। নিয়মটি ঠিকমত রক্ষা ক'রে চল্‌লে, আগামী বৎসরে আবার পাবে। এরূপই ভাল।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্রীবৃন্দাবনে যে দিয়েছিলেন, এবারও কি তাই, না কিছু বি আছে? আগামী বৎসরে যদি আমি আপনার সঙ্গে না থাকি, তা হ'লে কি করব?"

ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীবৃন্দাবনে যা পেয়েছিলে তাই; নূতন কিছু নয়। ত বছর বছর ব্রত নিয়ে পাঠ বৃদ্ধি করতে হবে। আগামী বৎসরে আমাকে না পেলেও নিজেই টের পাবে। সেজন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। এর পর একাদশস্কন্ধ ভাগবত ও যোগবাশিষ্ঠ পড়তে হবে।"

আমি আর বেশী কথা না তুলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সরিয়া পড়িলাম।

ক্রোধে স্বপ্নদোষ।

দ্বিতীয় বৎসর ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণের পরে, মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হইল। আহারের চাউলও ফুরাইয়া গিয়াছে। এক এক বারে চারি পাঁচ সের চাউল আনিলে আমার মাসাধিক কাল চলিয়া যায়। বাড়ী যাইয়া কয়দিন নিজেই মাতাঠাকুরাণীর রান্না করিয়া, তাঁহার প্রসাদ পাইলাম। আহারের নিয়ম বাড়ীতে কখনও ঠিক রাখিতে পারি না। মাতাঠাকুরাণীর আগ্রহে, অসময়ে এবং তাঁহার প্রসাদ বলিয়া, মিষ্টি টক ইত্যাদি তিন চারিটি তরকারিও খাইতে হয়। ঠাকুরকে এ সব বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলাতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"মা'র প্রসাদ খুব খাবে; ওতে কোনও ক্ষতি হবে না, উপকারই হয়।" আমারও বেশ সুবিধা হইয়াছে। যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হয়, মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেই বলি; তিনিও খুব আদর করিয়া সেই সকল আমাকে প্রসাদ করিয়া দেন। আশ্রমে যখন থাকি, তখন একমাত্র খিঁচুড়ী ব্যতীত সারা দিনরাত্রিতে আর কিছু খাবার পাই না; ঠাকুরের প্রসাদ ভাগাভাগি এক গ্রাস মাত্র পাইয়া থাকি। এবার নূতন ব্রহ্মচর্য্য লইয়া, খুব কড়াকড়ি চলিব স্থির করিয়া, মাতাঠাকুরাণীর মিষ্টান্ন প্রসাদও গ্রহণ করিলাম না। মাতাঠাকুরাণীর জেদ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধ হইল; খুব ঝগড়া করিলাম, এবং চারি পাঁচ সের চাউল লইয়া আশ্রমে চলিয়া আসিলাম।

শ্রাবণ, ৫ই—৯ই।

আশ্রমে আসিবার পরে ক্রমাগত তিনরাত্রি স্বপ্নদোষ হইল। মাথা গরম হইয়া গেল। এত নিয়মে থাকিয়াও স্বপ্নদোষের উৎপাত কমিল না। ঠাকুরের উপরে অভিমান

াসিল। ঠাকুরকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন ত আমি ঠিক নিয়ম ধরিয়া লিতেছি, তবে আবার স্বপ্নদোষ হয় কেন?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"শুধু আহারের নিয়মই কি নিয়ম? ব্যবহারের নিয়ম, নিয়ম নয়? তা কতটা প্রতিপালন কর? বাড়ী যেয়ে কারও উপর রাগ করেছিলে? রাগ করলে শরীরের রক্ত বিকৃত হয়, তাতেও খুব স্বপ্নদোষ হয়। শরীরের রক্ত সর্ব্বদা শীতল রাখ্‌তে হয়।"

রাগ করিলে স্বপ্নদোষ হয়, আজ এই এক নূতন কথা শুনিলাম এবং লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

ঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার উৎসাহ ও বাধা।

মহাভারতপাঠের পর, শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের কথামত ঠাকুরকে বলিলাম—

১০ই শ্রাবণ, শনিবার।

"আপনার জীবনের কতকটা ঘটনা 'আশাবতীর উপাখ্যানে' বহুকাল হয় লিখেছিলেন, শুনেছি। ঐ পুস্তকে যে পর্য্যন্ত লেখা আছে, তার পরের ঘটনাগুলি জান্‌তে অনেকের খুব আকাঙ্ক্ষা। আপনি যদি অবসরমত একটু একটু ক'রে বলেন, আমি লিখে যেতে পারি।"

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন—"তা বেশ। একটা নিয়ম ক'রে নেও; প্রত্যহ পাঠের পর, মধ্যাহ্নে এক ঘণ্টা ক'রে লিখ্‌লেই হবে। আমি ব'লে ব'লে যাব; কাগজ পেন্সিল নিয়ে ব'সো। ইচ্ছা হ'লে কালথেকেই লিখ্‌তে পার।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। অপরাহ্নে পণ্ডিতদাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, ঠাকুরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলেন। গুরুভ্রাতারা অনেকেই খুব আনন্দিত হইলেন।

আজ মধ্যাহ্নে, মহাভারতপাঠান্তে কাগজ পেন্সিল হাতে লইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—

১১ই, রবিবার।

"আপনি এখন বল্‌লেই আমি লিখে যেতে পারি।"

ঠাকুর একটু সময় স্থিরভাবে থাকিয়া বলিলেন—"ওসব থাক্‌। আশাবতীর উপাখ্যান, বামাবোধিনী পত্রিকায় যখন আমি লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম, সামান্য একটু লিখ্‌তেই চারি দিকে বিষম হৈ চৈ প'ড়ে গেল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হ'য়ে ঐপ্রকার সব লিখ্‌ছি, সাধারণ ব্রাহ্মদের ভিতরে এই নিয়ে তুমুল আন্দোলন

চল্‌লো। প্রাণের সত্য ঘটনার উপরে লোকের অনাদর অশ্রদ্ধা দেখে বড়ই দুঃখ হ'ল। অমনই লেখা বন্ধ ক'রে দিলাম। আশাবতীতে যা লেখা হয়েছে, তা ত কিছুই নয়, অতি সামান্য। তার পরের সব ঘটনা আর অদ্ভুত। সে সব কেহ বিশ্বাস কর্‌বে না, গুলিখোরের গল্প মনে কর্‌বে তাই ওসকল আর প্রচারিত না হওয়াই ভাল।"

ঠাকুরের এ কথা শুনিয়া আমার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। আমি একটু সময় অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঠাকুর পুনঃপুনঃ আমার পানে চাহিতে লাগিলেন। আমি ঠাকুরকে বলিলাম—"আমরা প্রচার কর্‌ব না; শুধু আমাদেরই মধ্যে রাখ্‌ব। জীবনের ওরূপ আশ্চর্য্য ঘটনাগুলি চিরকালের জন্য একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যাবে; কেহ কিছু জান্‌বে না!"

ঠাকুর আমার প্রাণের ক্লেশ বুঝিয়া খুব স্নেহভাবে বলিলেন—"আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই সময়ে তোমাদের নিকটে প্রকাশ পাবে। সেজন্য এখন এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? এখন থেমে যাও, সময়ে সবই হবে।"

ঠাকুরের এই কথার পর আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। ভাবিলাম, ঠাকুর যখন পরিষ্কার বল্‌লেন, '**সময়ে সবই প্রকাশ পাবে**' তখন আর চিন্তা কি? না হয় দু'দিন পরে হবে।

ঠাকুরের ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের কথা।

১৩ই, মঙ্গলবার। মধ্যাহ্নে, পাঠের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সন্ন্যাসগ্রহণ কর্‌তে হ'লে, সকলকেই কি আগে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ক'রে নিতে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"ব্রহ্মচর্য্য না কর্‌লে কখনও বৈদিকসন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কত কাল এই ব্রহ্মচর্য্য কর্‌লে বৈদিকসন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার হয়? ব্রহ্মচর্য্য কি সকলকেই নির্দ্দিষ্ট একটা কালের জন্য কর্‌তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"সকলের পক্ষে এক রকম নয়। কারও ছত্রিশ বৎসর, কারও চব্বিশ বৎসর, কারও বা বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করা আবশ্যক হয়। আবার কেহ নয় বৎসর, কেহ ছয় বৎসর, কেহ বা তিন বৎসর ক'রেই সন্ন্যাস নেবার অধিকারী হন। আমাকে তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে হয়েছিল।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি আবার ব্রহ্মচর্য্য কবে করেছিলেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"দীক্ষাগ্রহণের পরেই আমি সন্ন্যাস নিতে চেয়েছিলাম। পরমহংসজী বল্‌লেন—'এমনি তো হবে না, যথাশাস্ত্র সমস্ত কর্‌তে হবে। তুমি কাশীতে চলে যাও, তোমাকে সন্ন্যাস দিতে হরিহরানন্দ সরস্বতী সেখানে রয়েছেন।' আমি গয়া হ'তে হেঁটে হেঁটে কাশী পৌঁছিলাম। হরিহরানন্দ সরস্বতীর দর্শন পেলাম। তিনি আমাকে বল্‌লেন, 'তোমাকে সন্ন্যাস দেবার জন্যই আমি এখানে এসেছি, সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে তোমার আরও কর্‌বার আছে। অনেক অনাচার করেছ, এখন মস্তক মুণ্ডন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত কর। পরে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কর; তার পরে সন্ন্যাস। আমিও অমনি মস্তক মুণ্ডন ক'রে, প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লাম। পরে উপবীত ধারণ ক'রে, ব্রহ্মচর্য্য নিলাম। তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য করার পরই তিনি আমাকে সন্ন্যাস দিলেন।"

আমি বলিলাম—"সন্ন্যাস নেওয়ার পরেও ত আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেছেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, সন্ন্যাস নিয়ে আমি আর ফির্‌ব না, মনে করেছিলাম। পরমহংসজীকে বলাতে, তিনি বল্‌লেন, তা হবে না। সংসারে তোমার অনেক কাজ কর্‌তে হবে—যেমন ছিলে তেমনি গিয়ে থাক, সংসারেই সব হবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার গৈরিক বসন কি তখন থেকে?"

ঠাকুর বলিলেন—"না, গৈরিক আরও পূর্ব্বে। গয়াতে যখন ছিলাম, পাহাড়ে একটি পরমহংস তাঁর গৈরিক বসন আমাকে দিয়ে বল্‌লেন, "আমার এই গৈরিক বস্ত্র তুমি গ্রহণ কর, আর তোমার নামটি আমাকে দেও।" সেই থেকে আমার গৈরিক।"

ঠাকুরের আরও এরূপ অনেক কথা শুনিলাম।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দৃশ্য।

১৪ই শ্রাবণ, বুধবার।

আজ আমার শরীর অসুস্থ। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের নিকট নামমাত্র মহাভারত পাঠ করিলাম। ঠাকুর ধ্যানস্থ হইলেন; আমিও একপাশে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। ঠাকুর ভাবাবেশে পুনঃপুনঃ ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় একটার সময়ে ঠাকুর অকস্মাৎ যেন চমকিয়া উঠিলেন, এবং

খুব ব্যস্ততার সহিত ঘরের পশ্চিম দিকের দরজার ভিতর দিয়া পশ্চিমোত্তরে আকাশে ... একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"আহা ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর !! কি সুন্দর ! ... সোণার রথ, কি শোভা ! ধন্য ! ধন্য !! ধন্য !!! হলুদ রংয়ের কত পতাকা উড়ছে ! আহা ! সমস্ত আকাশ আজ হলুদ রংয়ের উজ্জ্বল ছটায় একেবারে ঝল্‌মল্‌ কর্‌ছে ! চারি দিকে কত সুন্দরী সুন্দরী দেবকন্যা ! দেবকন্যারা চামর নিয়ে বীজন কর্‌ছেন, অপ্সরা সকল নৃত্য ও গান কর্‌ছেন ! আহা, কত আনন্দ ! আজ গুণের সাগর বিদ্যাসাগরকে নিয়া, আকাশপথে সকলে আনন্দ কর্‌তে কর্‌তে যাচ্ছেন ! মহাপুরুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চল্‌লেন ! হরিবোল ! হরিবোল !! "

ঠাকুর আর কথাবার্ত্তা না বলিয়া চোখ বুজিলেন। সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুমূত্র রোগে শয্যাগত, এরূপ একটা কথা কিছু দিন হয়, সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ রটনার বিরুদ্ধে তখনই প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন—'আমার চৌদ্দ পুরুষেও বহুমূত্র রোগ নাই' ইত্যাদি। উহা পড়িয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ সুস্থ আছেন—এ পর্য্যন্ত এইরূপ সংস্কারই আমার ছিল। সুতরাং ঠাকুরের ভাবাবেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে ঐ সকল কথা শুনিয়া, মনে করিলাম—হয় ত ঠাকুর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিষ্যৎ জীবনেরই একটা চিত্র দর্শন করিয়া ঐ সব কথা বলিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই খবর পাইলাম, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্কুল কলেজাদি সমস্ত বন্ধ হইল। জয় বিদ্যাসাগর—ধন্য বিদ্যাসাগর !

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে ঠাকুর আজ অনেক কথা বলিলেন—দুই একটি মাত্র লিখিতেছি—

ঠাকুর বলিলেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় পুস্তকখানা প্রকাশ হ'তেই সর্ব্বত্র ছেলেদের পাঠ্য হ'লো। আমি ঐ পুস্তকখানা প'ড়ে দেখ্‌লাম, ওতে ভগবানের নাম গন্ধও নাই। আমার মনে বড়ই দুঃখ হ'লো; আমি অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গিয়ে বল্‌লাম, 'সাধারণ প্রয়োজনীয় সকল বস্তুরই খুব সহজে যাহাতে একটা বোধ জন্মে, বোধোদয়খানা সে ভাবেই লিখেছেন। কিন্তু মানুষের, সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা যে বিষয়ের বোধ থাকা বেশী আবশ্যক, সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কথাও বোধোদয়ে নাই।' বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার কথা শুনে, একটু

লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লেন, 'হাঁ, গোঁসাই ঠিকই ব'লেছ। আচ্ছা, আগামী সংস্করণে, গোড়াতেই আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখ্‌বো।' পরে দেখ্‌লাম, বোধোদয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। সকলের কথাই তিনি মন দিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে শুন্‌তেন।"

তার পর মেডিকেল কলেজের গোলমাল সম্বন্ধে, ঠাকুর বিদ্যাসাগরের দয়া ও সৎসাহসের কথা বলিলেন। এ সময়ে আমি দু' একবার আসনহইতে উঠিয়া যাওয়াতে সমস্ত কথা আগা গোড়া শুনিতে পাইলাম না। সুতরাং গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ মহাশয়, ঠাকুরের নিকটে শুনিয়া এ বিষয়ে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে, সেই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ, বাঙ্গালা বিভাগের একটি ছাত্রকে, চোর সন্দেহ করিয়া, পুলিসের হস্তে অর্পণ করেন এবং ঐ বিভাগের ছাত্রেরা প্রায় সকলেই ছোট লোক ও অসভ্য বলিয়া প্রকাশ্যভাবে দোষারোপ করিয়া গালাগালি দেন। ইহাতে ছাত্রেরা সকলেই অতিশয় অপমান বোধ করেন, তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়কে নেতা করিয়া, অনেকেই এককালে কলেজ ত্যাগ করিলেন। সর্ব্বত্র হৈ চৈ পড়িয়া গেল। চারি দিকে এই ব্যাপার লইয়া খুব আলোচনা চলিল। ইহার একটা প্রতিকারের প্রত্যাশায়, গোস্বামী মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে বহুসংখ্যক সহাধ্যায়ীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। দু' চারটি কথা বলিতেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় ধমক দিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন, "যাও, যাও, আমি ওসব কিছু শুন্‌তে চাই না। ছেলেরা অনেক সময়ে মিছামিছি ওরূপ অনর্থক গোল করে।" এই বলিয়া তিনি কোন কথা শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে, গোস্বামী মহাশয় খুব তেজের সহিত বলিলেন—"আপনি আমাদের কোন কথা না শুনেই একটা স্থির ক'রে নিচ্ছেন কেন? আমাদের দু'টা কথা শুনে, পরে যা ইচ্ছা বলুন। বাঙ্গালা বিভাগে যাঁরা পড়েন, তাঁদের কি একটা বংশের বা জাতির মর্য্যাদা নাই? ইহারা সকলেই কি ইতর, ছোট লোক, চোর, বদমায়েস্; আপনিও একথা বলেন?" বিদ্যাসাগর একথা শুনিয়া অমনি চমকিয়া বলিলেন, "কি বল্‌ছ গোঁসাই? এরূপ, কি ব্যাপার বল ত।" তখন গোস্বামী মহাশয় সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"বটে, এ রকম ঘটনা? তবে আর তোমরা কলেজে যেও না। দেখি, আমি ইহার কিছু প্রতিকার করিতে পারি কি না।" এই বলিয়া তিনি তদানীন্তন ছোটলাট বীডন সাহেবের নিকট সমস্ত বিষয়

পরিষ্কার রূপে লিখিয়া জানাইলেন, এবং গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যখন শুনিলেন যে, অনেক ছাত্রের বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে, ঐ বৃত্তির দ্বারাই তাহাদের আহারাদি চলিতেছিল, উপস্থিত তাহাদের অতিশয় ক্লেশ হইয়াছে ; অনেক ছেলে আবার এই বৃত্তির টাকা হইতেই অসহায় বৃদ্ধ মাতাপিতারও কিছু কিছু সাহায্য মাসে মাসে করেন, তখন তিনি সকলের বৃত্তির টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া তিন চারি মাস কাল সকলের প্রায় সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিলেন। বীডন সাহেবের আদেশে এই বিষয়ের অনুসন্ধান হইল। কলেজের অধ্যক্ষের দোষেই যে এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহা প্রমাণিত হইল। এইজন্য অধ্যক্ষকে ত্রুটি স্বীকার করিতে হইল। এই ঘটনায় কলেজের অধ্যাপকগণ গোস্বামী মহাশয়কে দলের নেতা জানিতে পারিয়া, কোন প্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের আর কলেজে যাওয়ার প্রবৃত্তি হইল না ; সুতরাং তাঁহাদের আশা ব্যর্থ হইল। কিছুদিন পরে অন্যতম অধ্যাপক তামিজ খাঁ মহাশয়ের সহিত গোল-দীঘির ধারে গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। তখন তামিজ খাঁ সাহেব, গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন—"গোঁসাই, তুমি কলেজে না যাইয়া বড়ই ভাল করিয়াছ, নচেৎ তোমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত।"

রুদ্রাক্ষধারণ ; নীলকণ্ঠবেশ।

কাশী হইতে রুদ্রাক্ষের মালা আসিয়াছে, উহা ঠাকুরকে দেখাইলাম। ঠাকুর মালাগুলি হাতে লইয়া দেখিয়া বলিলেন—"চমৎকার দানা। **সমস্তগুলিই ভাল, বেশ পাকা। এসব ঠিকমত গেঁথে নেও।**"

১৬ শ্রাবণ, শুক্রবার।

আমি কয়েক দিন পরিশ্রম করিয়া ছুঁচ ও শণের দ্বারা, রুদ্রাক্ষের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সকল শিকড় ছিল, তুলিয়া ফেলিলাম। পরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গেলাম। ঠাকুর দেবীভাগবত খুলিয়া উহা যে প্রণালীতে ধারণ করিতে হইবে, শ্লোক পড়িয়া উহা বুঝাইয়া দিলেন—

> **রুদ্রাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতি দ্বে**
> **ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলকৃতে দ্বাদশ দ্বাদশৈব।**
> **বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভির্নয়নযুগকৃতে ত্বেকমেকং শিখায়াং**
> **বক্ষস্যষ্টাধিকং যঃ কলয়তি শতকং স স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ॥**

আমি ঠাকুরের আদেশমত কণ্ঠে ৩২টি, মস্তকে ২২টি, কর্ণদ্বয়ে ৬টি করিয়া ১২টি, কর-যুগলে ১২টি করিয়া ২৪ টি, বাহুদ্বয়ে ৮টি করিয়া ১৬ টি, শিখাতে ১টি, এবং বক্ষে অবশিষ্ট ১টি, মোট ১০৮টি মালা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গাঁথিয়া রাখিলাম।

আজ ১৬ই শ্রাবণ, একাদশী তিথিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে, পূবেরঘরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া, গ্রন্থি দেওয়া নূতন উপবীত, যোগপাট এবং রুদ্রাক্ষের মালা, ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলাম। ঠাকুর উপবীত হাতে লইয়া দ্বাদশবার গায়ত্রী জপ করিয়া আমার গলায় ফেলিয়া দিলেন। পরে যোগপাট স্পর্শ করিয়া আমার হাতে দিলেন। তৎপরে রুদ্রাক্ষের মালাগুলি হাতে রাখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; অনন্তর উহা আমাকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন—"ইহাই নীলকণ্ঠবেশ।"

আমি ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, ঠাকুরের পাশে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ঠাকুর আজ আমাকে নীলকণ্ঠ মহাদেবের বেশ দিলেন মনে করিয়া, আমার শরীর ও মন পুলকিত হইয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম— "ঠাকুর! দয়া করিয়া আমাকে যেমন এই বেশ দিলে, তোমার দয়াতেই যেন এই বেশের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। নিয়ত যেন অনুগত থাকি।" এগারটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলাম। কি ভাবে যে এই সময়টি আমার চলিয়া গেল, বলিতে পারি না। ঠাকুর শৌচে গেলেন, আমিও আসনহইতে উঠিয়া আশ্রমস্থ সকল গুরুভ্রাতাকে নমস্কার করিলাম। সকলেই প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মধ্যাহ্নে মহাভারতপাঠের পরে, পাঁচটা পর্য্যন্ত পরমানন্দে নামে মগ্ন থাকিয়া, কাটাইলাম।

সাধনে দৈহিক উপসর্গ।

দ্বিতীয় বৎসর ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণের পর নূতন নিয়ম প্রতিপালনের উৎসাহ উদ্যম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া সমস্ত নিয়মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। এখন দিন দিন শরীরের যন্ত্রণা আমার এতই অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, কি করিব বুঝিতেছি না। পদাঙ্গুষ্ঠে সর্ব্বদা দৃষ্টি স্থির রাখিবার জন্য অনবরত একভাবে মাথা হেঁট্ করিয়া থাকিবার ফলে আজ কয়দিনযাবৎ ঘাড়ে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে, সমস্ত ঘাড় যেন পাকিয়া গিয়াছে। এই যাতনা সময়ে সময়ে এতই তীব্র হইয়া পড়ে যে, কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। জিজ্ঞাসিত না হইলে কথা বলিতে পারিব না, এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়েও প্রয়োজন বোধ না হইলে উত্তর দিতে পারিব না, এইপ্রকার আদেশ করিয়া, ঠাকুর আমাকে প্রকারান্তরে মৌনীই করিয়া রাখিয়াছেন। সারা দিনে

২০শে—৩১শে শ্রাবণ।

রাত্রে দুই চারিটি কথাও বলিতে পাই না। প্রাণ সর্ব্বদা আই ঢাই করে; মনে হয়, নির্জ্জনে কোথাও যাইয়া চীৎকার করিয়া আসি। ঘন ঘন হাই তুলিয়া সময় কাটাইতেছি। গুরুভ্রাতারা আমাকে একবার একটি মাত্র প্রশ্ন করিলেই আমি দশটি কথা বলিয়া উত্তর দিব প্রত্যাশায়, যেমনই কারও হাতখানা ধরিয়া টান দেই, সে অমনি কথাটি মাত্র না বলিয়া আমার টিকিটি টানিয়া দু' এক পাক ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দেয়। প্রশ্ন পাইবার আকাঙ্ক্ষায়, কোনও গুরুভ্রাতার গা ঘেঁষিয়া বসিলে, সে উঠিয়া নীরবে আমাকে সজোরে ঠাসিয়া ধরে; আমার তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কখনও কেহ বা গুঁতা মারিয়া সরাইয়া দেয়। হায় কপাল! আহা, উহুঃ শব্দ মাত্র করিয়া ভাগিয়া পড়ি। ঠাকুর আমার অবস্থা বুঝিয়াই দয়া করিয়া সময়ে সময়ে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাই উত্তর দিয়া প্রাণ বাঁচে। আজ ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গেও কি ইচ্ছামত কথা বলিতে পারিব না?"

ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তা ব'লো।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুধু আপনার দিকে চাহিতে পারিব ত?"

ঠাকুর বলিলেন—"মাথাটি না তুলে যদি চাইতে পার, চাইবে।"

স্বপ্নদোষ; হেতু ও প্রতিকারের উপদেশ।

এবার ব্রহ্মচর্য্য লইয়া বীর্য্যধারণের চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছি; কিন্তু কিছুতেই বীর্য্য স্থির রাখিতে পারিতেছি না। ঘন ঘন স্বপ্নদোষ হওয়াতে চিত্ত অতিশয় চঞ্চল ও অশান্তিপূর্ণ হইয়া পড়ে, কিছুই ভাল লাগে না। বীর্য্য কেন স্থির থাকিতেছে না, এত নিয়মে থাকিয়াও স্বপ্নদোষ কেন নিবৃত্ত হইতেছে না, এই প্রকার দুর্দ্দশা আমার কি জন্য হইতেছে, স্থির করিতে না পারিয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুর একটু ধমক দিয়া আমাকে বলিলেন—"দু' দশ দিনের একটু চেষ্টায়ই একটা কিছু হ'তে চাও নাকি? কু-অভ্যাসে ছেলেবেলা বহুকাল বীর্য্য নষ্ট করেছ। তার একটা স্রোত কি একবারেই বন্ধ হয়? এখন খুব নিয়ম ধ'রে কিছুকাল চল্‌লে, ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আস্‌বে। ব্যস্ত হ'লে হবে কেন? ওসব দিকে দৃষ্টি না ক'রে নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখে চল। চিত্ত-চাঞ্চল্যে স্বপ্নদোষ হয়, ক্রোধ কর্‌লে স্বপ্নদোষ হয়, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতায় হয়, পেট গরম ও মাথা গরম হ'লে হয়, আহারের দোষে হয়, আর অতিরিক্ত নিদ্রাতেও স্বপ্নদোষ হয়। সন্ধ্যার পর

কিছুক্ষণ ঘুমায়ে রাত দশটা এগারটার সময় উঠে, সারা রাত্রি ব'সে নাম কর্‌তে পার না ? ঘুমটি কমাও। ঘুম বেশী হ'লে স্বপ্নদোষ যাবে না। শয়নের পূর্ব্বে দুই হাত কনুইপর্য্যন্ত, দুই পা হাঁটুপর্য্যন্ত ধুয়ে নিও। পশ্চিম বা উত্তর দিকে মাথা রেখে শুতে নাই। শোবার সময়ে বেলপাতায় গায়ত্রী লিখে মাথার নীচে রাখ্‌তে পার। তুলসীপাতা রাখ্‌লেও কারও কারও উপকার হয়।"

ঠাকুরের উপদেশ শুনিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলাম, একটু বিরক্তিও আসিল। ভাবিলাম, 'স্বপ্নদোষের কথা ঠাকুরকে বলিলেই ঠাকুর এক এক দিন এক একটি নূতন নূতন হেতু তুলিয়া, নূতন নূতন নিয়ম ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। এও উৎপাত মন্দ নয়! নিদ্রাটি না হয় কমাইয়া ফেলিব ; কিন্তু শয়নকালে ঘাড়টি সোজা রাখিয়া রাত্রিতে যা একটু আরাম পাইতাম, এবার ঠাকুর যে তাও সারিলেন! এগারটার পরে আসনে বসিতে হইলেই ত মাথাটি গুঁজিয়া বসিতে হইবে। অধিক নিদ্রায় স্বপ্নদোষ হয়, একথা আর কখনও শুনি নাই।'

ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার সাধনপ্রণালী।

ঠাকুরের উপদেশমত চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। রাত্রি প্রায় বারটা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া, সারারাত্রি নাম করিয়া কাটাইতেছি। কিন্তু বীর্য্য ত কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছি না। বীর্য্যধারণ না হইলে সাধন ভজন তপস্যা ও ব্রত নিয়মাদি সমস্তই বৃথা মনে করিয়া, অতিশয় অস্থিরচিত্তে ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—"শুনিয়াছি, ঊর্দ্ধরেতাঃ না হইলে কিছুতেই বীর্য্যধারণ হয় না। কি প্রণালীতে সাধন করিলে ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়া যায় ? নিয়মমত চলিলে ঊর্দ্ধরেতাঃ হইতে কত কাল লাগে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়া সাধারণের সহজসাধ্য নয়। আবার নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে যে সকলেই হবে, তাও বলা যায় না। এমন লোকও আছেন যে, তিন দিনের মধ্যেই ঊর্দ্ধরেতাঃ হ'তে পারেন। কারও তিন মাসে হয়, কারও বা তিন বছর লাগে। আবার বহুকাল চেষ্টা ক'রেও কারও কারও হওয়া অসম্ভব হয়। যারা অভ্যস্ত, তাদের একটু সময় লাগে ; শীঘ্র হয় না। তোমার বীর্য্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হ'য়ে গেছে। এজন্য একটু সময় নেবে। নিয়মমত চল্‌তে থাক, বিশেষ ব্যস্ত হবার কোনও আবশ্যক নাই।"

ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার জন্য কি কি নিয়মে চলিতে হয়, ইহা পরিষ্কাররূপে জানিতে ইচ্ছা

হইল। আমি সাহস করিয়া আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"ঠিক নিয়ম ধ'রে চল্‌তে থাক; বেশী সময় তোমার লাগ্‌বে না। এখন থেকে সর্ব্বদা পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির রাখ্‌তে চেষ্টা কর। কখনও অন্য দিকে তাকাবে না। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি রাখ্‌তে নিতান্ত না পার্‌লে, নাসাগ্রেও রাখ্‌তে পার। তবে তাতে মাথা একটু গরম হয়। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টিতে মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকে। অন্ধকার রাত্রেও এদিক সেদিক চাইবে না। সর্ব্বদাই একভাবে মাথা হেঁট্ ক'রে থাক্‌বে।"

ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"আর একটি কাজ ক'রো। প্রস্রাব এক ধারায় না ক'রে, একটু থেমে থেমে ক'রো। দু' চার সেকেণ্ড্ প্রস্রাব ত্যাগ ক'রে আবার দু' চার সেকেণ্ড্ থেমে যেও। এইরূপ ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে, ধারণ ক'রে ক'রে, ত্যাগ কর্‌তে অভ্যাস কর। ধারণের সময়ে খুব কুম্ভক ও সঙ্গে সঙ্গে খুব নাম কর্‌বে। যত ক্ষণ কুম্ভক ক'রে থাক্‌তে পার্‌বে, তত ক্ষণই ধারণের চেষ্টা রাখ্‌বে। অল্প অল্প ত্যাগ ক'রে ক'রে, অন্ততঃ পাঁচ সাত বারে সমস্তটি প্রস্রাব ত্যাগ কর্‌বে। এটি অভ্যাস কর্‌তে কর্‌তে প্রস্রাবের রাস্তার মাংসপেশী খুব দৃঢ় হ'য়ে আস্‌বে; ধারণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি হবে। এখন থেকে এটি বেশ অভ্যাস কর।"

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"স্বাভাবিক কুম্ভক ক'রে সর্ব্বদা নাম কর্‌বে। ধীরে ধীরে প্রতি দমে দমে কুম্ভকের সহিত নাম কর্‌তে পার্‌লে, এবিষয়ে যথেষ্ট উপকার পাবে। এ সকল ক্রিয়া, যার সঙ্গে শরীরের বিশেষ একটা যোগ আছে, হঠাৎ একবারে হয় না; সময় লাগে। নানা কারণেতে নানা অবস্থায় দেহের বীর্য্য মথিত হ'য়ে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে উপস্থের দিকে চলে। বীর্য্যের ঊর্দ্ধদিকে যাবারও একটি সঙ্কীর্ণ পথ আছে। নীচের পথটির মুখ একেবারে বন্ধ না হ'লে, বীর্য্য কখনও ঊর্দ্ধপথে যেতে পারে না। বীর্য্যের স্রোত ঊর্দ্ধপথে দিতে না পার্‌লে, কোনও উপায়েই উহা দেহে রাখা যায় না। বীর্য্য একস্থানে কখনও থাক্‌বার বস্তু নয়। বীর্য্য অধোগামী না হয়, সে জন্য কত

লোকে কত কাণ্ডই করে! শরীরের গরম কমাবার জন্য কেহ শিরা কেটে ফেলেন; কেহ মনের উত্তেজনা কমাতে অঙ্গাদি ছেদন করেন। কিন্তু তাতে যথার্থ কোন উপকারই হয় না। ঐ সকল উপায় অবলম্বন করায় ধর্ম্মজীবনেরও কোন কল্যাণ হয় না। সংযম দ্বারা চিত্ত স্থির রেখে, নামযোগে কুম্ভক দ্বারা বীর্য্য ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ কর্‌তে হয়। কুম্ভক করলেই বীর্য্যের নীচের দিকের পথে চাপ পড়ে, আর উপরের পথও প্রশস্ত হয়; সুতরাং বীর্য্যের গতি নিম্নদিকে আর না হ'য়ে ঊর্দ্ধদিকেই হয়। একবার বীর্য্যের গতি ঊর্দ্ধদিকে হ'লে, উহা আর নীচে যায় না। আমার যখন ঐ রকম হয়েছিল, মনে হ'লো যেন একটা অমৃতের সাগরে আমাকে ডুবিয়ে দিলে। চেষ্টা ক'রে কুম্ভকাদিতে কোনও ফলই হয় না। নামের সঙ্গে অবিশ্রান্ত স্বাভাবিক কুম্ভক ক'রেই এ সব হয়। অস্বাভাবিক কুম্ভকে লাভ নাই। নামের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক'রে এই ভাবে কুম্ভক অভ্যাস কর। এসব বিষয়ে সর্ব্বদা খুব একটা চেষ্টা রাখ্‌তে হয়। দৃঢ়তা না থাক্‌লে বেশী দিন চেষ্টাও রাখা যায় না।"

ঠাকুর এ সকল বলিয়া নীরব হইলেন। আমি কতক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, —"আমার কি কখনও ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার সম্ভাবনা আছে? কত অত্যাচার ত এক সময়ে করিয়াছি।"

ঠাকুর বলিলেন—"অত্যাচার আর এমন কি করেছ? চেষ্টা কর্‌লে কেন হবে না? দেখ, আমারও ত ছেলেমেয়ে হয়েছে। আমিও ত তোমাদেরই মত ছিলাম। স্ত্রীলোক দেখে আমারও কামভাব হ'তো, কত সময় চঞ্চল হ'তাম। এখন কাম যে কি তা কল্পনাতেও আনা যায় না। ঊর্দ্ধরেতাঃ হ'লে তোমারও এই রকমই হবে। সর্ব্বদা শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর, আর স্বাভাবিক কুম্ভক অভ্যাস কর। দমে দমে কুম্ভকের সঙ্গে নাম কর্‌তে পার্‌লে, ঊর্দ্ধরেতাঃ হ'তে পার্‌বে। ঊর্দ্ধরেতাঃ হ'লে শরীরটি সর্ব্বদা বেশ সুস্থ থাক্‌বে। ব্যারাম স্যারাম কিছুই বড় হবে না। অল্প আহার, অধিক আহার, ভাল আহার বা খারাপ আহার কিছুতেই শরীরের কোনও অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না।"

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"বীর্য্যধারণ কর্‌তে হ'লে, আহার বিষয়েও খুব সাবধান হ'য়ে চল্‌তে হয়। আহারের দোষে অনেক সময়ে উত্তেজনা হ'য়ে থাকে। সকল বিষয়েই খুব সতর্কতার সহিত না চল্‌লে, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন।"

আমি অমনই আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"আহার সম্বন্ধে কি প্রকার নিয়মে চলিব?"

ঠাকুর বলিলেন—"আহারটি খুব নির্জ্জনে কর্‌বে। আহারের বস্তু কাহাকেও দেখ্‌তে দেবে না। আহারের সময়ে প্রতিগ্রাসে নাম কর্‌বে। আহারের সময়ে আহারের বস্তু ব্যতীত আর কোনও দিকে দৃষ্টি কর্‌বে না। শুদ্ধ সাত্ত্বিক বস্তুমাত্র আহার কর্‌বে। অধিক ঝাল, অধিক নুন বা অধিক টক খাবে না। মিষ্টি একেবারেই ত্যাগ কর্‌বে। দুধ খাওয়াও ভাল নয়; আবশ্যক হ'লে, সামান্য পরিমাণে একবল্‌কা দুধমাত্র খেতে পার। ঘন দুধ বড়ই অনিষ্টকর।"

এ সব শুনিয়া আমি বলিলাম—"আরও কি কোন বিষয়ে কিছু নিয়ম আছে?"

ঠাকুর বলিলেন—"আছে বই কি? শয়নেরও নিয়ম আছে। যেখানে সেখানে শুতে নাই। শোবার বিছানা সর্ব্বত্রই পৃথক রাখ্‌বে। অন্যের বিছানায় শোওয়া বসা বা অন্যের বস্ত্রাদি ব্যবহার করা একেবারে ত্যাগ কর্‌বে। এই সকল নিয়মে সর্ব্বদা খুব মনোযোগ রেখে চল্‌বে। না হ'লে বিশেষ ক্ষতি হয়। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি যেমন ব্যবহার কর্‌বে না, নিজের ব্যবহারের বস্ত্রাদিও কখন অন্যকে ব্যবহার কর্‌তে দেবে না; সমস্তই পৃথক রাখ্‌বে। অন্যের স্পর্শ পর্য্যন্ত হ'লে এই সাধনের অবস্থায় অনেক সময়ে ক্ষতি হয়।"

ঠাকুরের আদেশমত ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার সাধনপ্রণালী ধরিয়া খুব উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। খিচুড়ি ছাড়িয়া শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত আহার ধরিলাম। সমস্ত দিনে আর কিছুই খাই না। কথা বার্ত্তা বন্ধ করিয়াছি, মাত্র ঠাকুরের সঙ্গে যা ইচ্ছা বলি। শয়নের সময়ে ঘাড় সোজা করিয়া শুইতাম, এখন হইতে ঘাড় বাঁকা রাখিয়া শুইতে অভ্যাস করিতেছি। রাত্রি জাগরণ ঠিক ঠাকুরের কথামত হইতেছে না; কখনও বারটা, কখনও বা একটার সময়ে হয়। নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, যথাসময়ে উঠা ত আর আমার হাতে নয়।

ভাদ্র।

ঠাকুরকে এক দিন বলিলাম—"যখন ইচ্ছা করি, তখন ত ঘুম ভাঙ্গে না, কি কর্‌বো?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, নিজের নাম নিয়ে চীৎকার ক'রে ডেকে ব'লো, 'ওহে! আমাকে আজ রাত এতটার সময়ে তুলে দিও।' এরূপ ক'রে দেখ দেখি!"

আমি বলিলাম—"তা আমি পার্‌বো না। লোকে হাস্‌বে। আমার লজ্জাবোধ হয়।"

ঠাকুর একটু হাসিলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। ইহা সত্য, না ঠাকুর আমাকে তামাসা করিলেন—একবার জানিতে হইবে।

শ্রীধরের বৃষ্টির জলে ভাবাবেশ ও কলহ।

ভাদ্র, ৭ই—১৮ই।

এই বৎসর ভাদ্রমাসে ঝড় বৃষ্টি তুফান খুব বেশী পরিমাণে হইতেছে। এক দিন সকালবেলা পণ্ডিত মহাশয়ের রান্নাঘরে নিজ আসনে থাকিয়া নিত্যকর্ম্ম করিতেছি, অকস্মাৎ ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই এত প্রবল বেগে মুশলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল যে, মনে হইল আজ সমস্ত একাকার হইয়া যাইবে। উঠানে বিস্তর জল দাঁড়াইয়া গেল। দশ বার হাত তফাতে অন্য ঘরের লোক ছায়ার মত দেখা যাইতে লাগিল। এই সময় শ্রীধর, পণ্ডিত দাদার ঘর হইতে 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতে বলিতে, উঠানে নামিয়া পড়িলেন। সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া, করজোড়ে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পরে লেংটিমাত্র পরিধানে—শ্রীধর, উর্দ্ধবাহু হইয়া, উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে, 'জয় রাধে, জয় রাধে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। একঘণ্টা কাল অতীত হইল, শ্রীধরের নৃত্য থামিতেছে না। আকাশহইতে ভগবানের চরণামৃত পড়িতেছে, এই ভাবে মত্ত হইয়া, শ্রীধর পাগলের মত একবার কাদায় গড়াগড়ি, একবার উঠানের চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃই শ্রীধরের হুঙ্কার ও গর্জ্জন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভাবাবেশে শ্রীধর অবিশ্রান্ত নৃত্য করিতে করিতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এসব দেখিয়া আমার মনে হইল, শ্রীধরের প্রায়ই সটকজ্বর হয়, তখন তিনি বিষম যন্ত্রণায় অস্থির হন। এখন যে ভাবেই শ্রীধর মত্তথাকুন না কেন, এত লম্ফঝম্প ও বৃষ্টি ঐ শরীরে কখনই সহ্য হবে না। যে কোন প্রকারে হউক, উঁহাকে একবার থামাইয়া দিতে পারিলে হয়। এই ভাবিয়া আমি শ্রীধরকে ডাকিয়া

বলিলাম—"শ্রীধর! আর না, ঢের হয়েছে। এত লাফানি সহ্য হবে না; এখন থাম।" শ্রীধর আমার কথা শুনিয়াই একবার থমকে দাঁড়াইয়া আমার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিতে লাগিল, পরে আবার নৃত্য আরম্ভ করিল। আমি আবার বলিলাম—"শ্রীধর! এত লাফানি সইবে না, থাম, থাম।"

শ্রীধর খুব বিরক্তির সহিত আমাকে গালি দিয়া বলিল—"চুপ্ শালা, চুপ!"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা, আমি চুপ কর্‌ছি, কিন্তু জ্বর হ'লে তুমিও চুপ থেকো। তখন চীৎকার ক'রে পাড়ার লোককে অস্থির ক'রো না।"

শ্রীধর আমার কথায় বিষম রাগিয়া গিয়া বলিল—"চুপ্ কর্, শালা! এক লাথিতে তোর দাঁতগুলি ভেঙ্গে দিব!" এই বলিয়া শ্রীধর আমাকে পা দেখাইল। আমি ক্রোধে ও অভিমানে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম—"এত আস্পর্দ্ধা, পা দেখালে! আচ্ছা, যদি ব্রাহ্মণ হই, ছ'টি মাস ঐ পা নিয়ে প'ড়ে থাক্‌বে। এই লাফানি, এই পা দেখান তখন মনে কর্‌বে, নিশ্চয় জেনো।"

শ্রীধর মুখ খারাপ করিয়া গালি দিতে দিতে আমাকে বলিল, "আরে শালা! আমি তো ম'রেই আছি। আমার উপর তোর বামণালী তেজ দেখিয়ে, এ লাফানি আর কি থামাবি? তোর উত্তেজনার সময়ে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য যদি থামাতে পারিস্, তবেই জানি তুই বামুণ!" শ্রীধরের ব্যবহারে অত্যন্ত অভিমান ও ক্রোধ হইল বটে; কিন্তু উহার কথাটি বড়ই সত্য, ইহা মনে করিয়া লজ্জিত হইলাম। জিজ্ঞাসিত না হইয়া নিজ হইতে উপদেশ দিতে গিয়াই আমার উপযুক্ত দণ্ড হইল, পুনঃপুনঃ ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। সারা দিন ক্লেশে কাটিল। অবসরমত ঠাকুরের নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"অভিমানটি কিসে নষ্ট হয়?"

ঠাকুর প্রশ্নটি শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"**অভিমান নষ্ট! বড় সহজ কথা নয়। একেবারে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অভিমানটি থাকে। সকল অপেক্ষা নিজেকে হীন ব'লে জান্‌তে হয়। যত দিন নিজেকে দীনহীন কাঙ্গাল ব'লে না বুঝ্‌বে, তত দিন কিছুই হ'লো না, এটি নিশ্চয় জেনো। মুটে মজুর, এমন কি নিতান্ত জঘন্য ইতর লোককেও, আপনা অপেক্ষা ভাল মনে করতে হয়, সকলকেই শ্রদ্ধাভক্তি কর্‌তে হয়। অভিমানের ভাব অণুমাত্র কোনও কারণে ভিতরে এলে, আর রক্ষা নাই। সামান্য বিষয়ে অভিমান জ'ন্মে, কত বড় বড় যোগীরও পতন**

হয়েছে, দেখেছি। ধর্ম্মলাভ বিষয়ে, অভিমান সর্ব্বাপেক্ষা শত্রু। সকলেরই নিকটে মাথা হেঁট ক'রে থাক্‌তে হয়। শুধু নিজের সাধন ভজন নিয়ে থাক্‌লেই কোনও উৎপাতে পড়্‌তে হয় না।"

আজ কয়দিনযাবৎ শ্রীধর সটকজ্বরে শয্যাগত আছেন। বর্ষার জলে ভিজিয়া বাতজ্বরে শ্রীধর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দু'টি পা আর নাড়িবার যো নাই। যন্ত্রণায় অস্থির হইলে শ্রীধর আমাকে ডাকিয়া বলেন, "ভাই! তোর শাপেই আমার এ দশা ঘটিয়াছে। আমাকে ক্ষমা কর্।" শ্রীধরের অবস্থা দেখিয়া, তার কথা শুনিয়া, বড়ই কষ্ট হয়। হায়! সকল প্রকার ভোগই মানুষের ভগবদিচ্ছায় হয়, তাঁরই ব্যবস্থামত সমস্ত ঘটিতেছে; বৃথা অভিমানে আঘাত পাইয়া একটা কথা বলিয়া, আমি কেন অনর্থক নিমিত্তের ভাগী হইলাম?

লোকসঙ্গই ক্রোধ এবং অভিমানাদির হেতু হয় দেখিয়া, ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—"লোকালয় ছাড়িয়া পাহাড় পর্ব্বতে থাকিতে পারিলে, বোধ হয়, অভিমানাদির হাতহইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কি প্রকার অবস্থা হইলে পাহাড় পর্ব্বতে নিরুদ্বেগে থাকা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন—"লোকালয়ে থাক্‌লে অভিমানের অনেক কারণ উপস্থিত হয় বটে, পাহাড় পর্ব্বতে থাক্‌তে পার্‌লে, এ সকল দিকে ঢের নিরাপদ; কিন্তু আহারটি ত্যাগ না হ'লে, নির্জ্জন পাহাড় পর্ব্বতে শান্তিতে থাকা যায় না। আহারের জন্য অস্থির হ'য়ে আবার লোকালয়ে আস্‌তে হয়। আহারের চিন্তায় সকলেই অস্থির। আহারচিন্তায় সাধকদের অনেক সময়ে বিস্তর অনিষ্ট হ'য়ে থাকে। এজন্য অনেক সময়ে সাধুরা কঠোর সাধন ক'রে প্রথমেই আহার ত্যাগ অভ্যাস করেন। আহারটি ত্যাগ হ'লে, ইন্দ্রিয়দমনাদির বিষয়েও বিস্তর উপকার হয়। খুব অধ্যবসায়ের সহিত কিছু কাল নিয়ম ধ'রে চল্‌লে, আহার ত্যাগ করা যায়। সকলের পক্ষেই সহজ নয় বটে, সম্ভবও নয়, কিন্তু কেহ কেহ চেষ্টা কর্‌লে খুব সহজেই কৃতকার্য্য হ'তে পারে। সে চেষ্টা আর কে করে?"

ঠাকুর এই ভাবে উপদেশ দিয়া, আহারত্যাগের প্রবৃত্তি আমার অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। প্রার্থী না হইলে নিজহইতে ঠাকুর কোন বিষয়েই ত প্রায় কিছু বলেন না। তাই খুব আগ্রহের সহিত বলিলাম—"চেষ্টা কর্‌লে আমি আহারত্যাগী হইতে পারি কি? যদি সম্ভব হয়, নিয়মগুলি আমাকে বলুন, আমি একবার সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে দেখি।"

ঠাকুর বলিলেন—"আহারত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছা হ'লে, এখনও তুমি পার। বয়স তোমার বেশী হয় নাই, চেষ্টা কর্‌লে সহজেই পার্‌বে, মনে হয়। আহার-ত্যাগ একবারে হঠাৎ হয় না। প্রণালীমত খুব ধৈর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে অভ্যাস কর্‌তে হয়। যে সকল বস্তু আহার ক'রে থাক, তার মধ্যে অন্নের একটা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট রাখ্‌বে। প্রথম প্রথম আরম্ভেই কম খাওয়া ঠিক নয়। ডাল তরকারি ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস দিয়ে আহার না ক'রে একটি দিয়ে খাওয়া অভ্যাস কর্‌তে হয়। শুধু ডাল ভাত বা শুধু তরকারি ভাত খাওয়া ভালরূপ অভ্যাস হ'লে, ভাতে সিদ্ধ ভাত ধর্‌তে হয়। এ সময়ে প্রয়োজন হ'লে সামান্য পরিমাণে দুধ ঘি খেতে পার। দুধ না খাওয়াই ভাল। ভাতে সিদ্ধ ভাত অভ্যাস হ'লে, ধীরে ধীরে ভাতে সিদ্ধের পরিমাণ কমিয়ে নেবে এবং জল দিয়ে তা পূরণ কর্‌বে। ক্রমে জল ভাত ধর্‌বে। এ সময় খুব সাবধান হ'য়ে ধীরে ধীরে ভাতেরও পরিমাণ কমিয়ে, জলের মাত্রা বৃদ্ধি কর্‌বে। জল ভাত অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নুন ত্যাগ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। নুন ত্যাগ হ'লে, জল-ভাতের সঙ্গে অল্প অল্প ফল খেতে আরম্ভ কর্‌বে। ফলের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি কর্‌বে, ভাতের পরিমাণও তেমনই কমিয়ে নেবে। ক্রমে শুধু জল আর ফল খাবে। এ সময় ফলের সঙ্গে দু' পাঁচটা নিম পাতা, বেল পাতা খেতে আরম্ভ কর্‌বে। পরে ফলের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে পাতার পরিমাণ বাড়িয়ে নেবে। তৎপরে শুধু জল ও পাতা খাবে। খুব ধীরে ধীরে এসব অভ্যাস কর্‌তে হয়; না হ'লে অসুস্থ হ'য়ে পড়্‌বে। খুব দৃঢ়তার সহিত দীর্ঘকাল চেষ্টা কর্‌লে, আহার ত্যাগ করা যায়। আহার ত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছা হ'লে, মিষ্টি এখন হ'তে ছেড়ে দেও। মিষ্টির মধ্যে ফলমাত্র খেতে পার। বীর্য্যধারণই সমস্ত সাধনের মূল। ওটি না হ'লে এসব কিছুই হবে না। বীর্য্যধারণ হ'লে সমস্তই সহজ হ'য়ে আসে।"

সমাধিমন্দির আরম্ভ ; গেণ্ডারিয়ার কথা।

মাঠাকরুণের দেহত্যাগের পরেই ঠাকুরের আদেশে একখানি অস্থি শ্রীবৃন্দাবনে সমাহিত হয়। হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলার সময়ে আর একখানি ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাগর্ভে দেওয়া হইয়াছিল। অপর একখানি অস্থি, সমাধি দিবার জন্য, গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আনা হইয়াছে। ঢাকার গুরুভ্রাতারা চাঁদা তুলিয়া একটি ছোট মন্দির প্রস্তুত করাইতেছেন। গুরুভ্রাতা রাধারমণ গুহ মহাশয় মন্দিরের নক্‌সা আঁকিয়া দিয়াছেন। আশ্রমের দক্ষিণ সীমায় পুকুরের ঠিক উত্তর পাড়ে, আম গাছের তিন চারি হাত তফাতে, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে মন্দিরটি উঠিতেছে। মন্দিরের বনেদ্ খুঁড়িতে সিঁড়ির স্থানে দুইটি মুসলমানের কবর বাহির হইয়া পড়িল।

ঠাকুর বলিলেন—"**কিছু কাল পূর্ব্বেও গেণ্ডারিয়া মুসলমান ফকিরদের সাধন-স্থান ছিল। গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে অনেক স্থানেই মুসলমানদের কবর আছে। ভাল ভাল ফকিরেরা প্রায় অনেকেই চ'লে গেছেন। জঙ্গলে এখনও যে দু' চার জন আছেন, তাঁরা শীঘ্রই চ'লে যাবেন।**"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"যোগিনীমাই'র কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি কি আছেন? তাঁর আসন কোথায়?"

ঠাকুর বলিলেন—"**কিছু দিন হ'ল তিনি মণিপুরের জঙ্গলে চ'লে গেছেন। আনন্দ বাবুর বাগানের দিকে যেখানে আমি বস্‌তাম, যোগিনীমাই সেখানেই প্রায় থাক্‌তেন। আসন তাঁর নির্দ্দিষ্ট একটা স্থানে ছিল না। সর্ব্বদা তিনি গাছে গাছে থাক্‌তেন।**"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সূক্ষ্ম দেহে যে সকল ফকির মহাত্মা আছেন, তাঁরাও কি গেণ্ডারিয়া ছেড়ে চ'লে যাবেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"**যে সকল বৃক্ষ অবলম্বন ক'রে তাঁরা রয়েছেন, সে সব কেটে ফেল্‌লে আর থাক্‌বেন কেন? আনন্দ বাবুর বাগানের ধারে নবকান্ত বাবুর বাড়ীর সীমাতে একটি বড় গাছ ছিল, তা কেটে ফেলাতে দুটি মহাত্মা গেণ্ডারিয়া ছেড়ে চ'লে গেছেন। গেণ্ডারিয়াতে বেশী লোকের বাস হ'লে, সকলকেই বোধ হয়, স'রে পড়্‌তে হবে।**"

গেণ্ডারিয়ার ভূমি বহুকালহইতে মহাত্মাদের সাধনক্ষেত্র শুনিয়া, বড় আনন্দ হইল।

গুরুমর্য্যাদালঙ্ঘনে সিদ্ধ পুরুষের পুনরাবৃত্তি।

শ্রীমতী শান্তিসুধার ছেলে দাউজীর কথা অনেক সময়ে ঠাকুর বলিয়া থাকেন। দাউজী ঠাকুরের নিকট আসিলেই, ঠাকুর কত প্রকারে দাউজীর আদর করেন। দাউজীর মাথায় ফুল দিয়া নমস্কার করেন; 'জয় দাউজী! জয় বলদেব মহারাজ!' বলিয়া আনন্দ করেন। দাউজীর এখনও কথা ফুটে নাই। কিন্তু উহার হাবভাব দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইতেছি। সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে দাউজী, খোল করতালের শব্দ শুনিলেই স্থির ভাবে একদিকে তাকাইয়া থাকে, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। কাণের ধারে 'হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ' বলিতে থাকিলেই ধীরে ধীরে দাউজীর চৈতন্য লাভ হয়।

ঠাকুর বলিলেন—"পূর্ব্বজন্মের সমস্ত কথা দাউজীর স্মরণ আছে। চৌরাশি প্রকার আসন উঁহার অভ্যস্ত ছিল, কিছুই ভুলেন নাই। দাউজী একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে দামোদর পূজারির কুঞ্জে বলরামমূর্ত্তি দাউজী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই দাউজী সেই ঠাকুরেরই সেবা পূজা কর্‌তেন, একান্ত ভাবে উপাসনা ক'রে দাউজী সেই বিগ্রহেরই রূপ লাভ করেছেন।"

ঠাকুরের কথায় এখন বুঝিলাম—যথার্থ ই দাউজীর আকৃতি ঠিক সেই বিগ্রহের অনুরূপ। অনেক সময়ে ভাবিতাম, ছেলের চেহারার সহিত পিতা বা মাতার চেহারার সাদৃশ্য নাই; অথচ এই চেহারা খুব পরিচিত মনে হয়, কোথায় যেন দেখিয়াছি। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাউজী চিরকালই কি জাতিস্মর থাকিবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা কি আর থাকে? কথা বল্‌তে যেমন শিখ্‌বে, স্মৃতিও তেমনই নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাউজী এত বড় সিদ্ধপুরুষ হ'য়েও, আবার এলেন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"এক ক্ষেত্রে গুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করাতেই এবারে দাউজীকে সংসারে আস্‌তে হয়েছে। দাউজী পূর্ব্বজন্মে একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। গুরুর সঙ্গেই সর্ব্বদা থাক্‌তেন। গুরু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। স্ত্রীলোক পুরুষ সর্ব্বদাই তাঁকে দর্শন কর্‌তে আস্‌তেন। এক দিন কয়েকটি স্ত্রীলোক এই মহাপুষের নিকট আস্‌তেই, মহাপুরুষ তাঁদের আদর যত্ন ক'রে বসালেন। একটি ব্রজমায়ী, কতক্ষণ থেকে, হাসি গল্প আনন্দ ক'রে, চ'লে গেলেন। গুরুর

নিকটে স্ত্রীলোক যায় আসে, বসে, কথা বার্ত্তা হাসি গল্প করে—দাউজী একেবারে পছন্দ করতেন না; অনেক সময়ে খুব বিরক্তিই প্রকাশ করতেন। ঐ দিন স্ত্রীলোকেরা চ'লে যেতেই, দাউজী গুরুকে খুব ধমক্ দিয়ে দু' চার কথা বলতে লাগ্‌লেন। দাউজীর গুরুর নিকটে ঐ সময়ে একটি মহাপুরুষ ব'সে ছিলেন। তিনি দাউজীকে বল্‌লেন, 'আরে বাচ্চা! গুরুজীকো এয়সা মৎ বোল্‌না। চুপ রহো।' দাউজী বল্‌লেন, 'কাহে? ওয়াজিব কাহে নেহি কহেঙ্গে?' মহাত্মা বল্‌লেন, 'আরে হাতী কেত্‌না খাতা হ্যায়, কেত্‌না হজম কর্‌তা হ্যায়, তু ক্যায়্‌সে জানোগে। তু তো বিল্লি হ্যায়।' দাউজীর ক্রোধ হ'লো, অমনি তিনি ব'লে ফেল্‌লেন —'হাঁ জী, হাঁ। বহুত বহুত ঐরাবত দেখা হ্যায়।' মহাপুরুষ শুনে বল্‌লেন— 'হাঁ, এয়সা। আচ্ছা, ফের আউর একদফে দেখ্‌নে হোগা, লোট্‌নে পড়েগা।' দাউজীর গুরু অমনই মহাপুরুষের পায়ে প'ড়ে বল্‌লেন, 'ও ছেলে মানুষ, আপনি ওর অপরাধ, দয়া ক'রে ক্ষমা করুন।' মহাপুরুষ বল্‌লেন, 'আর একবার ওর আসাতে বিশেষ কল্যাণই হবে, কোন অনিষ্টই হবে না।' এই জন্যই দাউজীর আসা। পরলোকে থেকে, দাউজী পঁচিশ বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন যাতে আর না আস্‌তে হয়। কিন্তু মহাপুরুষের বাক্য কিছুতেই অন্যথা হ'লো না। মর্য্যাদা লঙ্ঘন বিষম অপরাধ। দণ্ড ভোগ না ক'রে এই অপরাধ হ'তে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না।"

স্বপ্নে লালের সহিত প্রতিযোগিতা।

একটি স্বপ্ন দেখিয়া মনে বড় উদ্বেগ আসিয়াছে। মধ্যাহ্নে ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্তটি বলিলাম—"লাল ও আমি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধদিকে আকাশপথে উড়িয়া যাইতেছি। লাল আমার দু' তিন হাত আগে আগে যাইতে লাগিল। লালের উপরে উঠিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই পারিলাম না। মনে অতিশয় দুঃখ হইল; অমনই আপনার নিকট আসিয়া বলিলাম, 'লাল আমার অনেক পরে দীক্ষা পাইয়াছে, বিশেষতঃ সে জাতিতে শূদ্র। আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া লালের উপরে উঠিতে পারিলাম না কেন? লাল কোন চেষ্টা না করিয়া স্বাভাবিক

গতিতেই যাইতেছে দেখিতে পাইলাম; তথাপি আমা অপেক্ষা দুই তিন হাত আগে আগে চলিল।' ইহা কেন হইল আপনাকে জিজ্ঞাসা করায়, আপনি বলিলেন—"লালের বৈষ্ণব-ভাব, আর তোমার শাক্তভাব।" আর কিছুই বলিলেন না। অমনই জাগিয়া পড়িলাম। এই কথা বলিয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শাক্তভাব ও বৈষ্ণবভাবে পার্থক্য কি?"

ঠাকুর বলিলেন—"শাক্ত ও বৈষ্ণবের চরমে একই অবস্থা লাভ হয়। তবে পথে উপাসনার ভাবের পার্থক্য দেখা যায় মাত্র। যাঁরা বৈষ্ণবপ্রকৃতির লোক, তাঁরা ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই চান না; ঐশ্বর্য্য তাঁদের ভক্তির অন্তরায় মনে ক'রে, তাঁরা তা বিষবৎ ত্যাগ করেন। একান্তপ্রাণে তাঁরা দাসই হ'তে চান। ভগবদ্ভক্তি লাভ ক'রে তাঁরা অভয় পদ প্রাপ্ত হন। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, তাঁরা ইচ্ছা না করলেও, দাস দাসীর ন্যায় সর্ব্বদা তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। আর শাক্তদের অন্য প্রকার—শাক্তেরা প্রথমে ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা ক'রেই কঠোর সাধন করেন; পরে, ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার অলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রে, পৃথিবীর অনেক কল্যাণ সাধন করেন; ঐ প্রকারে সর্ব্বজীবের সেবা ক'রে, ভগবদুপাসনাদ্বারা মোক্ষ লাভ করেন। শেষ অবস্থা সকলেরই এক।"

স্বপ্নটি বোধ হয় আমার অলীক নয়, কারণ ঐশ্বর্য্যের দিকেই ত আমার ঝোঁক বেশী। উর্দ্ধরেতাঃ হওয়া, আহার ত্যাগ করা ইত্যাদি সকলগুলিই ত ঐশ্বর্য্যের ক্রিয়া। তবে এ সকল চেষ্টার লক্ষ্য যখন ভগবান্, তখন ভক্তির সাধন বিনা আর কি বলা যায়? তাঁকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা কিছু করা যায়, সমস্ত ত তাঁরই সেবা!

কালীর অপমানে উৎপাত—পূজায় শান্তি।

কয়েক দিন পূর্ব্বের একটি অতি বিচিত্র ঘটনা, আমারই হাতের লেখা একখানা আল্‌গা কাগজে পাইলাম। ঘটনাটির ঠিক তারিখ বা মাস তাহাতে লেখা নাই এবং আমারও মনে নাই; সুতরাং যেমন লেখা আছে, এই স্থলে তুলিয়া দিতেছি।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়, ঠাকুরের একান্ত অনুগত ও শ্রদ্ধাবান্ সেবক। ঘোষ মহাশয়ের সমস্তটি পরিবারই স্বতন্ত্র রকমের। বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটিহইতে কচি খোকা খুকীটি পর্য্যন্ত কথা বার্ত্তায়, চাল চলনে, আচার ব্যবহারে যেন ঠাকুরের ভাবে

মাথা। দেখিলে মনে হয়, ঠাকুর ভিন্ন এই পরিবারের কাহারই জীবনে আর যেন কিছুই লক্ষ্য নাই। সহজ ভাবে নিঃসঙ্কোচে ঠাকুরের সঙ্গে মিলামিশা, এই পরিবারের ছেলে বুড়োর যেমনটি দেখিতেছি, এমন অল্পই দেখা যায়। কিন্তু, হায় অদৃষ্ট! ঠাকুর-গতপ্রাণ এই পরিবারের ভিতরেও বিষম উৎপাত আরম্ভ হইল।

একদিন প্রত্যূষে উঠিয়া সকলেই দেখিলাম, ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে রক্তবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী আশ্রমসংলগ্ন—ঠিক পূর্ব্ব দিকে। আর কোথাও একবিন্দু রক্তের চিহ্ন নাই; কিন্তু ঐ বাড়ীর উঠানে, ঘাসের উপরে ও গাছের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত প্রায় সর্ব্বত্রই পড়িয়া রহিয়াছে। কুঞ্জ বাবুর স্ত্রী ও ছেলে প্রভৃতি কয়েক জনের সকাল বেলাহইতে জ্বর আরম্ভ হইল। এই জ্বরের মাত্রা, ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া, একশত চার পাঁচ ডিগ্রী পর্য্যন্ত চড়িল। রোগীরা সকলেই শয্যাগত, মূর্চ্ছিতপ্রায়। ঘোষ মহাশয়ের বৃদ্ধা শাশুড়ী, একবার ঠাকুরের নিকটে, আর একবার নিজ বাড়ীতে, ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অবসর পাইয়া বৃদ্ধা, ঠাকুরকে সমস্ত বিপদের কথা পরিষ্কাররূপে জানাইলেন। শুনিলাম, ঠাকুর নাকি বৃদ্ধাকে খুব ধমকাইয়া বলিয়াছেন যে, তাঁরই অপরাধে এ সকল উৎপাত ঘটিতেছে। বৃদ্ধাকে ঠাকুর অপরাধের হেতু নিজহইতে বলিবার পূর্ব্বেই, বৃদ্ধা বলিলেন—"কয়দিন থেকে, নাম কর্‌বার সময়ে, কালীমূর্ত্তি আমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছিলেন। যতই নাম করি, ততই কালী আমার আরও নিকট হইতে থাকেন। আমি অনেকবার কালীকে সরিয়া যাইতে বলিয়াছি, কিন্তু তিনি যান নাই। পরে, ঘর ঝাঁট দিয়া, হাতে ঝাড়ু নিয়া বসিয়া, দরজার ধারে নাম করিতেছি, দেখিলাম কালী সাম্‌নে দাঁড়ান। বারংবার সরিয়া যাইতে বলিলাম, গেলেন না; তখন আমার রাগ হ'লো, হাতে ঝাড়ু ছিল, উহাই ছুঁড়িয়া মারিলাম। তার পর থেকে আর কালীকে দেখি নাই।"

ঠাকুর সমস্ত শুনিয়া খুব ধমক দিয়া বলিলেন—"ক'রেছ কি? কালী কাঁচা-খেকো দেবী, তাঁকে তুমি ঝাঁটা মার্‌লে? লোকে কত সাধ্য সাধনা ক'রে একবার যাঁর দর্শন পায় না, দয়া ক'রে তিনি তোমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, আর তুমি তাঁকে ঝাঁটা মার্‌লে?"

বৃদ্ধা বলিলেন—"আমি ভগবানের নাম করি, তাঁকেই ডাকি; কালী আমার কাছে আসেন কেন? আমি মনে করেছিলাম, কালী আমার সাধনপথের প্রলোভন।"

ঠাকুর বলিলেন—"সে কি? কালী কি ভগবান্ নয়্?"

বৃদ্ধা বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণইতো ভগবান্। নাম ত তাঁরই করি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"দীক্ষাকালে ভগবানের কি কোন নির্দ্দিষ্ট একটি রূপের কথা বলা গিয়াছিল ? সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যিনি রয়েছেন, অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁরই ভিতরে রয়েছে, তিনিই ভগবান্। তিনি কি দ্বিভুজ মুরলীধর, না—চতুর্ভুজা, তা ত কিছুই বলা হয় নাই! তিনি কোন্ রূপে তোমার নিকট প্রকাশ পাবেন, তা তিনিই জানেন। আগে থেকে এ সব কল্পনা কেন ?"

বৃদ্ধা বলিলেন—"তবে এখন কি কর্‌ব ?"

ঠাকুর বলিলেন—"মানসিক ক'রে, গিয়ে কালীপূজা কর। কালীপ্রতিমা এনে ব্যবস্থামত পূজা কর্‌তে হবে।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া, বৃদ্ধা আর কিছু না বলিয়া নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর তখন কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন—"তোমার শাশুড়ী ত শুন্‌বে না। তুমি শীঘ্র কালীপূজা কর, নচেৎ অকল্যাণ হবে।"

ইহার পরই কুঞ্জ বাবুর বাড়ীতে কালীমূর্ত্তি আসিল। ব্যবস্থামত, যথাশাস্ত্র, বেশ সমারোহের সহিত কালীপূজা হইল। এই পূজার দিনে, কি কারণে জানি না, বৃদ্ধার প্রতিনিধি রূপেই হউক, অথবা একটি ব্রাহ্মণের উপবাস করা ব্যবস্থা বলিয়াই হউক, ঠাকুর আমাকে নিরম্বু উপবাস করিতে বলিলেন। আমিও সারা দিন রাত্রি উপবাস করিয়া রহিলাম।

রাত্রিতে কালীপূজা আরম্ভ হইলে, ঠাকুর যাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া করজোড়ে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব্ব দর্শন বিষয়ে ঠাকুর পরে এক সময়ে যাহা লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল—

ঠাকুরের স্বহস্তে লেখা—"প্রথম দেখিলাম, মা কালী নৈবেদ্যের আমটি মাথায় লইয়া বসিয়া আছেন। পরে দেখিলাম, মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রকে স্কন্ধে লইয়া দণ্ডায়মান। তদনন্তর দেখিলাম, গরুড়ের স্কন্ধে বিষ্ণু রহিয়াছেন। পরে দেখি, মহাদেবের উপরে কালীমূর্ত্তি। তাহার পরে দেখিলাম, বলরামের বুকের উপর রাধাকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। অনন্ত ভাব, কে বুঝিবে!"

এই পূজায়, ঠাকুরের আজ্ঞানুসারে কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষু বলিদান হইল। বহু গুরুভ্রাতা ভগ্নী পূজার পরদিন, পরম পরিতোষে প্রসাদ পাইলেন।

কালীপূজা হইয়া গেল, পরে অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার অজ্ঞাতসারেই কি কালী এরূপ একটা উৎপাত ঘটাইলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তাকি কখনও হবার যো আছে ? কালীকে ঝাঁটা মার্‌তেই কালী এসে আমতলায় বল্‌লেন্—'দেখ্, আমাকে আহ্বান ক'রে অপমান করেছে ; আমি ওকে একটু শিক্ষা দিতে চাই।'—তার পরই এই সব।"

আমি বলিলাম—"বৃদ্ধার আর এতে কি শিক্ষা হ'লো ?"

ঠাকুর বলিলেন—"যা হয়েছে, তাই যথেষ্ট।"

আমি বলিলাম—"কেন, কালী ঐ বুড়ীকে কিছু কর্‌তে পার্‌লেন না ?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"ও বুড়ী যে বড় সহজ বুড়ী নয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি ভদ্র লোকের বাড়ীতে, বহুকাল থেকে একটি কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঐ ভদ্রলোকের মাঠাকরুণ খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত প্রত্যহ তাঁর সেবাকার্য্য করেন। ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি বাড়ী গেলেই, কালীর প্রতিমা ফেলে দিতে চাইতেন, আর মন্দিরের বারেন্দায় নানাপ্রকার অনাচার কর্‌তেন। কালী এক দিন বৃদ্ধাকে স্বপ্নে বল্‌লেন, 'ওগো ! সাবধান থাকিস্। তোর ছোট ছেলে যে বড় বিষম অত্যাচার আরম্ভ করেছে। নিষেধ ক'রে দিস্। আবার ঐরূপ কর্‌লে, আমি তোর বড় ছেলের ঘাড় মট্‌কাব।' বৃদ্ধা বল্‌লেন, 'কেন মা, বড় ছেলের ঘাড় মট্‌কাবে কেন ? বড় ছেলে ত কোন অপরাধ করে নাই। ঘাড় মট্‌কাইতে হয় ত ছোট ছেলেরই ঘাড় মট্‌কাও না কেন ?' কালী বল্‌লেন, ওগো, সে যে আমাকে একেবারেই মানে না, কিছুই গ্রাহ্যি করে না ! তাকে আমি পার্‌বো না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"একই স্থানে দীক্ষা লাভ ক'রে, একই নাম জপ ক'রে, কেহ কালী দেখেন, কেহ বা কৃষ্ণ দেখেন, আবার কেহ কেহ অন্য দেবদেবীও দেখেন, এরূপ হয় কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"যে যে বংশের, তার নিকটে প্রথম প্রথম সেই বংশের কুলদেবতাই প্রায় প্রকাশ হন্। পরে ক্রমে ক্রমে সবই হ'য়ে থাকে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"নাম করিতে করিতে যাহা কিছু প্রকাশ হয়, কি প্রকার ব্যবহার করিলে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"নাম করতে করতে যা কিছু প্রকাশ পাবে, খুব শ্রদ্ধা ভক্তি ক'রে নমস্কার ক'রে, সেখানেই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতে হয়। ওরূপ করলেই কল্যাণ হয়।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি আশীর্ব্বাদ চাইতে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"ভগবানের চরণে মতি গতি হউক, তাঁর চরণে ভক্তি হউক, এই মাত্র আশীর্ব্বাদ চাইলে তাঁরাও সন্তুষ্ট হন্‌।"

গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা

ভাদ্র, ১৮ই—৩১শে।

কিছুদিন হইল, ঠাকুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে, গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত* পণ্ডিত মহাশয় ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় † প্রভৃতিকে লইয়া একটি প্রসিদ্ধ, সিদ্ধ ফকির সাহেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই ফকির সাহেবকে সকলেই শা সাহেব বলেন। শা সাহেবের একটি যুবক শিষ্য আছেন, তিনিও মুসলমান। এই শিষ্যটির অদ্ভুত অবস্থা ও অসামান্য গুরুভক্তির কথা ঠাকুর সময়ে

* পণ্ডিত ৺শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।—ঢাকা, বিক্রমপুরে, তেজপুর রশুনিয়া গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি কিছুকাল অধ্যাপনা কার্য্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে ইঁহার অসামান্য অনুরাগ ছিল। ইঁহার উৎসাহপূর্ণ জীবনে সত্যনিষ্ঠা ও সাধনশীলতা দেখিয়া, পূর্ব্ববঙ্গের অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রতিমাপূজা অপরাধ যখন মনে হইল, সেই দিন হইতে, পূজার সময়ে পাছে ঢাকের শব্দ কাণে যায়, এই ভয়ে তিনি সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন।

ঠাকুরের নিকট ইনিই নাকি সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি আর ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া প্রায় হন নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী একটানা অসাধারণ সাধনচেষ্টা এবং দুর্লভ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পরে, ইনি ঠাকুরের সমাধি আশ্রমেই শেষদিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালের ২০শে ফাল্গুন তারিখে দোলপূর্ণিমার দিনে ইনি দেহত্যাগ করেন।

† ৺মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, B L, নিবাস দমদমার নিকট কেদেটি গ্রাম। ইনি একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিছুকাল পরেই, ইনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঠাকুর পূর্ব্ব-বঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করার পর, মন্মথবাবু, উপাচার্য্যের কার্য্য করি-

সময়ে বলিয়া আনন্দ করেন। ঐ দিনের ঘটনাটি যেমন শুনিলাম, লিখিয়া রাখিতেছি—বৃদ্ধ শা সাহেবর একপাশে শিষ্যটি নাড়ুগোপালের মত উপবিষ্ট থাকিয়া করজোড়ে গুরুর দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছেন; যেন কোন হুকুম পাইলেই তাহা তামিল করিবেন, এই ভাবে ব্যস্ততার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন। কখনও কখনও ময়দানের দিকে তাকাইয়া চমকিয়া উঠিয়া, অমনি হাতে ঠেঙ্গা লইয়া বিস্তৃত মাঠে ছুটাছুটি করিতেছেন, শূন্য স্থানেই দু' হাতে ঠেঙ্গা চালাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, 'আরে, উধার যা, হট্; এধার কাহে আয়া? কিষণ্জী ত ওধার গিয়া।' কখনও বা শূন্য মাটির উপরে লাঠি মারিয়া বলিতেছেন, 'আরে শালা! বলাইজীকা বাত নেহি মান্তা? মারেঙ্গে ডাণ্ডা, তো মালুম্ হোই।' এই শিষ্যটির নিকট অনেক সময়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ লীলা প্রকাশিত হয় এবং ইনিও তাহাতে যোগ দেন। গরু বাছুরদের বেচাল দেখিলে, সময়ে সময়ে ঠেঙ্গা হাতে লইয়া, ইনিও গিয়া শাসন করিয়া থাকেন।

ঐ দিন শা সাহেব একটু চিন্তাযুক্ত ভাবে বসিয়া আছেন, কি যেন ভাবিতেছেন; দেখিয়া শিষ্যটি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"শা জী? আপ্ দুঃখী কাহে ভ্যায়া?"

শা সাহেব বলিলেন—"আরে, গুরুজীকা হুকুম হুয়া, শাদি কর্নেকো।" শিষ্য বলিলেন—"বাঃ, আচ্ছা তো। গুরুজীকা হুকুম, ও তো কর্নেই হোগা। আপ্ শাদি কীজিয়ে।" শা সাহেব বলিলেন—"আরে তু' তো কহতে হো, আব্ লেড়্কী হাম্‌কো কোন্ দেগা? মে তো বুঢ্‌ঢা হো গ্যায়ি।" শিষ্য বলিলেন—"কাহে গুরুজী, হাম দে দেতে। হামারা জরুকো আপ শাদি কি জিয়ে।" শা সাহেব বলিলেন—"সো ক্যায়্‌সে হোগা, তু জিন্দা হ্যায়। খসম্ মর্‌ণেসে জরুকো নিকা হো সেক্‌তা হ্যায়।" শিষ্যটি একটু সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, হাতে তালি দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা তো, গুরুজী! আচ্ছা তো; উস্‌মে মুশ্‌কিল ক্যা? আভি হাম্ মর্ যাই, হামারা জরুকো আপ্ নিকা কীজিয়ে।" শা সাহেব শিষ্যটিকে অনেক করিয়া থামাইলেন, শিষ্যটি এক একবার চমকিয়া উঠিয়া শা সাহেবকে কেবলই বলিতে লাগিলেন, "গুরুজীকা হুকুম, ও তো কর্নেই হোগা।"

তেন (পূর্ব্বেও করিয়াছিলেন)। তখন ইঁহার উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া অনেকে মনে করিতেন, বুঝি এই ব্যক্তির দ্বারা ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অভাব পূর্ণ হইবে। ইঁহার বক্তৃতাকালে শ্রোতৃগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত অভিভূত হইয়া থাকিতেন। কিছুকাল পরে, অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন; পরে কাণপুরে ওকালতি কার্য্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া, অবশিষ্ট জীবন তথায়ই অতিবাহিত করিলেন।

শা সাহেব, বোধ হয়, শিষ্যের গুরুভক্তি দেখাইতেই উপস্থিত ভদ্রলোকদের নিকট এই খেলা খেলিলেন। অদ্ভুত শিষ্য! অদ্ভুত দৃষ্টান্ত!!

শা সাহেবের সাধন ও আমাদের সাধনে পার্থক্য কি, একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে এই প্রশ্ন করিলে, ঠাকুর বলিলেন—"**এঁদের সাধনে নিজেদের পুরুষকারই প্রধান, গুরুকৃপাও চাই। আমাদের সম্পূর্ণ গুরুকৃপা, পুরুষকারের কিছুই অপেক্ষা করে না। এই মাত্র।**"

শ্রীধরের উপহাস ও শিক্ষাদান।

কিছুকালযাবৎ শ্রীধর পীড়িতাবস্থায় আছেন। সময়ে সময়ে সটকজ্বরে অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। উপস্থিত শ্রীধরের উপস্থের অগ্রভাগে একটি ফোড়া হইয়া বিষম যন্ত্রণা দিতেছে। অনভিজ্ঞ একটি গুরুভ্রাতাকে যন্ত্রণা উপশমের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"বেশ করিয়া কষ্টিক লাগাইয়া দেও, ফোড়া সারিয়া যাইবে।" শ্রীধর আর দ্বিধা না করিয়া আচ্ছা করিয়া তাহাতে কষ্টিক লাগাইয়া ভয়ানক ঘায়ের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। এখন শ্রীধর দিনরাত চীৎকার ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। মহেন্দ্র দাদা, শ্রীধরকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভাই শ্রীধর! কি হয়েছে?" শ্রীধর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, অমনই সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জবাব দিলেন—"আরে ভাই! আর কি হবে? দুষ্কৃতির ভোগ! সে দিন ঐ কুকুরটা এখানে এসেছিল।—কি আর বল্‌ব—বেগ সামলাতে পার্‌লাম না, তাই কুকর্ম্মের ফল। হায় কপাল!"

মহেন্দ্র দাদা, পাগ্‌লা শ্রীধরের প্রকৃতি জানেন, মাথা গরম হইলে শ্রীধর সবই বলিতে পারেন, সবই করিতে পারেন, তাই আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিলেন, এবং অবসর মত শ্রীধরের কথা ঠাকুরকে বলিলেন।

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন—"**রাম! রাম! ওসব কিছু নয়, কিছু নয়। শ্রীধরের মাথা গরম হ'লে, ওরূপ ঢের মিথ্যা কথা বলে। ঔষধ দিয়ে ঘা করেছে।**"

মহেন্দ্র দাদা ভাবিলেন—মাথাপাগলা শ্রীধর দ্বারা সব কাজই ত সম্ভব। শ্রীধর নিজেই ত তাঁর দুষ্কৃতির কথা বলিলেন, শ্রীধরের দুষ্কার্য্য গোপন করিবার জন্যই ঠাকুর, শ্রীধরের

কথা একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে, মহেন্দ্র দাদা এক দিন শ্রীধরকে কথায় কথায় বলিলেন—"শ্রীধর! তোমার রোগের কথা সমস্ত গোঁসাইকে যাইয়া বলিয়াছিলাম; তিনি 'ওসব কিছু নয়, শ্রীধর মিথ্যা কথা বলেছে, ঔষধ দিয়ে ঘা করেছে' বলিয়া, তোমার সব কথা ঢাকিয়া দিলেন।" শ্রীধর শুনিয়া মহেন্দ্র দাদার দিকে একটু চাহিয়াই খল্‌খল্‌ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"মিত্রি! এবার তুমি ঠ'কে গেলে। আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর্‌লে, আর গোঁসাইয়ের কথায় বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না!" মিত্রি দাদার তখন হুঁস্‌ হইল; তিনি একটু লজ্জিত হইলেন। অনেক সময় গুরুভ্রাতাদের নিকটে এই বিষয় বলিয়া, মিত্রি দাদা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। ঠাকুরের এমন নিষ্ঠাবান্‌ ভক্তেরও যখন এই প্রকার মতিভ্রম হয়, তখন আমি আর কোথায় আছি?

শ্রীধরের অবস্থা ও প্রকৃতি।

শ্রীধর, ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণের পর, ঠাকুরের সঙ্গছাড়া কখনও হন নাই বলিলেই হয়; বিশেষ প্রয়োজনেও শ্রীধর, ঠাকুরের সঙ্গত্যাগে নারাজ, উহা যেন যমযাতনা মনে করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে শ্রীধরকে একান্ত ভজনপরায়ণ, শান্ত, সরল, নিষ্ঠাবান্‌, বিশ্বাসী এবং অতি মধুর প্রকৃতির এক জন ভাবেমগ্ন মহাপুরুষ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। আবার মাথা গরমের অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বিষম পাগল বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রের উদয়ের সময়হইতে শ্রীধরের মাথা গরমের সূচনা হয়, আর চন্দ্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমশঃ চড়িতে থাকে। একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীধর কোথায় কি অবস্থায়, কোন্‌ রূপ ধরিবেন, কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। এই সময়ে আশ্রমস্থ সকলেই সশঙ্কিত থাকেন, কখন শ্রীধর কার ঘাড়ে চাপেন। কিন্তু এই উন্মাদ অবস্থায়ও শ্রীধর কোন না কোন প্রকারে ধর্ম্মেরই একটা অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারেন না। গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ীহইতে, তাহাদের জ্ঞাতসারে ঝগড়া করিয়া বা অজ্ঞাতসারে, প্রয়োজনীয় কাঠ-কুটা সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালেন এবং দিনরাত একভাবে বসিয়া ধুনি তাপিতে থাকেন। কখনও একতারা বাজাইয়া মধুর স্বরে গান করিতে করিতে ভাবে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। আবার কখনও বা অন্যে পছন্দ না করিলেও, নিজহইতেই ঘাড়ে পড়িয়া, কাহাকেও ধর্ম্ম উপদেশ করিতে করিতে অস্থির করিয়া তুলেন। এ সময়ে শ্রীধর কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম্মবুদ্ধিতেই লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া, খুব নির্ভীক ও

সরল ভাবে দশ জনের নিকট তাহা বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে থাকেন। মধুরপ্রকৃতি শ্রীধরকে মাথা গরমের অবস্থায়ও প্রায় সকলেরই মধুর লাগে। যখনই শ্রীধর যেখানে থাকুন না কেন, সকল অবস্থায়ই শ্রীধর আনন্দে ডগমগ। নিতান্ত বিমর্ষ ব্যক্তিও শ্রীধরের সঙ্গপ্রাপ্তিতে হর্ষ লাভ করেন। তবে মাথা গরমের অবস্থায় যখন শ্রীধর যাহার রাশিতে ভার হন, তখনই তাহার পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়।

গুরুতে অবজ্ঞা দর্শনে শ্রীধরের মাথা গরম।

সম্প্রতি হাই স্কুলের জনৈক প্রসিদ্ধ হেড্ মাষ্টার, স্ত্রীবিয়োগ শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া, আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে তাঁর সমস্ত শোক দুঃখের কথা জানাইয়া বলিলেন—"মহাশয়! এখন আমার শান্তি কিসে হয় বলিতে পারেন?"

ঠাকুর তাঁহার দুঃখে খুব দুঃখ করিয়া বলিলেন—"**শোক অতি বিষম জিনিস; ইহার শান্তি কিছুতেই হয় না। সময় যত যাবে, শোক ততই আপনা আপনি ধীরে ধীরে কমে আস্‌বে। এখন রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ, সৎসঙ্গ, ও যতটুকু পারেন, ভগবানের নাম ক'রে সময় কাটাতে চেষ্টা করুন, এতে কতকটা শান্তি পাবেন!**"

ভদ্রলোকটি ঠাকুরের উপদেশে বোধ হয় তেমন তৃপ্তিলাভ করিলেন না, ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন এবং দক্ষিণের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঐ ঘরের এক কোণে শ্রীধর নিজ আসনের সম্মুখে ধুনি জ্বালিয়া, স্থিরভাবে একদৃষ্টে আগুনের দিকে চাহিয়া জপ করিতেছিলেন। কম্বলমোড়া লেংটীপরা শ্রীধরকে একভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া, ভদ্রলোকটির মনে একটা আশা হইল; তিনি কিছুক্ষণ শ্রীধরের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাবাজী! কিছুকাল হয় আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, আমার বড়ই ক্লেশ, একটু আরাম কিসে হয় বলিতে পারেন?" শ্রীধর শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন—"হাঁ, আরাম কিসে হবে বল্‌তে পারি। ঐ ঘরে যান, গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে বসুন, তাঁকে কষ্টের কথা সব বলুন, আরাম পাবেন।" ভদ্রলোকটি বলিলেন—"মশায়! এতক্ষণ ত গোঁসাইয়ের কাছেই ছিলাম। তিনি যা বল্‌লেন তাও শুন্‌লাম। ও সব ত ঢের শুনা আছে; আপনি দয়া ক'রে কিছু বলুন না?" 'ও সব ত ঢের শুনা আছে' ঠাকুরের কথায় এরূপ অবজ্ঞাসূচক ভাব দেখিয়া, শ্রীধরের মাথা একেবারে গরম হইয়া উঠিল; শ্রীধর বলিলেন, "বিয়ে কর্ব্বেন?"

মাষ্টারটি বলিলেন—"না মশায়, সে সব আর না। আপনি আমাকে এমন কিছু প্রক্রিয়ার উপদেশ বলুন, যাতে একটু আরাম পাই।" শ্রীধর তখন খুব উত্তেজিত হইয়া হাত নাড়া দিয়া বলিলেন—"আমার কাছে প্রক্রিয়া শিখ্‌বেন! আচ্ছা, যান, এখন গিয়ে এই ক্রিয়া করুন, খুব আরাম পাবেন।" ভদ্রলোকটি শ্রীধরের হাতমুখনাড়া দেখিয়া এবং শ্রীমুখের বচন শুনিয়া চটিয়া আগুন হইলেন। অমনই গোঁসাইয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীধরের সমস্ত ব্যবহারের পরিচয় দিয়া বলিলেন—"একে কি আপনি শাসন করবেন না?"

ঠাকুর এ সব কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন—"একি শ্রীধর! তুমি ত অতি বিষম লোক দেখ্‌তে পাচ্ছি! এই ভদ্রলোকটিকে তুমি কি বলেছ? এরূপ পাগলামী কর্‌লে এখানে তোমার থাকা হবে না। খুব সাবধান হ'য়ে চল, না হ'লে এখনই এখান থেকে চ'লে যাও।"

শ্রীধরের মাথা আগেই গরম হইয়াছিল, এখন আবার ঠাকুরের ধমক খাইয়া, তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আপনার কাছে ধর্ম্মের উপদেশ শুনে ইঁহার তৃপ্তি হয় নাই, আরাম হয় নাই। আমার কাছে গেছেন শান্তির উপদেশ নিতে! আমি কি আচার্য্য? আমার যখন স্ত্রী মরেছিল, তখন আমি যা ক'রে আরাম পেতাম, তাই বলেছি। আমার যেমন অধিকার, আমি ত তেমনই বল্‌ব। এতে আমার দোষ হ'লো?"—এই মাত্র বলিয়া, শ্রীধর অমনই দ্রুতপদে নিজ আসনে চলিয়া আসিলেন, এবং চোক মুখ রাঙ্গাইয়া বলিতে লাগিলেন—"শালা গোঁসাইয়ের কথা অগ্রাহ্য ক'রে, আমার কাছে এসেছে আরামের উপদেশ নিতে!" সমস্ত দিন শ্রীধর রাগে গম্‌গম্ করিয়া কাটাইলেন। ঠাকুর, ভদ্রলোকটিকে শ্রীধরের মাথা গরমের অবস্থার পরিচয় দিয়া, ক্ষমা চাহিলেন এবং খুব মিষ্ট ভাবে উপদেশ দিয়া ঠাণ্ডা করিলেন। শ্রীধরের কার্য্য, মাথা গরম হইলে কখনও কখনও এই প্রকার সৃষ্টিছাড়া দেখা যায়।

ঠাকুর আমাদের মত একগুঁয়ে, অসংযত ও উন্মাদপ্রকৃতি শিষ্যদের বুকে রাখিয়া, প্রশান্ত সাগরের ন্যায় কি প্রকারে স্থির আছেন এবং সকলের বিষ হজম করিয়া কি ভাবে পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন, এইটুকুই দেখিবার বিষয়। প্রতিপদেই আমাদের অত্যাচার ও অবাধ্যতায় ঠাকুরের ধৈর্য্য, বিরোধ বিসংবাদে শান্তি, এবং সকলের সকল প্রকার দুরবস্থায় ঠাকুরের অসাধারণ দয়া ও সহানুভূতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি।

শ্রীধরের জঠরানলে আহুতি।

শ্রীধরের আর একটি কার্য্য এস্থলে লিখিয়া রাখিতেছি। শ্রীধরের অসুখ হওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বে, এক দিন আমাদের আশ্রমের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইল। সকাল বেলা উঠিয়া বুড়োঠাকরুণ (দিদি মা) ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দুই তিন বাড়ী ঘুরিয়া, ধার করিয়া দু'টি টাকা আনিলেন এবং শ্রীধরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "শ্রীধর! এখন ধ্যান ধারণায় চল্‌বে না, আসন থেকে ওঠ, ভাণ্ডার একেবারে শূন্য, একবার বাজারে যাও, বাজার হ'তে এলে রান্না চড়্‌বে।"

শ্রীধর বুড়োঠাকরুণের কথায় কোন জবাব না দিয়া চোখ বুজিলেন। বুড়োঠাকরুণ পুনঃপুনঃ শ্রীধরকে ডাকিতে আরম্ভ করায়, শ্রীধর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বাজার কি অম্‌নই হয়? টাকা ফেলুন; টাকা কই?" বুড়োঠাকরুণ টাকা দিতেই, শ্রীধর টাকা হাতে নিয়া আসনহইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং বাজারে যাইতে দ্রুতপদে ঘরহইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বুড়োঠাকরুণ শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীধর! কি কি জিনিস আন্‌বে, তা একবার শুন্‌লে না?" শ্রীধর বলিলেন, "আমি কি ভাত খাই না? কি আন্‌বো তা আর জানি না? ডাইল আন্‌বো, চাউল আন্‌বো, আবার কি?" বুড়োঠাকরুণ আর বেশী কথা না বলিয়া, যে সকল জিনিস আনিতে হইবে বলিয়া দিলেন। শ্রীধর বলিলেন, "আপনি যান, গিয়ে উনুন্‌ ধরান, আমি ত যাব আর আস্‌ব।" এই বলিয়া শ্রীধর ঝোলা কাঁধে লইয়া বাজারে চলিলেন। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল; শ্রীধর আসিতেছেন না দেখিয়া বুড়োঠাকরুণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বেলা দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, শ্রীধরের কোন খোঁজ খবর না পাইয়া, এবাড়ী ওবাড়ী হইতে চাউল ডাইল ধার করিয়া আনিয়া, রান্না চাপাইলেন। রান্না হইয়া গেল, তথাপি শ্রীধর আসিলেন না। সকলে ডাল ভাত মাত্র আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা সাড়ে বারটা, ঠাকুরের ধুনি আমতলায় জ্বলিল। ঠাকুর আহারান্তে আমতলায় যাইয়া বসিলেন। মহাভারত পাঠ হইতে লাগিল, বেলা প্রায় দুইটা; শ্রীধর একটা বড় পুঁটুলি ঘাড়ে লইয়া দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরের দক্ষিণ দিকে আমতলায়, ধুনি সম্মুখে রাখিয়া আসন করিয়া বসিয়া পড়িলেন। পাঁচ ছয় মিনিট অন্তর অন্তর এক একবার শ্রীধর পুঁটুলিহইতে ধূপধুনা, চন্দন, গুগ্‌গুলাদি 'মুঠেমুঠে' তুলিয়া, 'অগ্নয়ে স্বাহা,' 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর উহা দেখিয়া কোন কথাই না বলিয়া, খুব আনন্দের সহিত মৃদু মৃদু

হাসিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বুড়োঠাক্‌রুণ, শ্রীধরের কথাই ঠাকুরকে বলিতে আমতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় শ্রীধরকে স্থিরভাবে বসিয়া ধুনির দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর, বুড়োঠাক্‌রুণকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বুড়োঠাক্‌রুণ, শ্রীধরকে বলিলেন, "কি শ্রীধর! তুমি বাজারে যাও নাই?" শ্রীধর সে কথার কোন জবাব না দিয়া, খুব মনোযোগের সহিত পুঁটুলি হইতে ধূনা চন্দনাদি মুঠেমুঠে তুলিয়া 'অগ্নয়ে স্বাহা,' 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া আগুনে আহুতি দিতে লাগিলেন। বুড়োঠাক্‌রুণ বলিলেন, "পাগল! একি কাণ্ড? এতে কি দিন যাবে?" শ্রীধর খুব তেজের সহিত বলিলেন, "আবার কি বল্‌ছেন আপ্‌নি? জঠরানল ত অনল? আগুনে আহুতি দিলে কখনও আবার ক্ষুধা থাকে? শাস্ত্র জানেন?"

শ্রীধরের কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব হাসিয়া উঠিলেন এবং বুড়োঠাক্‌রুণকে বলিলেন— "আপ্‌নি বাজার কর্‌তে শ্রীধরকে টাকা দিয়েছেন। শ্রীধর ঐ টাকা দিয়ে ধূপ্‌ধূনা এনে জঠরানলে আহুতি দিচ্ছেন।"

সকলেই শ্রীধরের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। শ্রীধরের তখন বাক্যটি নাই, বুড়োঠাক্‌রুণ ধার করিয়া বাজারের টাকা দিয়াছিলেন, সুতরাং 'টাকা কি করিলে' বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন। শ্রীধর আর আসনে না থাকিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং বুড়োঠাক্‌রুণের নিকটে যাইয়া বলিলেন, "হয়েছে, হয়েছে; এখন চলুন, এত বেলা হয়েছে, আমার ক্ষুধা পায় না? খাবার দিন, গালিতে পেট ভরে না।"

বুড়োঠাক্‌রুণ শ্রীধরের মাথা গরম বুঝিয়া, তাড়াতাড়ি সঙ্গে লইয়া গিয়া খাবার দিলেন। শ্রীধরের এই প্রকার পাগলামী প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতেছি। বুড়োঠাক্‌রুণের ঘাড়েই এ সকল উৎপাত উপদ্রব অনেক সময় পড়িয়া থাকে। শ্রীধরের মাথাগরমের পাল্লায়, দিদিমার সহিষ্ণুতা ও দয়া দেখিয়া অবাক্ হইতেছি।

আশ্বিন মাস।

মাঠাকরুণের সমাধিমন্দির।

আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে, মাতাঠাকুরাণীর দর্শন আকাঙ্ক্ষায় বাড়ী গেলাম। বাড়ী হইতে আশ্রমে আসিতে দশ বার দিন বিলম্ব হইল। এদিকে দেখিতে দেখিতে শারদীয় পূজা আসিয়া পড়িল। আফিস, আদালত, স্কুল প্রভৃতির ছুটি হইল। দলে দলে গুরুভ্রাতা ভগিনীগণ গেণ্ডারিয়ায় আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া সকলেরই প্রাণে কত আনন্দ! মহাষ্টমীর দিনে মহামায়ার পূজা বহুকাল আমরা দেখি নাই। এবার ঠাকুরের কৃপায় তাঁরই ইচ্ছায় ঐ তিথিতে ভগবতী যোগমায়ার অস্থি নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। মাঠাকরুণের নিত্য সেবা পূজা ঐ তিথিতে আরম্ভ হইবে। ঐ দিনের কল্পনা করিয়া এখনহইতেই আমাদের মনে কত আনন্দ! গুরুভ্রাতাদের সম্মিলনে, ঠাকুরের আশ্রমে একমাত্র ঠাকুরকে লইয়াই আমাদের নিত্য আনন্দ ও মহোৎসব। এবার মহাষ্টমীতে দেশব্যাপী মহা আনন্দের দিনে, ঠাকুর আমাদের স্নেহময়ী মাতা যোগমায়ার স্মৃতি জাগাইয়া, তাঁর শীতল বিমল আনন্দপ্রদ শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া থাকিবার অবসর দিবেন। এবার হইতে আমাদেরও প্রতি বৎসর মহাষ্টমী তিথিতে মহামায়া ভগবতী যোগমায়ার মহাপূজা হইবে মনে করিয়া, গুরুভ্রাতাভগ্নীদের কতই আনন্দ, কতই উৎসাহ!

মাঠাকরুণের অন্তর্দ্ধানের কিছুকাল পূর্ব্বে, শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে, এক দিন ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন, 'দেখিবে, এবার গেণ্ডারিয়াতে অবিলম্বেই শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিবে।' তখন একবার কল্পনাও করি নাই, যে ইহা মাঠাকরুণেরই সমাধিমন্দিরে ঘটিবে।

মন্দিরটি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে; ঠিক নক্‌সার অনুরূপ হয় নাই। ঠাকুর, মন্দির দেখিয়া বলিলেন—"**ভগবানের ইচ্ছায় যা হবে, তাতে কি মানুষের আর কোনও হাত আছে? নক্‌সা মত প্রস্তুত করতে, রাজেরা ত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আর এক প্রকার হ'য়ে গেল। মন্দিরটি অনেকটা বিষ্ণুমন্দিরের মত হয়েছে।**"

শ্রীযুক্তেশ্বরী মা-ঠাকরুণ শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী

মন্দিরপ্রতিষ্ঠাপ্রণালী।

পঞ্চমী তিথিতে, সকালে নয়টার সময়ে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"**মহাষ্টমীর দিনে প্রতিষ্ঠার কার্য্যটি তুমি করবে। ঐ দিনে তোমার নিত্যকর্ম্ম মন্দিরে ব'সে ক'রো। চণ্ডীপাঠ ক'রে হোম ক'রো, তা হ'লেই হবে।**"

আমি বলিলাম—"সমস্ত চণ্ডীখানি পাঠ করিয়া কি হোম করিব? হোম কি যেমন করিয়া থাকি, তেমনই করিব?"

ঠাকুর বলিলেন—"**সমস্ত চণ্ডী পাঠ না ক'রেও হয়। যে হোম ক'রে থাক, তাই ক'রো, একশত আটটি আহুতি দিও।**"

পাছে চণ্ডীপাঠের সময়ে, প্রতিষ্ঠাকার্য্যে চণ্ডীপাঠ ভুল হয়, এই আশঙ্কায় চণ্ডী আবৃত্তি আরম্ভ করিলাম। ভাল দেখিয়া শুষ্ক বিল্বকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। এই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে, দেখিতেছি, আমার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপা! জয় গুরুদেব!

সপ্তমী তিথিতে, শ্রীমন্দিরের জমির মধ্যস্থলে পাকা চতুষ্কোণ 'সিমেণ্ট' করা কুণ্ডের ভিতরে যোগজীবন প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা একটি কৌটায় ভরিয়া মাঠাকৃরুণের অস্থি স্থাপন করিলেন; এবং তাঁহার নামাঙ্কিত সাদা 'মারবেল' প্রস্তরে আবৃত করিয়া, সিমেণ্ট দিয়া পাকা করিয়া আঁটিয়া দিলেন। পরে উহার উপর একখানি জলচৌকি রাখিয়া, তদুপরি মাঠাকৃরুণের ব্যবহৃত আসন, বালিশ, বস্ত্রাদি, গদি আকারে পরিপাটীরূপে সাজাইয়া, গৈরিক বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। তাঁহার একখানি 'ফটো' এবং ঠাকুরের লেখা "নামব্রহ্মের" পট কল্য উহার উপর স্থাপন করা হইবে।

নানা শ্রেণীর পত্রপুষ্পে মালা গাঁথিয়া, মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করা হইয়াছে। মন্দিরের সিঁড়ির দুই পার্শ্বে দুইটি কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়া, তাহার মূলদেশে দুইটি পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। কল্য আম্রপল্লব, নারিকেল ও পুষ্পমাল্যে উহা যথারীতি সাজান হইবে। সন্ধ্যার সময়ে আমতলায় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই কীর্ত্তনানন্দে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া, আপন আপন আসনে যাইয়া আমরা বিশ্রাম করিলাম।

মাঠাকৃরুণের সমাধি-প্রতিষ্ঠা।

২৫শে আশ্বিন, রবিবার।

মহাষ্টমীর দিনে অরুণোদয়ে বুড়ীগঙ্গায় স্নান তর্পণাদি করিয়া আসিলাম। মালা, তিলক ধারণ করিয়া, ঠাকুরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া,

সমাধি-প্রতিষ্ঠার অনুমতি লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। কুতুবুড়ী ও মঙ্গলী প্রতিষ্ঠা কার্য্যের যাবতীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিল। দক্ষিণে মাঠাকুরুণের আসন রাখিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে নিজ আসন পাতিয়া বসিলাম। মাঠাকুরুণের 'ফটো'-কে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া গদির উপরে উত্তরমুখ করিয়া স্থাপন করিলাম। "নামব্রহ্মের" পটখানিকেও ঐ প্রকার নমস্কার করিয়া, মাঠাকুরুণের গদির উপরেই রাখা হইল। মন্দিরের মেজেতে বালি সাজাইয়া হোমের জন্য বিল্ব ও উডুম্বর কাষ্ঠ ঠিক করিয়া রাখিলাম। আতপ তণ্ডুল, রম্ভা, শর্করা প্রভৃতি দ্বারা সুন্দররূপে প্রস্তুত করা নৈবেদ্য কয়েকখানি আনা হইলে, হোম-কুণ্ডের ধারে উহা ধরিয়া রাখিলাম। পরে আচমনান্তে কয়েকবার প্রাণায়াম ও কুম্ভক করিয়া স্থিরভাবে মাঠাকুরাণীর সেই স্নেহপূর্ণা কৃপাময়ী মূর্ত্তিখানিকে ধ্যানে রাখিয়া, ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলাম। তৎপরে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপান্তে, ফুল, তুলসী, বিল্বপত্রাদি দ্বারা মাঠাকুরাণীর পূজা করিয়া, ফটো ও নামব্রহ্মের পট পরিপাটীরূপে মালা, তুলসী, পুষ্প ও চন্দনাদি দিয়া সাজাইলাম। অনন্তর মহাষ্টমী পূজার লগ্নে শঙ্খ, ঘণ্টাধ্বনি করিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গণে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিল; এই সময়ে ঠাকুর ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনিমেষ নয়নে ঠাকুর, মাঠাকুরাণীর ফটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া, কয়েক শ্লোক চণ্ডীপাঠ শুনিয়াই মন্দিরহইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভাবাবেশে দক্ষিণে বামে হেলিয়া ঢুলিয়া, মন্দির পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। গুরুভাই ভগ্নীরা আনন্দধ্বনি করিয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। মেয়েরা মুহুর্মুহুঃ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার চণ্ডীপাঠ শেষ হইল। মাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিলাম। বিশুদ্ধ গব্যঘৃত সংযোগে অখণ্ডিত বিল্বপত্র দ্বারা হোম আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে গুরুদেবের অদ্ভুত কৃপা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া মাত্রই, উহা দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া নানাবর্ণের শিখা বিস্তার করিয়া, মাঠাকুরাণীর ফটোর অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ নখপরিমিত এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, অতিশয় চঞ্চল ভাবে, সমস্ত অগ্নিতে ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া, ক্ষণে অন্তর্দ্ধান, ক্ষণে প্রকাশ হইতে লাগিলেন। মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি কিছুতেই স্থির রাখিতে পারিলাম না। অথচ অগ্নির যে দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তথায়ই বিদ্যুতের মত অত্যুজ্জ্বল চঞ্চলমূর্ত্তি নৃত্য করিতে করিতে, ক্ষণে প্রকাশ, ক্ষণে অন্তর্হিত হইতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। সে মূর্ত্তিটি আমার বিশেষ পরিচিত বলিয়া, আমার আনন্দের

আর পরিসীমা রহিল না; আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। হোমকার্য্যে ১০৮টি আহুতিদান সম্পন্ন হইল। নৈবেদ্য মাঠাকুরাণীকে নিবেদন করিয়া দিয়া, আরতি করিলাম। পরে বারেন্দায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দিরহইতে নামিয়া পড়িলাম। জয় ঠাকুর, তোমারই জয়! তোমারই জয়!! তোমারই জয়!!!

মধ্যাহ্নে বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া, পক্কান্ন দ্বারা মাঠাকুরাণীর ভোগ দেওয়া হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সময় শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ রহিল। ভোগ সরিলে, সকলে প্রসাদ পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে কুতুবুড়ী মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন। তৎপরে মন্দিরের প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সকলে ঠাকুরকে লইয়া কীর্ত্তনানন্দে মাতিলেন। কীর্ত্তনের পর, ঠাকুর স্বহস্তে হরির লুট বিলাইয়া, আপন আসনে যাইয়া বসিলেন। আমরাও স্ব স্ব স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিলাম।

হোম করিতে করিতে শেষকালে অকস্মাৎ এক বিষম উৎপাত উপস্থিত হইল। কাঁচা সিমেণ্টের উপর হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায়, সিমেণ্ট ফাটিয়া চটাচট্ শব্দে চটা উঠিয়া, জ্বলন্ত কয়লার সহিত চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত ঘরে ও বারেন্দায় জ্বলন্ত কয়লা গিয়া পড়িলেও, এক টুকরা সিমেণ্ট বা কয়লা, মাঠাকুরাণীর অর্দ্ধহস্ত তফাৎ আসনে বা আমার শরীরে আসিয়া পড়ে নাই।

শক্তিপূজা ও ভগবানের নরলীলা।

২৬শে আশ্বিন, সোমবার।

নবমীর দিনে প্রত্যূষে স্নান তর্পণ করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গেলাম।

ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"তোমার নিত্যক্রিয়া মন্দিরে ব'সেই ক'রো, চণ্ডীপাঠ ক'রে হোম ক'রো।"

গত কল্য মন্দিরের মেজের চটা উঠিয়া গিয়াছে বলাতে, ঠাকুর বলিলেন—"মন্দিরের মেজেতে হোম না ক'রে, পিতলের যে একখানি বড় ধুনুচি আছে, তাতে হোম ক'রো।"

আমি বুড়োঠাকরুণের কাছে চাহিয়া ঐ ধুনুচি আনাইয়া লইলাম। নাম, প্রাণায়াম

ও গায়ত্রী জপ করিয়া, গীতা ও চণ্ডী পাঠের পর হোম করিয়া, মাঠাকুরাণীর পূজা করিলাম। তৎপরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দিরহইতে বাহির হইলাম। বেলা ১২টার সময়ে মা-ঠাকুরাণীর ভোগ দেওয়া হইল। 'ভোগ দিয়া অর্দ্ধঘণ্টা মন্দিরের দরজা বন্ধ রাখা আবশ্যক,' ঠাকুর এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময়ে পঞ্চপ্রদীপ, ধুনা, শঙ্খ, বস্ত্রাদি দ্বারা কুতুবুড়ী, মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের ধ্বনিতে আশ্রম যেন নৃত্য করিতে লাগিল। সন্ধ্যা আরতির পর, সকলে মিলিয়া আমতলায় সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। ঠাকুর হরির লুট দিলেন।

(দশমীর দিনে) মাঠাকুরাণীর পূজা নিত্যই এক নিয়মে চলিল। আজ সতীশ, শ্রীধর প্রভৃতি ঠাকুরের নিকট শক্তিপূজা, দুর্গাপূজা, মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন।

আমি বলিলাম—"শ্রীরামচন্দ্র কি দুর্গাপূজা করেছিলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, করেছিলেন। এ সম্বন্ধে বাল্মীকি রামায়ণে কোনও উল্লেখ নাই, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।"

আমি বলিলাম—"শ্রীরামচন্দ্র ত স্বয়ং ভগবান্। তিনি ত সবই জানিতেন, সবই পারিতেন, তিনি আবার দুর্গাপূজা করিলেন কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"এযে নরলীলা। এখানে জানা টানার, পারা না পারার কোন কথা নাই। তিনি যদি পূর্ণব্রহ্মের ন্যায়ই সব করবেন, তা হ'লে আর অবতীর্ণ হলেন কেন ? সেখানে থেকেই ত সব করতে পারতেন। তাঁর আর অসাধ্য কি আছে ? যাঁর ইচ্ছাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হচ্ছে, তিনি মুহূর্ত্তে কি না করতে পারেন ? যখন তিনি যে উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি ঠিক সেইরূপই আচরণ করেন। লীলাসময়ে তাঁর আপন মায়াশক্তি দ্বারাই তিনি আপনাকে আপনি আচ্ছন্ন রাখেন, যেমন গুটিপোকা আপন সূতায় আপনি আবদ্ধ হয়। তাঁর লীলা কি বুঝ্‌বার সাধ্য আছে ? শুধু তাঁর কৃপা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্রীরামচন্দ্র যে বালিবধ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকমের কথা বলেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"তাঁদের কথায় কর্ণপাতও করতে নাই, অনিষ্ট হয়। যাঁরা

সমস্ত শাস্ত্র আগাগোড়া পড়েন না, বুঝেন না, তাঁরাই ওরূপ বলেন। যাঁরা শাস্ত্রের কতক অংশ গ্রহণ করেন, কতক অংশ ত্যাগ করেন, তাঁরা শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না, নিজের মনোমত কথাই বেছে নেন মাত্র। তাঁদের আবার শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রচর্চ্চা কেন? শাস্ত্র বিশ্বাস কর্‌লে, আগাগোড়া সমস্ত শাস্ত্রই বিশ্বাস কর্‌তে হয়। একটু ক'রে, একটু না কর্‌লে চল্‌বে কেন? শাস্ত্রকর্ত্তারা কোন কথাই ত গোপন ক'রে যান নাই, সমস্ত বিষয়েরই পরিষ্কার মীমাংসা ক'রে গেছেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন, একান্ত শরণাগত, ভক্ত সুগ্রীবকে রক্ষা কর্‌বার জন্যই যে শ্রীরামচন্দ্র, ভ্রাতৃদারাপহারী বালিকে বধ করেছিলেন, তাহা ত পরিষ্কাররূপে রামায়ণে লেখা আছে। কোনও শাস্ত্রগ্রন্থেরই আগাগোড়া সমস্ত বিষয় বিশ্বাস ক'রে না পড়্‌লে, একটা অর্থবোধ হয় না। শ্রদ্ধার সহিত যাঁরা শাস্ত্র পাঠ না করেন, তাঁরা শাস্ত্র না প'ড়ে, ইংরাজি পুস্তকে বাঘের গল্প, কুকুরের গল্প পড়্‌লেই ত পারেন। শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস ক'রে না পড়্‌লে, শাস্ত্র পড়া আর না পড়া সমান।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্রজগোপীরা যে ভগবতীর পূজা করেছিলেন, তাহা কি কোনও মূর্ত্তি গ'ড়ে? গোপীরা আবার শক্তিপূজা কর্‌লেন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"শক্তিপূজা না ক'রে কারও কি পার পাবার যো আছে? শক্তির কৃপা না হ'লে কিছুই যে হয় না। ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ কর্‌বার জন্যই কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন। এখনও সেই প্রণালীমত ব্রজমায়ীরা প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে, প্রাতঃস্নান ক'রে, যমুনার কূলে বালি দিয়ে বেদি প্রস্তুত করেন এবং তাতে কাত্যায়নী পূজা করেন। এই পদ্ধতিতে কোন প্রকার মূর্ত্তি স্থাপন হয় না। মূর্ত্তিপূজার বহু প্রণালী আছে। বেদিতে পূজা করা বা যন্ত্র এঁকে পূজা করা এই মূর্ত্তিপূজারই প্রকারভেদমাত্র।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দুর্গা ও কালী একই ত শক্তি; কারও পূজা রাত্রিতে, আবার কারও পূজা দিনে কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"শক্তিপূজা তন্ত্রমতেও হয়, আবার বৈদিকমতেও হয়। কালীপূজা তন্ত্রমতে রাত্রিতে হয়, আর দুর্গাপূজা বৈদিকমতে দিনে হয়।

হিমালয়ের ঘরে প্রথমে শ্যামবর্ণা দ্বিভুজা কালী জন্ম গ্রহণ করেন, তার পরে পার্ব্বতী।”

ব্রহ্মজ্ঞান ও অবতারতত্ত্ব।

আজ একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন—“নির্গুণ পরব্রহ্মই কি আবার সাকার হ’য়ে লীলা করেন? মহাপ্রলয়ে এই সমস্তই কি সেই পরব্রহ্মে লীন হয়?”

ঠাকুর বলিলেন—“হাঁ, মহাপ্রলয়ে কিছুই আর থাকে না। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যা কিছু সমস্তই অদ্বয় ব্রহ্মেরই পরিণাম। ব্রহ্মছাড়া আর কিছুই নাই। শ্রুতিতে বলেছেন—‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥’ ‘যাহাহইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে’ ইহাই বলিয়াছেন, কিন্তু ‘যাহা কর্ত্তৃক হইয়াছে,’ এইরূপ বলেন না। পঞ্চমীতে রেখে গিয়েছেন; করণার্থে তৃতীয়া করেন নাই। ‘যাহাহইতে’, যেমন মৃত্তিকা হ’তে ঘট, স্বর্ণ হ’তে কুণ্ডল, সমুদ্র হ’তে তরঙ্গ ইত্যাদি। মৃত্তিকা এবং ঘট একই বস্তু, মৃত্তিকারই এক প্রকার পরিণাম ঘট, স্বর্ণেরই এক প্রকার পরিণাম কুণ্ডল, এবং সমুদ্রেরই এক প্রকার পরিণাম তরঙ্গ। তা হ’লেও ঘটকে মৃত্তিকা এবং তরঙ্গকে সমুদ্র বল্‌লে হবে না; ঘটই বল্‌তে হবে, তরঙ্গই বল্‌তে হবে। সেইরূপ ব্রহ্ম অদ্বয়, আর চরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই পরিণাম। তাই এই প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন; ‘কুম্ভকার এবং ঘট’ এই প্রকার দৃষ্টান্ত তাঁরা দেন নাই। যত কিছু সমস্তই ব্রহ্ম। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, আমার এই লাঠিখানি, মালাটি, এই অস্থি, মাংস, আমি, সবই ব্রহ্ম। ইহাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান। এই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান হ’লেই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝ্‌তে পারে। নির্গুণ অদ্বয়তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি না হ’লে, সগুণ সাকারতত্ত্ব বুঝ্‌বার কি সাধ্য আছে? সাকার কি এমনই সোজা কথা? শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন—

" বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ "

এই নির্গুণ পরব্রহ্মই আবার সাকার হ'য়ে লীলা কর্‌ছেন। কাক ভুশুণ্ডীর পর্য্যন্ত সংশয় জন্মেছিল। 'সেই নির্গুণ পরব্রহ্মই কি এই দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্র? তিনিই কি এই অযোধ্যায় দশরথের ঘরে?' এক দিন শ্রীরামচন্দ্র আঙ্গিনায় হাতে ক'রে খাবার খাচ্ছেন; কণিকা মাটিতে পড়্‌ছে, আবার তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। কাক ভুশুণ্ডীকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র একটু হেসে ধর্‌বার জন্য শ্রীহস্ত বাড়ালেন, ভুশুণ্ডী ভয়ে পলাল। কিন্তু হাত তাঁর পেছনে পেছনে চল্‌ল। কাক ভুশুণ্ডী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুর্‌তে লাগ্‌লেন, শ্রীহস্ত তাঁর পেছনে পেছনে। অবশেষে আর কোথাও স্থান না পেয়ে, পুনরায় দশরথের আঙ্গিনার সেই স্থানেই এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রামচন্দ্র একটু হাস্‌লেন। তখন ভুশুণ্ডী শ্রীরামচন্দ্রের মুখের ভিতরে প্রবেশ কর্‌লেন। দেখ্‌লেন—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, লোক, লোকান্তর, চতুর্দ্দশ ভুবন, সমস্ত রামচন্দ্রের শ্রীমুখের ভিতরে বর্ত্তমান। কত ব্রহ্মাণ্ডে, এইরূপ কতশত রাম, লীলা কর্‌ছেন। নিজেকেও ভুশুণ্ডী ঐরূপ এক-স্থানে দেখ্‌লেন। এ সকল দেখে ভুশুণ্ডী ত অবাক্‌। শ্রীরামচন্দ্র তখন আবার একটু হাস্‌লেন, ভুশুণ্ডী অমনি মুখ হ'তে বা'র হ'য়ে পড়্‌লেন। প্রত্যক্ষ এ সমস্ত দেখ্‌লেন, তথাপি সন্দেহ দূর হ'লো না। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে কৃপা কর্‌লেন; অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব ও সগুণ সাকার লীলাতত্ত্ব তাঁর কাছে প্রকাশ হ'ল। তখন ভুশুণ্ডী সমস্তই বুঝ্‌লেন। খণ্ডপ্রলয়ে একটি ব্রহ্মাণ্ডের লয় হ'লেও, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড থেকে যায়; কিন্তু মহাপ্রলয়ে আর কিছুই থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় বস্তুই যখন নাই, তখন কিছু আর থাকে না, এরূপও বলা যায় না, থাকে এরূপও বলা যায় না। ব্রহ্ম নিত্য, সুতরাং সমস্তই নিত্য।"

এ সকল উপদেশের পর নানাপ্রকার গল্প আরম্ভ হইল। পাগ্‌লা শ্রীধর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—" ব্রহ্মকে জানিয়াছি তাহাও নহে, ব্রহ্মকে জানি নাই তাহাও নহে;

এই কথার অর্থ যিনি জানিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মকে যথার্থ জানিয়াছেন।" উপনিষদের এই কথা শ্রীধর এ সময়ে বলাতে সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

ভগবানের নরলীলা।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরমেশ্বরকে ত সকলেই বিশ্বাস করে; তবে তিনি সংসারে যখন অবতীর্ণ হন্, তাঁকে ধরা যায় না কেন্?"

ঠাকুর বলিলেন—"অনাদি অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই রয়েছেন, এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁর উপাসনা করা, ধ্যান করা সহজ। সাধকেরা প্রথম এই ব্রহ্মজ্ঞানেই উপাসনা করেন। অবতারতত্ত্বে, লীলাতত্ত্বে বিশ্বাস অনেক পরে। যিনি ঠিক আমাদেরই মত খাচ্ছেন, দাচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, রোগের যন্ত্রণায় 'আহা উহু, গেলাম্‌রে, ম'লাম্‌রে, চীৎকার ক'রে ছট্‌ফট্ করছেন, শোকেতে অস্থির হ'য়ে 'কোথা গেলরে, কোথা গেলে পাবরে ব'লে, কেঁদে কেঁদে দেশ দেশান্তরে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনও ক্ষুধায় কাতর হচ্ছেন, কখনও বা পিপাসায় অস্থির হচ্ছেন, ইনিই সেই সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, আনন্দময়, চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর, ইহা মনে করা, বিশ্বাস করা কি তামাসার কথা! তিনি যাঁকে দয়া করেন, সেই মহা ভাগ্যবান্‌ই মাত্র তাঁকে বুঝ্‌তে পারেন, না হ'লে কারোই সাধ্য নাই। স্বয়ং ব্রহ্মার পর্য্যন্ত এতে সংশয় হয়েছিল। ব্রহ্মা ভাব্‌লেন—'এ কি কখনও সম্ভব! যিনি মাঠে মাঠে হৈ হৈ ক'রে গরু চরাচ্ছেন, রৌদ্রে কাতর হ'য়ে গাছতলায় যাচ্ছেন, বৃষ্টিতে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়াচ্ছেন, খেলায় হেরে গিয়ে রাখালবালকদের কাঁধে নিচ্ছেন, তাদের সঙ্গে লাফালাফি ছুটোছুটি কর্‌ছেন, কখনও কাদায় পড়্‌ছেন, আছাড় খাচ্ছেন, আবার চুরি ক'রে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পালাচ্ছেন, ইনিই কি সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, এই গোকুলে? আচ্ছা, দেখা যাক্।' এই ভেবে তিনি, অকস্মাৎ গোবৎস, রাখালগণ, বেণু, যষ্টি, ইত্যাদি সমস্ত হরণ ক'রে, পর্ব্বতের এক গুহায় লুকায়ে রাখ্‌লেন, দরজায় একখানি পাথর চাপা দিয়ে চ'লে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার কর্ম্ম বুঝে, তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেই গোবৎস, রাখালবালক,

বেণু, যষ্টি, শিঙ্গা, সিকা, হাঁড়ি, লাঠি সমস্তই হ'লেন ; কেহই বিন্দুমাত্র জান্‌তে পার্‌লেন না। বলরাম সেদিন গোষ্ঠে যান নাই ; বৎসগণের প্রতি গাভীগণের, সন্তানদিগের প্রতি গোপীগণের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ ভালবাসা দেখে বলরাম ভাব্‌লেন, 'এ কি ? এমনটি ত পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। এ যে সমস্তই অদ্ভুত দেখ্‌ছি।' তিনি কিছু স্থির কর্‌তে না পেরে ধ্যানে বস্‌লেন ; সমস্ত তখন তিনি জান্‌তে পার্‌লেন। একটি বৎসর এই ভাবে চ'লে গেল ; পরে ব্রহ্মা এসে দেখ্‌লেন, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত নিয়ে পূর্ব্বেরই মত লীলা কর্‌ছেন। তখন ব্রহ্মা পর্ব্বতগুহায় যেয়ে দেখ্‌লেন, তিনি যে ভাবে ঐ সব রেখে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই সমস্ত রয়েছে। ব্রহ্মা একবার পর্ব্বতগুহায়, আর একবার গোষ্ঠে ছুটোছুটি কর্‌তে লাগ্‌লেন ; পরে একেবারে অবাক্ হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে এসে পড়্‌লেন ও স্তব কর্‌তে লাগ্‌লেন—'প্রভো ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি অবোধ। সন্তান জননীর কোলে থেকে কত অত্যাচার করে, লাথি মারে, তাতে কি জননী ক্রোধ করেন ? তুমিই ধন্য ! ধন্য ব্রজবাসিগণ ! এই ব্রজের বৃক্ষ লতাও ধন্য ! কারণ তাঁরা তোমার ও ব্রজবাসীদের চরণধূলির স্পর্শ পায়। দয়া ক'রে আমাকে তোমার ব্রজের বৃক্ষ লতা ক'রে রাখ।' গ্রন্থাদিতে যেমনটি লেখা আছে, শ্রীবৃন্দাবনে নিয়মমত বাস কর্‌লে ক্রমে ক্রমে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। ভগবানের নরলীলা, তাঁর কৃপা না হ'লে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও বুঝ্‌বার যো নাই ; মানুষের আর কথা কি ?"

সংশয়সম্বন্ধে উপদেশ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সঙ্গে থাকিয়া ত দেখি, সন্দেহ পদে পদে। এর উপায় কি ? বিশ্বাস না হ'লে ত নিস্তার নাই।"

ঠাকুর বলিলেন—"সংশয়ও হয় আবার বিশ্বাসও হয় ; সবই তাঁর ইচ্ছায়। শাক্যসিংহ যখন সংসারে এলেন, এক দিন বাড়ীর বাহির হ'য়েই জরা, মৃত্যু, পীড়ার দৃশ্য দেখে অকস্মাৎ বিষম বৈরাগ্য হ'ল। তিনি গৃহ ত্যাগ কর্‌লেন। ছয় বৎসর কাল

একটানা কঠোর তপস্যা ক'রে একেবারে স্থাণুর মত হ'য়ে গেলেন। কিন্তু যা চান, তা লাভ হ'ল না। তিনি নিরাশ হ'য়ে আসন হ'তে উঠে পড়্‌লেন ; একটি শবের বস্ত্র পেয়ে তা পরতে উদ্যত হ'লেন। দেবতারা ঐ বস্ত্রখানা ধুয়ে এনে দিলেন। বুদ্ধদেব ক্ষুধিত ছিলেন, আহার কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌লেন। সেই সময়ে অভুক্ত অতিথিকে ভোজন করাবার জন্য সুজাতা লোক পাঠালেন; সে খুঁজে কোথাও লোক পেল না, একমাত্র বুদ্ধদেবকে দেখ্‌তে পেল। সুজাতা শাক্যসিংহকে একটি সুবর্ণ বাটিতে মিষ্টান্ন ভোজন কর্‌তে দিলেন। নিরঞ্জনা নদীতে দাঁড়ায়ে শাক্যসিংহ মিষ্টান্ন খেতে লাগ্‌লেন। দেবতারা তখন তাঁর চারি দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত যে পাঁচজন শিষ্য ছিলেন, তাঁরা শাক্যসিংহকে মিষ্টান্ন ভোজন কর্‌তে দেখে, পরস্পর বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লেন—'দেখেছ ভাই ? এ বেটা বিষম ভণ্ড ; এইরূপে মিষ্টান্নই খায়, কিন্তু আমাদের জানিয়ে খায় না। চল, এই ভণ্ড বেটার সঙ্গে থেকে আর কিছুই লাভ নাই।' এই ব'লে, সামান্য কারণে খট্‌কা লাগাতে, তাঁরা সকলে চ'লে গেলেন। শাক্যসিংহ, ভোজনান্তে সুজাতাকে বল্‌লেন, 'ভগ্নি, মিষ্টান্ন খেয়েছি, এই বাটি কি করব ?' সুজাতা বল্‌লেন—'মিষ্টান্নের সহিত বাটিও তোমাকেই দিয়েছি।' শাক্যসিংহ তখন সেই বাটি নদীমধ্যে নিক্ষেপ কর্‌লেন। দেবগণ তখন উহাহইতে প্রসাদ পেতে লাগ্‌লেন। ভোজনান্তে, শাক্যসিংহ অভীষ্টলাভের নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'রে, বোধিদ্রুমতলে বস্‌লেন। অন্তরের সমস্ত রিপুকুল পরাস্ত হ'ল, বাসনা কামনা একেবারে লয় পেল, বোধিসত্ত্ব তাঁর মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন, তিনি বুদ্ধ হ'লেন। বুদ্ধদেব অবতার, কিন্তু আত্মবিস্মৃত ছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্ব লাভ ক'রে ভাব্‌লেন, 'এ বস্তু কাকে দেই ;' তখন সেই পাঁচটি শিষ্যের কথা মনে হ'ল। তাদেরই এ বস্তু দিবার জন্য তিনি চল্‌লেন। পথে ঘাটমাঝিকে নদীপার করিতে বলায়, সে পয়সা চাইল। পয়সা নাই, তখন সঙ্কল্পমাত্রেই দেখ্‌লেন অপর পারে পৌঁছেছেন। কাশী যেয়ে সেই পাঁচজন শিষ্যকে দেখ্‌তে পেলেন ; তাঁরাও দূর হ'তে বুদ্ধদেবকে দেখ্‌তে পেয়ে, পরস্পর বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'আরে ভাই, ঐ দেখ, সেই ভণ্ড

বেটা! আবার সেই বেটা এদিকে আস্‌ছে! ওর সঙ্গে আমরা কোনও আলাপই কর্‌ব না।' কিন্তু বুদ্ধদেব যখন তাঁদের কাছে উপস্থিত হ'লেন, তখন তাঁরা খুব সসম্ভ্রমে ভক্তির সহিত আদর অভ্যর্থনা কর্‌লেন। তাঁর প্রভাবকে ত আর কারও অগ্রাহ্য কর্‌বার সাধ্য নাই। বুদ্ধদেব তখন তাঁদের কৃপা কর্‌লেন এবং বল্‌লেন—'তোমরা এই বস্তু প্রচার কর।' তাঁরাও ঐ আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে সকলকে সন্ন্যাসী কর্‌লেন। ভগবান যখন যা কর্‌তে আসেন, তা না ক'রে যান না। তিনি যাদের ধরেন কখনও তাদের ছাড়েন না। তিনি না ধর্‌লে মানুষের কি সাধ্য যে তাঁকে ধ'রে থাকে? মানুষের কিছুই ক্ষমতা নাই, তাঁর কৃপাই সার।"

শ্রাদ্ধান্ন ও উচ্ছিষ্টের অপকারিতা।

আমাদের একটি গুরুভ্রাতা (পার্ব্বতী বাবু), ঠাকুরকে আমতলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাইলে কি কোনও অনিষ্ট হয়? আমাদের ত প্রায়ই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ হ'য়ে থাকে।"

ঠাকুর বলিলেন—"শ্রাদ্ধে আহার কর্‌লে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে, ভক্তি-ভাব একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রাদ্ধান্ন ভোজন কর্‌লে সকল প্রকার দুষ্কার্য্যই তাহা দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে।"

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুকাল পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। ঘটনাটি ঢাকা হইতে কয়েক ঘণ্টার পথ তফাৎ মুন্সিগঞ্জে ঘটিয়াছিল।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"কিছু দিন হ'লো, একটি ভাল সন্ন্যাসী এই পথে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে মুন্সিগঞ্জে পৌঁছিয়া, একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। ব্রাহ্মণ খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে, নিজের ঠাকুর ঘরের বারেন্দায় তাঁর থাক্‌বার স্থান ক'রে দিলেন। সন্ন্যাসী নিজেই রান্না ক'রে, ভোজনান্তে বিশ্রাম কর্‌লেন। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেই ঠাকুরকে খুব ভক্তি কর্‌তেন, অনেক সোণার গহনা দিয়ে সাজিয়ে রাখ্‌তেন। সন্ন্যাসী সন্ধ্যা-আরতির সময়ে সে সকল দেখে, খুব আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন। শেষ রাত্রিতে

তিনি সেই সকল গহনা ঠাকুরের অঙ্গ হ'তে খুলে নিয়ে, চম্পট দিলেন। সকালে ব্রাহ্মণ উঠে দেখ্‌লেন, সন্ন্যাসী নাই। ভাব্‌লেন, 'উদাসীন সন্ন্যাসী, ওঁদের ত কোন লোক লৌকিকতা নাই, ইচ্ছে হয়েছে, চলে গিয়েছেন।' ব্রাহ্মণ স্নানান্তে ঠাকুর পূজা কর্‌তে ঠাকুর ঘরে যেমন প্রবেশ কর্‌লেন, দেখ্‌লেন, ঠাকুরের গায়ে সোণার গহনা নাই। দেখে ত একেবারে অবাক্। তখন সন্ন্যাসীরই এই কর্ম্ম বুঝে, গ্রামের সকলকে খবর দিলেন; সকলে চারিদিকে চোরের অনুসন্ধানে লোক পাঠালেন। এদিকে সন্ন্যাসী গহনা নিয়ে, শেষ রাত্রি থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে, বেলা অপরাহ্ণে একটি স্থানে বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থে বস্‌লেন। একটু পরে, স্থির হ'তেই, হঠাৎ তাঁর মনে হ'লো, 'ভাল, এ কি কর্‌লাম ?' তখন মাথা কপাল চাপ্‌ড়ে হাহাকার কর্‌তে লাগ্‌লেন। তৎক্ষণাৎ আর বিলম্ব না ক'রে, আবার সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে দৌড়িতে লাগ্‌লেন। সন্ন্যাসী তথায় পৌঁছিবামাত্রই, সকলে নানা প্রকার গালিগালাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। সন্ন্যাসী গহনার পুঁট্‌লি সম্মুখে রেখে বল্‌লেন, 'আপনারা একটু আমাকে স্থির হ'তে দিন ; আপনাদের সমস্ত গহনাই আমার কাছে পাবেন। পাড়ার দশটি ভদ্রলোককে এখানে ডেকে নিয়ে আসুন, আমার কিছু বল্‌বার আছে ; সকলের সাক্ষাতেই গহনা দিব।' ব্রাহ্মণ তাই কর্‌লেন। গ্রামের দশটি ভদ্রলোক এলে, সন্ন্যাসী সকলকে বল্‌লেন, " দেখুন, আপনাদের সকলের সাক্ষাতে এই ব্রাহ্মণকে আমি কয়টি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, ইনি আমার কথাগুলির যথার্থ উত্তর দিবেন। ছেলে বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে, এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত আমি দেশে দেশে পর্য্যটন ক'রে কাটাচ্ছি, এরূপ দুর্ম্মতি ত আমার কখনও হয় নাই। এত কাল ভজন সাধন ক'রে, যা কিছু আমি লাভ করেছিলাম, আপনার গৃহে একবেলা মাত্র অন্ন গ্রহণ ক'রে, আমার সে সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেছে। আমি জীবনে কখনও কারও এক কপর্দ্দক চুরি করি নাই। আপনার অন্ন গ্রহণের পর, অকস্মাৎ আমার এই দুর্ম্মতি হ'লো কেন ? ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে যা রান্না কর্‌তে দিয়েছিলেন, তাতে কি চোরের কোন প্রকার সংস্রব আছে ? এক বার অনুসন্ধান ক'রে

দেখুন দেখি।' ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ ক'রে অনুসন্ধানে জান্‌লেন—চাল, ডাল, ঘৃতাদি যা তিনি যজমানের বাড়ী হ'তে পেয়েছিলেন, তাই সন্ন্যাসীর সেবাতে দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীকে ব্রাহ্মণ ঐরূপ বলাতে, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—'আপনি যজমানের বাড়ী কি কার্য্য ক'রে ঐ সকল জিনিস পেয়েছিলেন?' ব্রাহ্মণ বল্‌লেন, 'কেন? শ্রাদ্ধ করিয়ে পেয়েছিলাম। তাই আপনাকে দেওয়া হইয়াছিল।' সন্ন্যাসী চমকে উঠে বল্‌লেন—'শ্রাদ্ধান্ন দিয়েছিলেন? আচ্ছা, যার শ্রাদ্ধ করিয়েছিলেন সে কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল?' তখন গ্রামের সকল ভদ্রলোকই বল্‌লেন—'বাবাজী, তার কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। অমন ভয়ানক চোর আর এদেশে জন্মেছে ব'লে আমরা কখনও শুনি নাই। এদেশের লোক তার নামে কাঁপ্‌ত, সে কয়েকবার জেলও খেটেছিল।'

সাধু বলিলেন—'দেখুন, সেই চোরের শ্রাদ্ধের অন্নগ্রহণেই আমার এই সর্ব্বনাশ। এই আপনাদের গহনা নিন, এখন আমার আর চন্দ্রনাথ যাওয়া হবে না। আমার সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেছে। এক মাস কাল আমাকে চান্দ্রায়ণ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে।' গ্রামের সকলে তখন তাঁকে যত্ন ক'রে রেখে, চান্দ্রায়ণের জোগাড় ক'রে দিলেন। সাধু এক মাস মুন্সিগঞ্জে থেকে চান্দ্রায়ণ ক'রে চ'লে গেলেন। শ্রাদ্ধান্ন অতি বিষম জিনিস। খেলে আর রক্ষা নাই; ভক্তির দিক একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আশ্চয্য বোধ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্রাদ্ধান্ন ত শ্রাদ্ধের সময়ে যাহা কিছু প্রেতকে দেওয়া হয়, এই জানি। ঐ শ্রাদ্ধবাড়ীর চাল, ডাল দূষিত হয় কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"শ্রাদ্ধসময়ে প্রেতকে আহ্বান করা হয়। ঐ প্রেতের দৃষ্টি যে সকল বস্তুতে পড়ে, সে সমস্তই প্রেতের উচ্ছিষ্ট হ'য়ে যায়। এই জন্য শ্রাদ্ধবাড়ীর কোন বস্তুই খেতে নাই, খেলে ঐ প্রেতের উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয়।"

পার্ব্বতী বাবু বলিলেন—"তা হ'লে আমরা যজমানের বাড়ী শ্রাদ্ধ করাইয়া আর কিছু কি নিব না? শ্রাদ্ধের ভোজ্য গ্রহণ, এই নিয়ম ত চিরকালই পুরোহিতদের ভিতরে চলিয়া আসিতেছে।"

ঠাকুর বলিলেন—"ভোজ্য নিবেন না কেন? তবে উহার ব্যবহার নিজেদের করতে নাই, বিক্রয় ক'রে ফেল্‌তে হয়।"

আমি বলিলাম—"যিনি খরিদ ক'রে নিবেন, তাঁকে ত উচ্ছিষ্ট বস্তুই গ্রহণ কর্‌তে হবে।"

ঠাকুর বলিলেন—"না, যিনি মূল্য দিয়ে নিবেন, তিনি পবিত্র বস্তুই নিবেন। 'দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি।' মূল্য দিয়ে নিলে ওসব জিনিস পবিত্র হয়, কোন দোষই থাকে না। যিনি বিক্রয় করেন, এবং যিনি ক্রয় করেন, কারও ক্ষতি হয় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার ব্যবস্থা ত সকল সমাজেই আছে। শাস্ত্রেরও ইহাই বিধি বলিয়া শুনিয়াছি। শ্রাদ্ধবাড়ীতে সকলেই ত নিমন্ত্রণ খায়।"

ঠাকুর বলিলেন—"শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাবে না কেন? শ্রাদ্ধদিনে শ্রাদ্ধবাড়ীতে কিছুই খেতে নাই। ব্রাহ্মণভোজনাদি ঐ দিনে ত হয় না।"

শ্রাদ্ধদিনে প্রেতকে আহ্বান করাতে প্রেতের দৃষ্টিতে ঐ বাড়ীর যাবতীয় বস্তুই উচ্ছিষ্ট হয় বলিয়া, শ্রাদ্ধবাড়ীতে ভোজন নিষেধ। প্রেতের কল্যাণার্থে ব্রাহ্মণাদি ভোজন যে সময়ান্তরে হয়, তাহাতে প্রেতের আহ্বান নাই, উচ্ছিষ্ট সম্ভাবনাও নাই।

ঠাকুর এই প্রকারের আরও অনেক কথা বলিলেন।

অপঘাতে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার উৎপীড়ন।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত কোনও ভদ্রপল্লীর কায়স্থবংশোদ্ভব একটি বালক, কিছুকাল হয়, ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। দীক্ষা গ্রহণের পরই ইহার ভজননিষ্ঠা, ঠাকুরের প্রতি স্বাভাবিক টান এবং সরলতা দেখিয়া অনেক সময়ে বিস্মিত হইয়াছি। এক দিন ঠাকুরের নিকট আসিয়া সে বলিল—"গোঁসাই, সত্যই তুমি আমাদের উদ্ধার করবে ত?"

ঠাকুর বলিলেন—"তোমাদের উদ্ধার না হ'লে আমার ত নিষ্কৃতি নাই। দেখ না, রাখাল সমস্ত গরু নদীর পাড়ে একত্রিত ক'রে, একটি একটি ক'রে সকলগুলিকে পার ক'রে দেয়; পরে শেষ যেটি থাকে, তার লেজ ধ'রে নিজে পার হয়। আমিও তোমরা সকলে পার হ'লে, শেষটিকে ধ'রে নিজে পার হব।"

শুনিতেছি কিছুদিনযাবৎ নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য ও অস্বাভাবিক ব্যবহার আমাদের এই গুরুভাইটির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে। মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে বলিয়া, অভিভাবকেরা তাহাকে নাকি দোতালা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখেন। সে তথা হইতেই রাস্তায় লাফাইয়া পড়িয়া, বিন্দুমাত্র আঘাত না পাইয়া, অনায়াসে এক দিকে ছুটিয়া পলাইয়া যায়। আবার কখনও বা কোঠা ঘরে বন্ধ করিয়া বাহিরে শিকল দিয়া আসিবার পর দেখা গিয়াছে, সে রাস্তায় আসিয়া বেড়াইতেছে, শিকল খোলা রহিয়াছে। সাধনপ্রভাবে সে অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়াই এতদিন আমাদের সংস্কার ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি অন্য প্রকার। গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া এখন সে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। উপস্থিত তার অসীম দুঃসাহস, অনাচার ও অত্যাচার দেখিয়া সকলেই অস্থির। কয়েকদিনযাবৎ তার মানুষ খুন করিবার ঝোঁক চাপিয়াছে। আশ্রমে এখন কাহারও স্থির হইয়া চোখ বুজিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিবার উপায় নাই; সকলেই তার ভয়ে সশঙ্ক। ঠাকুরের নিকটে সে কখনও যায় না। দূরহইতে সে ঠাকুরকে দেখিতে পাইলে কখনও বা ভয়ে কাঁপিতে থাকে, কখনও স্তব স্তুতি করে, আবার কখনও, নানাপ্রকার অশ্লীল ভাষায় ঠাকুরকে গালাগালি করিয়া, ইষ্টকাদি ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিবারও চেষ্টা করে। নিয়তই উহাকে চোখে চোখে রাখিতে হয়, ইহা এক বিষম উৎপাত। নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"অকস্মাৎ এই ছেলেটির এই দশা ঘট্‌ল কেন? কিছুকাল পূর্ব্বে ত এ ভালমানুষ ছিল?"

ঠাকুর বলিলেন—"**একটি প্রেত ওকে আশ্রয় করেছে। এখন ওর সমস্ত কার্য্যই ঐ প্রেতদ্বারা হ'চ্ছে।**"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রেত উহাকে ধর্‌ল কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"**ওর পূর্ব্ব পুরুষ কোনও ব্যক্তি, একটি ধনী ভদ্রলোকের সঙ্গে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন। ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে বিস্তর টাকা ছিল। টাকার লোভ সংবরণ কর্‌তে না পেরে, তিনি নির্জ্জন পথে সেই ভদ্রলোকটিকে অতি নিষ্ঠুরভাবে বধ করেন। অপঘাতে মৃত্যু ঘটাতে সেই প্রেতের বিষম আক্রোশ জন্মে। ইনি যতকাল জীবিত ছিলেন, এই প্রেতদ্বারা নানা প্রকার অত্যাচার ভোগ করেছেন। দেহত্যাগের পরেও, বংশধরদ্বারা কোন প্রকার সদ্গতি লাভ না হয় এই অভিপ্রায়ে, সে ওঁর বংশলোপ কর্‌বার চেষ্টায় আছে। এই ছেলেটির দ্বারা তার পূর্ব্বপুরুষের সদ্গতি লাভ হবে জেনেই, একে আশ্রয় ক'রে, নানা**

প্রকারে বিপন্ন কর্‌বার চেষ্টায় আছে। তোমরা এর সঙ্গে ব্যবহারে, সর্ব্বদা সাবধানে থেকো।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“সময়ে সময়ে এমন বিষম কাণ্ড কর্‌তে চেষ্টা করে যে, তাহা দেখিয়া সহ্য করা যায় না, কখন কাকে খুন করে সর্ব্বদা এই ভয় হয়। সহ্য কর্‌তে না পার্‌লে কি কর্‌ব?”

ঠাকুর বলিলেন—“মনে মনে প্রেতকে লক্ষ্য ক'রে, খুব তেজের সঙ্গে নাম কর্‌তে কর্‌তে, ওকে কিল চাপড় মেরো। তাতে প্রেতকেই মারা হবে; ছেলেকে স্পর্শ কর্‌বে না। এরূপ কর্‌লে প্রেত ছুটেও যেতে পারে।”

ইহার পর আমরা ছেলেটির অত্যাচার দেখিলেই, কিল চাপড় মারিতে লাগিলাম। ২।৪ দিনের প্রহারের চোটেই ছেলেটির ঘাড়ের ভূত ছুটিয়া গেল এবং সে প্রকৃতিস্থ হইল। কিন্তু জানি না কেন, সে বেশী দিন আশ্রমে টি`কিতে পারিল না; দিন দুই হয়, কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

অর্থহইতে কতপ্রকার অনর্থ ঘটে, তাহা বুঝাইতে ঠাকুর বলিলেন—“টাকার জন্যই ত অপঘাত মৃত্যু এবং পরলোকে প্রেতত্ব লাভ হ'লো। আর এক জন, টাকার লোভেই নরহত্যা ক'রে, পরলোকে অসদ্গতি লাভ কর্‌লে, বংশধরদের পর্য্যন্ত বিপন্ন কর্‌লে। টাকা বিষম কালকূট, কখনও পুষে রাখ্‌তে নাই। টাকা উপার্জ্জন ক'রে, প্রয়োজনমত খরচ কর্‌তে হয়। অবশিষ্ট যা কিছু থাক্‌বে, ভগবানের গচ্ছিত ধন মনে ক'রে, যার অভাব অকাতরে তাকেই দিতে হয়। বিপদে প'ড়ে কেউ কিছু চাইলে, অমনই দিয়ে দিতে হয়, কোনও দ্বিধা কর্‌তে নাই। ধর্ম্ম যাঁরা চান, তাঁদের এভাবেই চল্‌তে হয়; দিন কোনও প্রকারে কেটে গেলেই হ'লো।”

প্রেতাত্মার মুক্তির উপায়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—অপঘাত মৃত্যু প্রভৃতিতে যাহাদের পরলোকে অসদ্গতি ঘটে, বংশধরদের কিরূপ কার্য্য-দ্বারা তাহাদের সদ্গতি লাভ হয়?

ঠাকুর বলিলেন—“শাস্ত্রে আছে, গয়াতে যথামত পিণ্ডদান কর্‌লেই, তাদের সদ্গতি হ'য়ে থাকে।”

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"গয়াতে পিণ্ড দিলে সত্যই কি প্রেত তাহা গ্রহণ করে?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ব্যবস্থামত দিলে পরলোকগত আত্মা তা গ্রহণ করে। আমি যখন গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করতে গিয়েছিলাম, তখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অনেক সময় থাক্‌তাম। ঐ সময়ে একবার একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল। আমার একটি ব্রাহ্মবন্ধু, বিলাতফেরত ডাক্তার, সেই সময়ে গয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁর পরলোকগত পিতা, তাঁকে এক দিন স্বপ্নে বল্‌লেন—'বাপু, যদি গয়ায় এসেছ, আমাকে একটি পিণ্ড দাও; আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।' তিনি ব্রাহ্ম, ওসব কিছুই বিশ্বাস করেন না, তাই উড়িয়ে দিলেন। পরদিন রাত্রিতে আবার স্বপ্নে দেখ্‌লেন, পিতা অত্যন্ত কাতরভাবে বল্‌ছেন,—"বাবা, তোমার কল্যাণ হবে, আমাকে একটি পিণ্ড দিয়ে যাও।" ছু'বার স্বপ্ন দেখেও তিনি তা গ্রাহ্য কর্‌লেন না। আমাকে এ বিষয় এসে বল্‌লেন। আমি তাঁকে বল্‌লাম—"পুনঃপুনঃ যখন এরূপ দেখ্‌ছেন, তখন পিণ্ড দেওয়াই উচিত।" তিনি আমার উপর বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, 'আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হ'য়ে, এরূপ কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন?' আমি তাঁকে বল্‌লাম, 'আপনি ত আর আপনার বিশ্বাসমত দিবেন না, আপনার পিতার বিশ্বাসমত দিবেন, তাতে বাধা কি?' তিনি তাতেও সম্মত হলেন না। পরে আর এক দিন শুয়ে আছেন, সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছে, দেখ্‌লেন, পিতা জোড় হাত ক'রে বল্‌ছেন—'বাপু আমাকে একটি পিণ্ড দিলে না?' বন্ধুটি তখন আমাকে এসে বল্‌লেন, 'মশায়, আজ আবার পিতাকে স্বপ্নে দেখ্‌লাম, তিনি করজোড়ে কাতর হ'য়ে বল্‌ছেন—বাপু, আমাকে একটি পিণ্ড দিলে না? আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।' শুনে আমার কান্না এল। আমি তখন বল্‌লাম, 'আপনি নিজে না দেন, প্রতিনিধিদ্বারাও ত দেওয়াইতে পারেন।' তিনি চুপ ক'রে রইলেন। আমি চুটি টাকা নিয়ে, একটি পাণ্ডাকে ওঁর প্রতিনিধি হ'য়ে পিণ্ড দিতে ব্যবস্থা ক'রে দিলাম। এই পিণ্ডদানের দিন বন্ধুটিকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বিষ্ণুপাদপদ্মে উপস্থিত হ'লাম। প্রতিনিধি পাণ্ডা যখন পিণ্ডদান কর্‌লেন, তখন দেখ্‌লাম বন্ধুটির চোখ দিয়ে

দরদর ধারে জল পড়্‌ছে। তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে অস্থির হ'য়ে পড়্‌লেন; পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন, 'মশায়, যখন পিণ্ড দেওয়া হয়, তখন আমি পরিষ্কার দেখ্‌লাম, আমার পিতা খুব আগ্রহের সহিত দুই হাত পেতে পিণ্ড গ্রহণ কর্‌লেন, এবং হাত তুলে আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন—বাপু, আমার যথার্থ উপকার কর্‌লে, তুমি সুখে থাক, ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। আহা, আগে যদি আমি জান্‌তাম পিতা এভাবে এসে পিণ্ড গ্রহণ কর্‌বেন, তা হ'লে আমি নিজেই খুব যত্ন ক'রে পিণ্ড দিতাম।' এ সকল ব্যাপার কি যুক্তি তর্কে বুঝান যায়?"

ধর্ম্মরূপে অধর্ম্ম।

আজ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই ত দয়া, সরলতা প্রভৃতিকে ধর্ম্ম বলিয়াছেন; কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, দয়া ক'রে লোকের ক্ষতি করা হয়, আবার সরল হ'য়ে এবং বিশ্বাস ক'রেও অনুতাপ ভোগ কর্‌তে হয়। সুতরাং যথার্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিসে বুঝ্‌ব?"

ঠাকুর বলিলেন—"অধর্ম্ম, অধর্ম্ম-রূপে মানুষের নিকট উপস্থিত হ'লে, লোকে তা সহজেই বুঝ্‌তে পারে এবং তাহার আক্রমণ হ'তে রক্ষা পাওয়ারও একটা চেষ্টা কর্‌তে পারে; কিন্তু অধর্ম্ম, ধর্ম্মের আকারে এসে পড়্‌লে, তা বুঝে নেওয়া বড়ই শক্ত। সিদ্ধ পুরুষেরাও সে স্থলে ঠ'কে যান, স্বয়ং ভক্তরাজ মহাবীরেরও মতিভ্রম ঘটেছিল, মানুষের আর কথা কি!"

এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তরাজ মহাবীরের কথা বলিতে লাগিলেন—নিজের ইষ্টদেবতা রামলক্ষ্মণকে পাপরূপী মহীরাবণের হাতহইতে রক্ষা করিবার জন্য, নিজ লেজের কুণ্ডলী দ্বারা গড় প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যে রামলক্ষ্মণকে রাখিলেন এবং দরজায় খুব সতর্ক হইয়া রহিলেন, যেন কোনও ছলে মায়ারূপী পাপ মহীরাবণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামলক্ষ্মণকে অপহরণ না করে। মহীরাবণ কখনও কৌশল্যার, কখনও দশরথের, কখনও বা জনকের, কখনও বা ভরতের আকারে আসিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন; কিন্তু ভক্তরাজ সকলকেই করজোড়ে বলিলেন, 'একটুকু অপেক্ষা করুন, বিভীষণ এখনই আসিবেন, তিনি বলিলেই দরজা ছাড়িয়া দিব।'

মহীরাবণ যখন কোনও প্রকারে হনুমানকে ভুলাইতে পারিলেন না, তখন বিভীষণেরই রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—'মহাবীর, শীঘ্র দরজা ছাড়িয়া দাও, আমি একবার রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া আসি।' হনুমানের একবার সংশয় হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে আর মনোযোগ দিবার অবসর পাইলেন না। বিভীষণরূপী মহীরাবণ অমনই বলিলেন, 'মহামায়াবী মহীরাবণ নিয়ত ঘুরিতেছে, জানি না কখন কোন্ ছলে ভিতরে প্রবেশ করে। তুমি খুব সাবধানে থাক, আমি একবার রামলক্ষ্মণের শিরে রক্ষা বেঁধে আসি।' তখন হনুমান দ্বার ছাড়িয়া দিলেন। মহীরাবণও অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত রামলক্ষ্মণকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন।

এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—অধর্ম্ম, যে কোনও রূপে ভক্তের নিকট আসুক না কেন, ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি স্থির থাক্‌লে কিছুতেই তাকে বিচলিত কর্‌তে পারে না। কিন্তু ধর্ম্মের আকারে অধর্ম্ম এসে উপস্থিত হ'লে, মহা-সিদ্ধপুরুষকেও মুগ্ধ ক'রে ফেলে। গয়ার আকাশগঙ্গার বাবাজী, দয়া কর্‌তে গিয়ে, কি বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্তই না হ'লেন!

রঘুবর বাবাজীর ঐশ্বর্য্যের কথা।

আকাশগঙ্গার বাবাজীর কথা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—গয়ার বাবাজীর অদ্ভুত শক্তি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। রাত্রে বড় বড় বাঘ এসে বাবাজীর পায়ের কাছে মাথা হেঁট ক'রে প'ড়ে থাক্‌তো; বাবাজী আটার টিক্কর প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌তেন, রাত্রিতে বাঘ এলে হাতে ক'রে তিনি তাই বাঘকে খাওয়াতেন। গোখ্‌রো সাপগুলো বাবাজীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াতো। বাবাজী নিশ্চল হ'য়ে নাম জপে মগ্ন থাক্‌তেন। আকাশের দিকে তাকায়ে কখনও পাখীদের বল্‌তেন, "আরে তু ভি রামজীকা জীব হো, মৈঁ ভি উন্‌হিকা দাস; ইঁহা আয়কে মেরা কাণ সাফা কর্ দে।" বাবাজী এই কথা বল্‌বামাত্র পাখীরা উড়ে এসে বাবাজীর ঘাড়ে পড়্‌তো এবং কাণ খুঁচে দিয়ে যেতো। এক এক সময়ে দুই তিন শত লোক বাবাজীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হ'লেও, বাবাজী আসন হ'তে না উঠে, তাঁদের লুচি

মণ্ডা প্রভৃতি দিয়ে ভোজন করাতেন। পাহাড়ে জলাভাবে অনেক সময়ে বিষম ক্লেশ হ'তো। বাবাজী মহাবীরের কাছে তিন দিন ধন্না দিয়ে প'ড়ে রইলেন; পরে মহাবীরের কৃপা হ'লো; পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর দেখায়ে মহাবীর বল্‌লেন—"একখানা লাঠি দিয়ে এই পাথরের উপর সামান্য আঘাত কর, পাথরের নীচ হ'তে ঝরণা বেরিয়ে পড়্‌বে।" বাবাজী তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে একখানা লাঠি নিয়ে যেমনই ঐ প্রস্তরের উপর আঘাত কর্‌লেন, অমনই প্রকাণ্ড একটা পাথরের চটান, লক্ষমণেরও অধিক, দ্রুম ক'রে ভেঙ্গে প'ড়ে গেল। আর সেই স্থান হ'তে কল্ কল্ রবে জল ছুট্‌লো। বাবাজী ঐ ঝরণার নাম যমুনা রেখেছিলেন। এখনও সেই ঝরণা সেই রকমই আছে। কখনও ওখানে জলাভাব হয় না।

দয়াতে পতন।

ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতেই আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, শুনিতে পাই বাবাজী নাকি খুব ভক্তও ছিলেন, সকলেরই প্রতি নাকি তাঁর খুব দয়া ছিল?

ঠাকুর বলিলেন—দয়া তাঁর অসাধারণ ছিল; কিন্তু এই দয়াই তাঁর পতনের কারণ হ'লো।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—দয়া করিলে আবার পতন হয় নাকি?

ঠাকুর বলিলেন—তা আর হয় না?

এই বলিয়া ঠাকুর, আকাশগঙ্গার বাবুবর বাবাজীর সম্বন্ধে এইরূপ বলিতে লাগিলেন বাবাজীর একটি গুরুভাই ছিলেন, তিনি ফল্গুর অপর পারে রামগয়া পাহাড়ের নীচে একটি গ্রামে বাস করিতেন। তাঁর স্ত্রী এবং দুইটি নাবালক ছেলে ছিল। গুরুভাই পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত হইলে, বাবাজী প্রত্যহ যাইয়া তাঁহার সেবা করিতেন। মৃত্যুসময়ে তিনি নাবালক দু'টি সন্তান এবং স্ত্রীকে বাবাজীর হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। বাবাজী প্রত্যহ দু'বেলা নিজে রান্না করিয়া, তাহাদের জন্য দুই ক্রোশ পথ খাবার বহিয়া লইয়া যাইতেন; কিছু দিন এইরূপ সেবা করিয়া, বৃদ্ধ বাবাজী হয়রান হইয়া পড়িলেন। তখন ভাবিলেন, অসহায়া বিধবা স্ত্রীলোক ও নাবালক ছেলে দু'টিকে নিকটেই আনিয়া রাখি না কেন? ইহাতে আমার ভজনের প্রচুর সময় পাইব, যাতায়াতেও হয়রান হইতে হইবে না; স্ত্রীলোকটিকে সর্ব্বদা

নজরে রাখিতে পারিব এবং ছেলে দু'টিও মানুষ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া বাবাজী ছেলে দুইটির সহিত স্ত্রীলোকটিকে আশ্রমে আনিলেন। পাহাড়ে আসিয়াই একটি ছেলের মৃত্যু হইল। অপর ছেলেটির প্রতি বাবাজীর ক্রমেই মায়া বৃদ্ধি পাইল। বাবাজী ছেলেটির ভবিষ্যৎ ভাবিতে লাগিলেন। বাবাজীর নিকট অনেক সময় বড় বড় লোক যাইতেন, শত শত টাকা প্রণামী পড়িত; বাবাজী একটি কপর্দ্দক পর্য্যন্ত না রাখিয়া, সমস্তই দীনদুঃখীদের দান করিয়া ও ভাণ্ডারা দিয়া ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু যে সময়ে স্ত্রীলোকটি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়হইতে দান ও ভাণ্ডারা কমিয়া গেল। লোকে অনুমান করিতে লাগিল, ঐ স্ত্রীলোকটির ও ছেলেটির মায়ায় পড়িয়া, বাবাজী অর্থসঞ্চয় আরম্ভ করিয়াছেন। বাবাজীর একটি প্রিয় শিষ্য, পুনঃপুনঃ বাবাজীকে বলিলেন, "মহারাজজী, লেড়কা আউর আউরত্‌কো পাহাড়মে নেহি রাখ্‌না। আপ্‌কা বিপদ হোগা, সহরমে রাখ্ দিজিয়ে।" বাবাজী প্রথম প্রথম তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আমার গুরুভাই মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আমার নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; সুতরাং যতটা নিরাপদে ইহাদিগকে রাখিতে পারি রাখিব। ইহারা আমার আশ্রিত, ইহাদিগকে নিয়ত সঙ্গে রাখিয়া বিপন্ন হইলেও, আমি ইহাদের কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। ইহারা বড়ই দুঃখী।" ঐ শিষ্যটি বাবাজীকে আর এক দিন বলিলেন, "মহারাজ, পাহাড়ে স্ত্রীলোক থাকিলে আপনার বিষম দুর্নাম হইবে। আর উহাদের জন্য টাকা পয়সা সঞ্চয় করিতেছেন, সাধারণের এইরূপ একটা সংস্কারও জন্মিবে। এই নির্জ্জন পাহাড়ে গুণ্ডাদেরও উৎপাত হইবে।" বাবাজী তখন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'কোন্ শালা হামারা ক্যা কর্‌নে সেক্‌তা হ্যায়? আনে দেও।' শিষ্যটিও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শুনিতে পাই, ২।৪ দিন পরে ঐ শিষ্যটিই, গুণ্ডাদের লোভ দেখাইয়া, বাবাজীর আশ্রম লুট করিতে যুক্তি দেন। এক দিন গভীর রাত্রিতে সতর জন গুণ্ডা, বাবাজীর আশ্রমে মার্ মার্ রবে আসিয়া পড়িল। বাবাজী একখানা লাঠি হাতে লইয়া বাহির হইলেন; একাকী সতর জন গুণ্ডাকে পিটাইয়া ভাগাইলেন। দ্বিতীয় বারে গুণ্ডারা বাবাজীকে আবার যখন আক্রমণ করিল, বাবাজী পূর্ব্বের মত এবারও হাতের লাঠিখানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সকলকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। হঠাৎ লাঠিখানি একখানা পাথরে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, অমনই গুণ্ডারা বাবাজীকে ধরিয়া ফেলিল, তৎপরে লাঠির উপর লাঠি মারিয়া বাবাজীকে একেবারে জ্ঞানশূন্য করিল। বাবাজী সংজ্ঞাশূন্য হইলেও গুণ্ডারা নিরস্ত হইল না, পাথরের দ্বারা ঠুকিয়া ঠুকিয়া বাবাজীর মাথার, পাঁজরার ও হাতের হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিল।

অতঃপর পায়ে গামছা বান্ধিয়া, ৪।৫ জনে টানিয়া ছেঁচ্ড়িয়া পাহাড়ের উপর তুলিল, এবং একটা স্থানে বাবাজীকে ফেলিয়া বড় একখণ্ড প্রস্তর বাবাজীর বুকের উপর চাপাইয়া চলিয়া গেল। নিত্য প্রত্যুষে যাঁহারা পাহাড়ে যাইতেন, ঐ দিন ভোর হইতেই তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য, বাবাজী নাই। যেখানে সেখানে খণ্ড খণ্ড রক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। বাবাজী কোথায় আছেন অনুসন্ধান করিতে করিতে, পাহাড়ের উপরে সকলে যাইয়া দেখিলেন, বাবাজী প্রকাণ্ড একখানা পাথর চাপায় পড়িয়া আছেন, রক্তে সমস্ত স্থানটি ভাসিয়া গিয়াছে। তখন বহুলোক একত্র হইয়া, অনেক চেষ্টায় পাথরখানা সরাইয়া ফেলিল, পরে বাবাজীর দেহটি আশ্রমে আনিয়া মহাবীরের নিকট ফেলিয়া রাখিল, এবং পুলিসে খবর দিল; পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজীর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত এবং শ্বাস রুদ্ধ দেখিয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। অকস্মাৎ বাবাজী গা নাড়া দিয়া মহাবীরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিলেন, "জয় মহাবীরজী, তেরা জয়, ধন্য তেরা দয়া! হাম্ য্যায়্সা কসুর কিয়া ত্যায়্সাই দণ্ড্ দিয়া। তু বড়া দয়াল, তু বড়া দয়াল!" পুলিস সাহেব বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহারা আপনার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও আপনি চিনেন?" বাবাজী বলিলেন, আমি সকলকেই চিনি; কিন্তু তাদের একজনেরও নাম বলিব না। তাহারা ভগবানের দিক হইতেই গুরুতর দণ্ড পাইবে, আপনারা আবার তাহাদের শাস্তি দিবেন কেন? পুলিস সাহেব অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাবাজী কিছুতেই তাহাদের নাম বলিলেন না। এই ঘটনার পর বাবাজীর জ্বর হয়; তিনি পাহাড় ত্যাগ করিলেন; এখন আর রাত্রিতে তিনি পাহাড়ে থাকেন না, "চান-চউরাতে" থাকেন।

এইরূপ বলিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"আকাশগঙ্গার বাবাজীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখ্‌লে, তাঁর অতীত অবস্থা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। আকাশের নক্ষত্র যেমন ছুটে পড়ে, একটু অহঙ্কার জন্মালেই, মহা মহা যোগীদেরও সেই প্রকার পতন হয়। অহঙ্কারের হাত হ'তে রক্ষা পাবার উপায়, সর্ব্বজীবে সেবা। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতারও সেবা কর্‌তে হয়। গুয়ের পোকাকেও ঘৃণা কর্‌তে নাই। সকলকেই নিজ হ'তে বড় মনে কর্‌তে হয়। প্রাণের সহিত সকলের পায়ে মাথা নোয়ায়ে রাখ্‌লেই রক্ষা। মাথা তুল্‌লে আর নিস্তার নাই। পরমহংসজী যখন আমাকে কৃপা কর্‌লেন, বাবাজীকে আমি সমস্ত বল্‌লাম,

বাবাজীর শুনে অভিমান হ'লো, তিনি বল্লেন, "আরে এক জঙ্গলমে দো সের নেহি রহনে সেক্‌তা হ্যায়, ইঁহা আউর কোই নেহি হ্যায়; তোমারা যো কুছ্‌হুয়া, হাম্‌ই কিয়া। দেখো হিঁয়া যমুনা হাম্‌ই লে আয়া, দোস্‌রা কোই নেহি।" আমার তখনই মনে হ'লো, বাবাজীর এরূপ অভিমানেই অচিরে সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে। এমন শক্তিশালী পুরুষকেও পতিত হ'তে হ'লো! পরে তাঁর কি দুর্দ্দশা না ঘট্‌ল? এখন তিনি মুষ্টিভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বাবাজী কি আর পূর্ব্বাবস্থা লাভ কর্‌তে পার্‌বেন না?

ঠাকুর বলিলেন—"তিনি খুব কঠোর সাধক, স্থির হ'য়ে বস্‌লে, অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত শুধ্‌রে নেবেন, পূর্ব্বাবস্থা লাভ কর্‌বেন।"

রঘুবর বাবাজীর কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইলাম, এত বড় মহাত্মারও এরূপ দুর্দ্দশা ঘটে! জিজ্ঞাসা করিলাম—কামিনী কাঞ্চনে আকর্ষণ কত দিন থাকে?

ঠাকুর বলিলেন—"যত দিন মন থাকে, তত দিন স্ত্রী-পুরুষে এবং বিষয়-বিষয়ীর আকর্ষণ থাকে। মন লয় হ'লেও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য হ'য়ে থাকে বটে, কিন্তু তাহা অন্য প্রকার।

অভিমান কিসে হয়?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—রঘুবর বাবাজী ত খুব বিনীত সাধু ছিলেন, তাঁর আবার অভিমান কিসে হইল?

ঠাকুর বলিলেন—"অভিমান ত আর এক প্রকার নয়? অভিমানও নানা রকমের আছে। অনেক টাকা থাক্‌লে অভিমান হয়, অনেক বিদ্যাতে অভিমান হয়। এরূপ যে অভিমান, তা সহজেই নষ্ট করা যায়। কিন্তু আর এক রকমের অভিমান আছে, ঠিক এর বিপরীত। তার হাত এড়ান বড়ই কঠিন। নির্ধন ব্যক্তি মনে করে, ধনী তাকে ঘৃণা করেন, সুতরাং ধনীর উপরে তার অভিমান হয়। মূর্খ মনে করে বিদ্বান্ তাকে অগ্রাহ্য করেন, এ ভাবে বিদ্বানের উপরও মূর্খের অভিমান হয়। পাপী সংসারাসক্ত ব্যক্তিও ধার্ম্মিক উদাসীন সন্ন্যাসীর উপর অভিমান করে। এই প্রকারের অভিমান সত্য যুগ হ'তে চ'লে

আস্‌ছে। রাজর্ষি জনকের নিকট, অনেক ঋষি তপস্বীও যেয়ে, এই প্রকার অভিমান প্রকাশ কর্‌তেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সদ্‌গুরুর নিকট যাঁরা সাধন লাভ করেন, তাঁদেরও কি ভগবান্ দয়া কর্‌বেন না ?

ঠাকুর বলিলেন—"তাঁরা উপযুক্ত সাধন লাভ করেছেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দীন হীন কাঙ্গাল ব'লে নিজেকে না বুঝা পর্য্যন্ত কিছুই ত হবে না! কাঙ্গালকেই দীননাথ দয়া ক'রে থাকেন। অভিমানী ব্যক্তি দয়ার পাত্র নয়।"

একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাপুরুষেরা দয়া ক'রে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের সমস্ত কুস্বভাব দূর ক'রে ভাল ক'রে নিতে পারেন নাকি ?

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা পারেন; কিন্তু যিনি প্রণালী মত না ক'রে, ঐ প্রকার দয়া করেন, তাঁকে ভুগ্‌তে হয়, পতিত হ'তে হয়। যেমন গয়ার বাবাজী পরের উপকার কর্‌তে গিয়ে বৃদ্ধ বয়সে আপনি পতিত হন। তাঁর সেই অসাধারণ প্রভাব একেবারেই নষ্ট হ'য়ে গেছে। এখন দেখ, তিনি ঢাকায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ সকলের কি দরকার ছিল ? সুখ দুঃখ ভোগ মাত্র। ভগবান্‌ই ত সব করেন; আমার কি ক্ষমতা ? আমি আর কি কর্‌তে পারি ? কার কোন অবস্থায় প'ড়ে পতন হয়, তা বলা যায় না। মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত আর কিছুরই বিশ্বাস নাই। কারও হয় ত মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটা বাসনা জন্মে, তাই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও কিছুই বিশ্বাস নাই।"

কার্ত্তিক।

ঔষধে বাবাজীর আপত্তি।

আশ্বিন মাস শেষ হইতেই মাতাঠাকুরাণীকে দেখিতে আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। আমি ঠাকুরের অনুমতি লইয়া বাড়ী গেলাম। গহনার (খেয়ার) নৌকায় ৪।৫ ঘণ্টা থাকিয়া সেরাজদিঘা পঁহুছিতে হয়। গহনার নৌকায় সাতটার সময়ে চাপিয়া বেলা প্রায় বারটা পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। অর্দ্ধেক পথ আসিয়া আমার ভয়ানক শিরঃপীড়া হইল, আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। গহনায় প্রায় পঁচিশ জন লোক ছিল, সকলেই আমার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক জন কবিরাজ আমাকে একটি ঔষধের বড়ি দিয়া বলিলেন, "এক গণ্ডূষ জল সহিতে ইহা খাইয়া ফেলুন, বেদনা সারিয়া যাইবে।" ঐ সময়ে একজন বৈষ্ণব গলুইয়ের উপর বসিয়া হরিনামের ঝুলি লইয়া জপ করিতেছিলেন, সকলে তাঁহাকে উপহাস করিতেছিল। আমি যেমনই ঐ ঔষধের বড়িটি কবিরাজের নিকটহইতে খাইবার জন্য হাতে লইলাম, অমনই সেই বৈষ্ণব বাবাজী, কট্‌মট্ করিয়া একবার কবিরাজের দিকে চাহিয়াই, আমার বেশভূষা দেখিয়া আমাকেও নিজেরই দলের লোক ঠাওরাইয়া, নৌকার গলুইহইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং দুই তিন লাফে আমার নিকটে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা গোঁসাই, আপ্‌নে ক্যান্ ওষুধ খাবেন, ঐ বড়ি ফিক্যা ফ্যালাইয়া দ্যান্ ধলেশ্বরীর জলে; একবার কিষ্ট কন্, একবার কিষ্ট কন্।" বাবাজীর রকম দেখিয়া আমি আর ঔষধ খাইতে সাহস পাইলাম না; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বাবাজীর ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ আমার বেদনার শান্তি হইল, নৌকার সকলেই তখন অবাক্ হইয়া গেলেন।

কার্ত্তিক ১লা—১৭ই পর্য্যন্ত।

আমাদের পাড়াগাঁ সম্বন্ধে ঠাকুরের নানা কথা।

বাড়ীতে সাত আট দিন থাকিয়া, আবার গেণ্ডারিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যখনই আমি বাড়ীহইতে আসি, ঠাকুর আমাকে দেশের খবর জিজ্ঞাসা করেন। এবার ঠাকুর বলিলেন—"**তোমাদের গ্রামহইতে জৈনসার যাবার পথে একটি বহুকালের প্রাচীন প্রকাণ্ড বট অশ্বত্থের গাছ ছিল, সেই গাছটি এখন কি অবস্থায় আছে?**"

আমি বলিলাম—' ঐ গাছের তলা দিয়াই চিরকাল সাধারণের যাতায়াতের পথ ; ওখানে পঁহুছিলেই শরীর যেন শীতল হইয়া যায় ; গাছতলায় একটু না বসিয়া পারা যায় না। গাছটি ছেলেবেলা যে প্রকার বড় ও ঝাপড়া দেখিয়াছি এখন আর সে প্রকার নাই, আপনা আপনিই একটি একটি করিয়া বড় ডালগুলি শুকাইয়া যাইতেছে। শুনিয়াছি নিকটবর্ত্তী কোন কোন লোক ঐ গাছেঁর দু' এক খানা ডালা কাটিতে গিয়া মুখে রক্ত উঠিয়া অকস্মাৎ মারা পড়িয়াছে। গাছে যে কি আছে জানি না।

ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আহা! তোমাদের অঞ্চলের ঐ প্রাচীন বৃক্ষটি ধর্ম্মের নিশান স্বরূপ। ঐ বৃক্ষের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, মনে হয়, প্রাচীন ধর্ম্মভাবও তোমাদের দেশে লয় পাবে।"

আমি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের ওদিকের লোকের ধর্ম্মভাব এখন কেমন ?"

আমি বলিলাম— কোজাগর পূর্ণিমার দিনে আমাদের দেশে ঘরে ঘরে বড়ই আনন্দ। এই পূর্ণিমাতে মেয়েরা ঢালের মত বড়, লক্ষ্মীর সরা খরিদ করিয়া আনাইয়া, পূজা করেন। খুব বড় লোকহইতে নিতান্ত গরীব পর্য্যন্ত (যাঁহারা এক সন্ধ্যা আধপেটা খেয়ে জীবন ধারণ করেন তাঁহারাও) এই লক্ষ্মী পূজা করিয়া থাকেন এবং প্রতি গৃহস্থের ঘরেই যথাসাধ্য এই লক্ষ্মীপূজার আড়ম্বর হইয়া থাকে। পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীর লোকেরাই প্রত্যেকের বাড়ী উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত রাত্রিতে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এই প্রসাদ ভোজন শেষ করিতে, রাত্রি ভোর হইয়া যায়। সারাদিন মেয়েরা অনেকেই নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকেন। এবার দেখাদেখি আমিও উপবাস করিয়াছিলাম, বড়ই ভাল লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন—"পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ব্রতাদি করে না ?"

আমি বলিলাম—আমাদের দেশে প্রায় সকল পাড়াগাঁয়েই এই কার্ত্তিক মাসে, চার পাঁচ বৎসরের কচি কচি মেয়েগুলি, ভোর বেলা উঠিয়া যমপুকুরের ব্রত করে। বাড়ীতে কোন ঘরের কোণে বা উঠানে, এক ফুট আন্দাজ স্থানে চতুষ্কোণ গর্ত্ত করিয়া পুকুর কাটে ; ঐ পুকুরের পাড়ে ছোট ছোট কলা গাছ, কচু গাছ এবং ধান গাছ পুতিয়া রাখে ; ঐ গর্ত্তের চারিদিকে কাক, চিল, বাজ, কচ্ছপ, কুমীর, যম এবং যমুনা প্রভৃতির ছোট ছোট মৃত্তিকার পুতুল স্থাপন করিয়া জল নাড়িতে নাড়িতে ব্রতমন্ত্র পড়িতে থাকে, এবং ঐ গর্ত্তহইতে

গণ্ডূষে গণ্ডূষে জল লইয়া মেয়েরা তাহাদের ভাবী শ্বশুর শাশুড়ীর পরলোকে জল প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিয়া ঐ সমস্ত পুতুলের মুখে জল ঢালিতে থাকে। ছোট ছোট মেয়েরা এই প্রকার কোন না কোন ব্রত বৎসরের অধিকাংশ সময়ই করিয়া থাকে।

ঠাকুর বলিলেন—**পূজা, ব্রত, উপবাস এ সকল যত করা যায় ততই ভাল। খেলার ছলে এ সকল ব্রত নিয়মাদিতে, শিশুকাল থেকে ছোট ছোট মেয়েদের অভ্যস্ত করান এদেশের প্রথা ছিল। এ সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে যে কত কল্যাণকর, তাহা এখন আর কেহ বুঝে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বোধ হয়, এ সমস্তই লোপ পেয়ে যাবে। মেয়েদের হইতেই দেশে ধর্ম্মরক্ষা হয়। শিশুকাল থেকে এসব করলে বড়ই কল্যাণ হয়।**

গুরুর অপমান, ফল হাতে হাতে।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—**তোমাদের দেশে সাধারণ লোকদের ভিতরে হরি সঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রভুর মহোৎসবাদি পূর্ব্বে প্রায় সকল গ্রামেই হইত, এখনও সেই প্রকার হয় ত?**

ঠাকুরের প্রশ্ন শুনিয়া, আমি আমার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিবার সুযোগ পাইয়া, বলিতে লাগিলাম—"আমাদের পাড়ার সংলগ্ন সুজানগরে, দত্ত পরিবারের এক জন ধনী বৈষ্ণব, কিছুদিন হয়, একটি বৃহৎ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন; তাহাতে গ্রামের সমস্ত লোকেই খুব উৎসাহের সহিত যোগদান করিল। দেনো জমির প্রায় ৫০।৬০ বিঘা লইয়া এই মহোৎসবের স্থান প্রস্তুত হইল; নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রায় শতাধিক উননে রাশি রাশি অন্ন ও নাকরা ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল, এবং সে সমস্ত, অনাবৃত মাঠে চাটাই ও হোগলা বিছাইয়া, তাহার উপর স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। চারিদিকহইতে সহস্র সহস্র লোক, দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল; মৃদঙ্গ, খোল, করতাল লইয়া বৈষ্ণবেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গুরু, পুরোহিত ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূজা, ভোগ, আরতির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহার গুরুদেবের নিকট যাইয়া, কার্য্যারম্ভের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গুরুদেব গরীব ছিলেন, তিনি কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা চাহিলেন। কর্ম্মকর্ত্তা তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আপনাকে যাহা

দিতেছি, তাহাই লইয়া অনুমতি দেন ; না হ'লে যথা ইচ্ছা চলিয়া যান। আপনি অনুমতি না দিলেও আমার এই কার্য্য এখন আর অসম্পন্ন থাকিবে না।' শিষ্যমুখে এই প্রকার অবজ্ঞা-সূচক কথা শুনিয়া, গুরু অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া অমনই উঠিয়া পড়িলেন, এবং যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, 'মহাপ্রভু জাগ্রত দেবতা, আমি তোমার গুরু, আমাকে যখন তুমি এই ভাবে অপমান করলে, তোমার এই কার্য্য কখনও তিনি সুসম্পন্ন হ'তে দিবেন না।' এদিকে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। মহাপ্রভুর আসন সাজান হইতে লাগিল, এমন সময়ে হঠাৎ আকাশে কালমেঘ উঠিয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া, চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে ঝড় উঠিয়া মুসলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। লোক সকল চতুর্দ্দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল ; রাশীকৃত অন্নব্যঞ্জনাদি, সমস্ত উপকরণ সহিত, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই জল প্লাবনে নষ্ট হইয়া গেল। প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে যে বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহা একেবারে পণ্ড হইয়া গেল। এ ঘটনা আমি বাড়ী থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

ঠাকুর বলিলেন—"গুরুর অপমান, এযে গুরুতর অপরাধ ; তাই ফল হাতে হাতে। অপরাধের দণ্ড, অপরাধ বুঝিয়া, কোথাও তিন দিনে, কোথাও তিন মাসে, কোথাও বা তিন বৎসরের ভিতরে হয়। অনেক অপরাধের দণ্ড পর-লোকে ভোগ করতে হয়।"

নিজ পুত্রের জীবন লইয়া শিষ্যপুত্রের জীবনদান।

গুরুর প্রাণে ক্লেশ দিলে যেমন অকস্মাৎ বিপদের উৎপত্তি হয়, গুরুকে প্রসন্ন করিলেও তেমন তাঁহার কৃপায় আপদহইতে আশ্চর্য্য প্রকারে রক্ষা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমাদের পরিবারের একটি যথার্থ ঘটনা, এবার মাঠাকুরাণীর মুখে শুনিয়া আসিয়া, ঠাকুরকে বলিলাম—

আমার বড় মামার উপর্য্যুপরি কয়েকটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা পড়িতে লাগিল। লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, পরে শিশুটি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। বার বার এইরূপ হওয়াতে, আমার মাতুল মহাশয় অতিশয় উদ্বিগ্ন ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। এক বার আমার মামীমাতার প্রসব হওয়ার সময়েই

দৈবক্রমে তাঁহার গুরুদেব ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন তান্ত্রিক, সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন; নরকপাল এবং সুরা প্রভৃতি লইয়া অতি কঠোর সাধন করিতেন। পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর (অন্যান্য বারের মতই) চিঁ চিঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং তাহার সর্ব্ব শরীর নীল বর্ণ হইয়া গেল। আমার মাতুল, এবারও পুত্রটি, মারা যায় দেখিয়া, যার পর নাই মর্ম্মাহত ও হতাশ হইলেন। পরে হঠাৎ তাঁহার গুরুদেবের কথা স্মরণ হওয়ায়, সেই অন্ধকার রাত্রিতে দৌড়িয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণ দু'টি জড়াইয়া ধরিয়া, যাহাতে এবারে তাঁহার বংশ রক্ষা হয়, সেই জন্য, অত্যন্ত কাতর হইয়া পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুরুদেব তখন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ' একটি বিল্বপত্র লইয়া আইস। ' বিল্বপত্র আনা হইলে, তিনি তাহাতে সিন্দূরের দ্বারা এক প্রকার যন্ত্র ও একটি মূর্ত্তি আঁকিলেন, পরে সেই পত্রটি স্পর্শ করিয়া, কিছুক্ষণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমার মাতুলকে বলিলেন যে, " তুমি যদি এক দৌড়ে এই বিল্বপত্রটি লইয়া গিয়া তোমার নবজাত পুত্রটির বক্ষঃস্থলে রাখিতে পার, তাহা হইলে ঐ সন্তান দীর্ঘায়ু হইবে; কিন্তু যদি রাস্তায় কোন স্থানে এই বিল্বপত্র লইয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে তোমার বিষম বিপদ্ ঘটিবে। আর এক কথা, এই পুত্রটির নাম হরচরণ রাখিও। " আমার মাতুল সেই বিল্বপত্রটি লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এক দৌড়ে বাটী আসিলেন এবং উহা সেই শিশুর বক্ষঃস্থলে ধরিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, তৎক্ষণাৎ ছেলেটির সমস্ত উপসর্গ একেবারে শান্ত হইয়া গেল, এবং সে ক্রমে ক্রমে বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। পরদিন আমার মাতুল, তাঁহার গুরুদেবের নিকটে যাইয়া শিশুটির সুস্থতার সংবাদ জানাইলেন এবং কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পুত্রটির নাম " হরচরণ " রাখিতে তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন কেন? তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পুত্রের নাম " হরচরণ " এবং তাহারই আয়ু লইয়া, তিনি ঐ শিশুটির দেহে সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। তিন দিন পরে সংবাদ আসিল যে, সত্য সত্যই তাঁহার পুত্র ঐ সময়ে কলেরা রোগে মারা গিয়াছেন।

ঘটনাটি শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন—" তান্ত্রিকদের ভিতরে খুব ভাল ভাল সিদ্ধ মহাপুরুষ এখনও আছেন। তোমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট আর কি শুনিলে? "

আশ্চর্য্য জন্মবিবরণ।

আমি বলিলাম—"মহাপ্রভুর কৃপাতে, আমার বড় দাদার (হরকান্ত বাবুর), যে ভাবে জন্ম হয়, সেই কথাও তিনি বলিলেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"সে কি রকম, বল না ?"

আমি বলিলাম—গর্ভের একাদশ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অথচ সন্তান প্রসব হইতেছে না দেখিয়া, আত্মীয় স্বজন সকলেই অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে এক দিন প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। তিন দিন বেদনায় মাতাঠাকুরাণী জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। তৃতীয় দিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, কোনও জ্যোতিৰ্ম্ময় মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি মহাপ্রভুর মহোৎসব মানস কর, তবেই অচিরে তোমার সন্তান হইবে, নচেৎ কিছুতেই ইনি ভূমিষ্ঠ হইবেন না।" ঠিক সেই সময়ে বাড়ীর অপর ঘরে, মায়ের পিসী ঠাকুরাণীও ঠিক ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া, 'জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু' বলিতে বলিতে ঘরহইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন ঐ স্বপ্নের বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে গ্রামের অপর প্রান্তের একটি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ (রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য), হাঁপাইতে হাঁপাইতে অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—"এই মাত্র স্বপ্ন দেখিলাম, মহাপ্রভুর মহোৎসব মানস না করিলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে না; তোমরা মহাপ্রভুর মহোৎসব মানস কর।" তিন জনে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়াও, ঠিক একই স্বপ্ন একই সময়ে দেখিলেন, ইহাতে সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন, এবং আত্মীয়গণ অগৌণে ঐরূপ মানস করিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, ইহার অল্পক্ষণ পরেই দাদার জন্ম হইল। কিন্তু দাদা, শৈশবে নানা প্রকার রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী ইহাতে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় এক দিন তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "মানসমত মহোৎসব না করাতে, ছেলে এ সকল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।" আমরা শাক্ত পরিবার হইলেও, এই ঘটনাতে মহাপ্রভুর মহোৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া, দাদার অন্নপ্রাশন কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীবৃন্দাবনে যাবার সময়ে আমরা সকলে কিছুদিন ফয়জাবাদে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম; তাঁর অবস্থা দেখে বড়ই আনন্দ হ'লো। তিনি এ যুগের লোক নন, সত্য যুগের লোক; ওরকমটি প্রায় দেখা যায় না।"

এই বলিয়া, ঠাকুর দাদার জীবনের আশ্চর্য্য কয়েকটি অবস্থার কথা উল্লেখ করিলেন; ঠাকুর যখন ফয়জাবাদে ছিলেন, তখন সেখানে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, সে সকল বলিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত ঘটনা আমার সেই সময়ের ডায়েরীতে পরিষ্কার লেখা রহিয়াছে বলিয়া, এস্থলে আর লিখিলাম না।

অহিংসককে কেহ হিংসা করে না।

মহাভারতপাঠের পর, ঠাকুরকে আজ জিজ্ঞাসা করিলাম—"হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ পাহাড় পর্ব্বতে নিরাপদে কি উপায়ে থাকা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন—"মহাভারতে পুনঃপুনঃ পড়েছ ত! যাদের ভিতরে হিংসা নাই, তাদের কেহই হিংসা করে না; হিংস্র জন্তু সকলও, তাদের গাছ পাথরের মতই মনে করে।"

এই বলিয়া ঠাকুর একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া, এইরূপ বলিতে লাগিলেন —"কিছুদিন পূর্ব্বে এখানকার হাতীখেদার এণ্ডারসন সাহেব, হাতীতে চড়িয়া জয়দেব-পুরের জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, সাহেব বিপদে পড়িলেন। হাতীটি বাঘের গন্ধ পাইয়া সাহেবকে হাওদাহইতে ফেলিয়া দিয়া পলাইল। সাহেব বাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া দুই তিন বার বন্দুক ছুড়িলেন, কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রকাণ্ড বাঘটা সাহেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাহেব প্রাণপণে জঙ্গলের নানাদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। বাঘ, যেন শিকার হাতে পাইয়াছে বুঝিয়াই, খেলা করিতে করিতে, ধীরে ধীরে সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সাহেব কিছুক্ষণ ছুটাছুটির পর, হয়রান অবস্থায় জঙ্গলের ঝোপে একটি উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহারই নিকট গিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী সাহেবকে স্থির হইয়া বসিতে বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন?' সাহেব ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "বাঘ যে আমাকে ধ'রে ফেল্‌বে।" তখন সন্ন্যাসী বাঘটিকে, হাত নাড়িয়া, অগ্রসর হইতে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "বৈঠ্‌ বাচ্ছা, আউর নগিজ মত্‌ আও।" বাঘ একটু বসিয়া থাকিয়া লেজ নাড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল, পরে এক দিকে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাঘের ভয়ে তুমি এত অস্থির হইলে কেন?' সাহেব বলিলেন, আমি এই বাঘটিকে শিকার করিতে দুই তিন বার গুলি ছুড়িয়াছি, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়, অমনই বাঘ আমাকে আক্রমণ করিতে পেছন নেয়।' সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঘকে তুমি গুলি ছুড়িলে কেন? তুমি কি রাম

খাও ?" সাহেব বলিলেন, "না, বাঘ আমরা খাই না, আমোদের জন্য শিকার করি। আপনার ইঙ্গিতে বাঘ স্থির হইল, পরে চলিয়া গেল ; বনের বাঘকে কি উপায়ে আপনি বশ করিলেন, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই, শুধু ভাল বেসে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সকলকেই একমাত্র ভাল বাসার দ্বারা বশ করা যায়। তোমার ভিতরে হিংসা আছে বলিয়াই, অন্যেও তোমাকে হিংসা করে। হিংসাশূন্য হইলে, সাপে বাঘেও কিছুই করে না।" সাহেব শুনিয়া অবাক্ হইলেন। ভিতরে তাঁর কি এক চমক্ লাগিল, তিনি খুব কাতর হইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী সাহেবকে দীক্ষা দিলেন, এবং ঘরে যাইয়া ভজন সাধন করিতে বলিলেন। সাহেব বাসাবাটীতে আসিয়া বাবর্চিকে বিদায় করিলেন। তদবধি ব্রাহ্মণের পাকে নিরামিষ আহার করিতেছেন। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ঢাকার অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি, তাঁহাকে দেখিতে যান। সকলেই তাঁর অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। উপস্থিত তিনি কোথায় আছেন জানি না।

ঠাকুর যে এণ্ডারসন্ সাহেবের কথা বলিলেন, দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ এই সাহেবকে আমি অনেক বার ক্রিকেট্ খেলিতে দেখিয়াছি। শুনিলাম, এখন তিনি চাটগাঁর দিকে বদলি হইয়া গিয়াছেন। খুব সাত্ত্বিক ভাবে বৈষ্ণব আচারে থাকেন। পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে রহিয়াছে।

এই ঘটনা বলার পর, ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—যেখানে হিংসা নাই, সেখানে সাপে বাঘেও হিংসা করে না। খাদ্যখাদক সম্বন্ধে বধ পৃথক। তাকে যথার্থ হিংসা বলে না। কামাখ্যাতে এক দিন অচলানন্দ স্বামী, একটি জলাশয়ের কাছে ব'সে আছেন, ব্রাহ্মণেরা সেখানে পূজা আহ্নিক করছেন ; এমন সময়ে একটি বাঘ জল খেতে এসে উপস্থিত হ'লো। ব্রাহ্মণেরা বাঘের ভয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক ছেড়ে পলায়নে ব্যস্ত হ'লেন। অচলানন্দ স্বামী, সকলকে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে বল্‌লেন—'আপনারাই তো ব'লে থাকেন, কামাখ্যায় হিংসা নাই, তবে এত ভীত হচ্ছেন কেন ? আপনাদের কোনও ভয় নাই। নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিজেদের কার্য্য করুন্।' স্বামিজীর কথা শুনে, ব্রাহ্মণেরা সশঙ্ক হ'য়ে, আপন আপন সন্ধ্যা আহ্নিকাদি কর্‌তে লাগলেন ; বাঘটিও জল খেয়ে চ'লে গেল।"

ঠাকুরের শান্তিপুর যাইতে ব্যস্ততা।

১৮ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার।

প্রায় এক মাস হইল, নানা স্থানের গুরুভ্রাতাদিগের সম্মিলনে, ঠাকুরের সঙ্গে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে পরমানন্দে কাটাইলাম। জানি না, আজ কেন ঠাকুর অকস্মাৎ শান্তিপুরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আজ সকালে চা-সেবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেন—"মাকে দেখ্‌তে কাল ভোরেই আমি শান্তিপুর যাব।"

আমরা অনুমান করিলাম, ঠাকুরমা অতিশয় পীড়িতা, তাই ঠাকুর, বোধ হয়, তাঁহার শেষ সময় বুঝিয়া, বৃদ্ধা মাতাকে দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। ঠাকুরের সঙ্গে কে কে শান্তিপুরে যাইবেন জিজ্ঞাসা করাতে, ঠাকুর বলিলেন—"যার যার ইচ্ছা হয় যেতে পার।"

আমরা আট নয়টি গুরুভাই, ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। শ্রীধর বাতরোগে শয্যাগত, উঠিবার শক্তি নাই; ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে পারিবেন না ভাবিয়া, কান্দিয়া অস্থির হইলেন। শ্রীধর ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর কখনও তাঁহাকে সঙ্গছাড়া করিয়া রাখেন না; এ সময় শ্রীধরকে নিতান্ত অচল দেখিয়া, ঠাকুর খুব স্নেহের সহিত বলিলেন—শ্রীধর, এই তোমার পাথেয় রইল, যখন সমর্থ হবে, তখনই আমার কাছে চ'লে যেতে পার্‌বে।"

শ্রীধর সারারাত্রি কান্দিয়া কাটাইলেন।

শান্তিপুর যাত্রা।

১৯শে কার্ত্তিক, বুধবার।

ট্রেন যাইবার বহুপূর্ব্বেই, শেষ রাত্রিতে ঠাকুর দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। গুরুভ্রাতারা অনেকে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত ঠাকুরকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে চলিলেন। রাণাঘাট পর্য্যন্ত আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর আট নয় খানা টিকিট করা হইল। নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, আমরা গোয়ালন্দ ষ্টীমারে উঠিলাম। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বিদায় হইলেন। ষ্টীমারে উঠিয়া, এক পাশে ঠাকুরের আসন পাতিয়া, আমরা কয়েকজন গুরুভ্রাতা, ঠাকুরকে ঘেরিয়া বসিলাম। অনেক লোক আসিয়া, ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ মামলা মোকদ্দমার ফলাফল, কেহ বা সাংসারিক নানা প্রকার অশান্তি উৎপাতের প্রতি-কারের উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; আবার কেহ কেহ বা খুব কাতর হইয়া পুনঃপুনঃ উৎকট রোগের ঔষধের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ঠাকুর ধীরভাবে সকলকেই বলিতে লাগিলেন—"আমি ওসব কিছুই জানি না, ভগবানের নাম করি মাত্র।"

কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনিয়াও, কেহই পুনঃপুনঃ জেদ করিতে নিবৃত্ত হইল না। ঐরূপ লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া, আমরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িলাম। একটু অবসর পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম, "ইহারা এই ভাবে সমস্তটা দিনই জ্বালাতন করিবে। আপনি বলিলে, আমি সহজে এক কথায়ই ইহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারি। তাই করিব কি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তুমি কি ব'লে এদের নিবৃত্ত করবে ?"

আমি বলিলাম—"ইনি হাজার টাকার কমে কিছুতেই ঔষধ দেন না; মোকদ্দমার ফলাফলের কথাও বলেন না। ইহা বলিলে, টাকার কথা শুনিয়াই সকলের শ্রদ্ধা উড়িয়া যাইবে, আর কখনও কেহ এদিকে ঘেঁসিবে না।"

ঠাকুর বলিলেন—"যদি কেহ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়, তখন কি করবে ? এমন লোকও ত থাক্‌তে পারে।"

আমি আর এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না।

ঠাকুর তখন বলিলেন—"ওরূপ বল্‌তে নাই, যথার্থ কথাই বল্‌তে হবে। যে বিশ্বাস করে করুক, না করে তাতেই বা ক্ষতি কি ? লোকে আশা ক'রে আসে, একটু বিরক্তও করবে না ? এতে অস্থির হ'লে চল্‌বে কেন ?"

আমি লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। আমরা প্রায় সন্ধ্যার সময়ে গোয়ালন্দে নামিয়া, ট্রেনে চাপিলাম, এবং শেষ রাত্রে রাণাঘাটে পৌঁছিয়া, তথায়ই ভোর বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

২০শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

প্রত্যুষে ঘোড়ার গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া, প্রায় সাড়ে আটটার সময়ে শান্তিপুরে পৌঁছিলাম। ঠাকুরের বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঠাকুরমা সেখানে যেন ঠাকুরেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ঠাকুর সাষ্টাঙ্গ হইয়া ঠাকুরমার চরণে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল। ঠাকুরমা বলিলেন, "তুই এখন এলি যে ?"

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর শান্তিপুরস্থ বাটী।

(বর্ত্তমান অবস্থা)

ঠাকুর বলিলেন—“মা, তুমি যে আমাকে ‘বিজয়,’ ‘বিজয়’ ব’লে ডেকে ছিলে, তা আমি শুনেছিলাম।”

ঠাকুরমার শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র কাহারও বিরুদ্ধে ঠাকুরকে একটি কথাও বলিলেন না। ক্রমে আমরা ঠাকুরমার সঙ্গে আলাপে জানিতে পারিলাম যে, উন্মাদের অবস্থায় যাঁহাদের উপরে ঠাকুরমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি, উঁহাকে সামলাইতে না পারিয়া, এমন দারুণ প্রহার করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরমা দুই তিনবার “বিজয়”, “বিজয়” রবে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুরমার ঐ চীৎকার শুনিয়াই, ঠাকুর শান্তিপুরে আসিবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন, ইহা পরিষ্কার জানিতে পারিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। ঠাকুর, বাড়ীতে পৌঁছিয়া, নীচের ঘরেই আসন করিয়া বসিলেন। অবিলম্বেই আমরা উপরের ঘর পরিষ্কার করিয়া, ঠাকুরের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। এত কাল আমি স্বপাকে আহার করিয়াছি, আজ সকলের সঙ্গেই প্রসাদ পাইতে ঠাকুর আমাকে আদেশ করিলেন, উপরে একটি মাত্র ঘর, তাহাতেই আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে রহিলাম।

পাণ্ডব বিজয় যাত্রাভিনয়—সত্যনিষ্ঠার উপদেশ।

২১শে কার্ত্তিক, শুক্রবার।

আহারান্তে, অপরাহ্ণে আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে বাহির হইলাম। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া, ঠাকুর আমাদিগকে শান্তিপুরের বহু দেবালয়ে লইয়া গেলেন। সর্ব্বত্রই সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে, আমরা যাত্রা শুনিবার জন্য কোনও এক গোস্বামীর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। গৃহস্বামী যাত্রাস্থলে ঠাকুরকে বসিতে আহ্বান করাতে, ঠাকুর আমাকেমাত্র সঙ্গে লইয়া, সভায় গিয়া বসিলেন। অপরাপর সকলকে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাত্রা শুনিতে ইঙ্গিত করিলেন। ব্রাহ্মণদের সভায় অপর জাতি একাসনে বসেন না বলিয়াই, ঠাকুর সকলকে লইয়া সভাস্থলে গেলেন না, এ কথা পরে জানাইলেন। যাত্রা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, প্রাণভয়ে দণ্ডী রাজা পাণ্ডবদিগের শরণাগত হইলেন। ভীমসেন দণ্ডী রাজাকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উহা জানিতে পারিয়া, পাণ্ডবদের নিকটে আসিয়া দণ্ডী রাজাকে চাহিলেন। পাণ্ডবেরা বলিলেন, ‘ইনি প্রাণভয়ে আমাদের শরণ লইয়াছেন। আমরাও ইহাকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিয়াছি। সুতরাং কিছুতেই

ইহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তাহা হইলে তোমাদের সঙ্গে আমার বিষম বিরোধ ঘটিল দেখিতেছি।' ভীমসেন বলিলেন, 'হে কৃষ্ণ, আমাদের একমাত্র বল তুমি। তোমার আত্মীয়তার গর্ব্বেই আমরা ইন্দ্রচন্দ্রকেও তৃণতুল্য জ্ঞান করি। কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা করিতে যদ্যপি আমাদের জীবন দিতে হয়, এমন কি, যদি তোমার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিতে হয়, অনায়াসে করিব। ধর্ম্ম কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না।' শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেবগণকে লইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পাণ্ডবেরাও ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণের সহিত মিলিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দেবগণের সহিত কুরুপাণ্ডবগণের মহাযুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধের পরিণাম পাণ্ডবের জয় ও শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়। এই যাত্রা শুনিয়া আসিয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্রীকৃষ্ণ যদি সাক্ষাৎ ভগবান্, তা হ'লে তিনি সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও সামান্য পাণ্ডবদের নিকট পরাস্ত হইলেন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"**এই দেখালেন যে, নিজ কর্ত্তব্যে যদি তেমন দৃঢ়তা থাকে, সত্যে ও ধর্ম্মে যদি একান্ত নিষ্ঠা এবং চেষ্টা থাকে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচাদির সহিত মিলিত হ'য়েও স্বয়ং ভগবান্ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে কিছুই করতে পারেন না। সত্যের সর্ব্বত্রই জয় জান্‌বে। যাহা সত্য, যাহা ধর্ম্ম, তাহাতেই স্থির থাক্‌বে। ভগবান্‌ও যদি নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য দেখায়ে বিচলিত করতে চেষ্টা করেন, কখনই টল্‌বে না। তিনি যদি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে পরাস্ত করতে চেষ্টা করেন, পার্‌বেন না। দেব, দেবী, যক্ষ, রক্ষ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হ'য়েও পরাস্ত হবেন, তাঁর কৃপায় সর্ব্বত্র সত্যের জয় হয়, ইহা নিশ্চয়ই জেনো।**"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুরু যাকে যেটি নিয়ম করিয়া দেন, তাহাই ত তার কর্ত্তব্য? আর তাঁর উপদেশই ত ধর্ম্ম?"

ঠাকুর বলিলেন—"**হাঁ, তা বই আর কি?**"

আমি বলিলাম—"সকল নিয়মই কি আর ষোল আনা সর্ব্বত্র রক্ষা করা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন—"**হাঁ, তা না কর্‌লে হবে কেন? যার যেটি নিয়ম, তা সর্ব্বত্র ষোল আনা রক্ষা ক'রে চল্‌তে হবে, একটু বাদ পড়্‌লে চল্‌বে না; নিয়মের একটি ছাড়লে, সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচটিও ছাড়তে হয়। শত সহস্র বাধা বিঘ্নের**

মধ্যেও নিজের নিয়মে দৃঢ়তা রাখ্‌বে। এ বিষয়ে বজ্রের মত কঠিন হবে। বজ্রের মত কঠোর ও পুষ্পের মত কোমল হ'তে ঋষিরা যে বলেছেন, তাহা এই নিয়ম রক্ষা বিষয়েই। আর এই নিয়মে প্রবেশ বিষয়েই আবার পুষ্পের মত কোমল হ'তে হবে। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত, ধীর ও শান্ত ভাবে, নিজের নিয়ম রক্ষা ক'রে যাবে।"

চিত্তবিকৃতি ও শাসন।

২২শে কার্ত্তিক, শনিবার।

ঠাকুর শান্তিপুরে পঁহুছিলেন, ঠাকুরের আত্মীয় স্বজনগণ, বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিয়া, ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতেছেন। একটি অল্পবয়স্কা ব্রাহ্মণ বিধবা, প্রায় সর্ব্বদাই আমাদের এখানে আসেন। গতকল্যহইতে আমাকে তিনি তাঁর বাড়ীতে লইয়া যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পুনঃপুনঃ অনুরোধ করাতে আমি বলিলাম, "ঠাকুর না বলিলে আমি কোথাও এক পা যাইতে পারি না। আপনি ঠাকুরকে বলুন না?" স্ত্রীলোকটি ঠাকুরকে যাইয়া বলিলেন, "তোমার ব্রহ্মচারী শিষ্যটিকে একবার আমার বাড়ী নিয়ে যেতে চাই।"

ঠাকুর বলিলেন—"ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা হ'লে যাবে।"

ঠাকুরকে ছাড়িয়া পাঁচ মিনিটের জন্যও অন্যত্র যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না। অথচ স্ত্রীলোকটির বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধ দেখিয়া, আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। ঠাকুর আমাকে অনুমতি দিয়াছেন, কোনও প্রকারে মনকে বুঝাইয়া উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। উঁহার বাড়ী পৌঁছিয়া দেখি, অন্য একটি লোকও ঐ বাড়ীতে নাই, মাত্র একটি ছোট ছেলে রহিয়াছে। বিধবাটি, আমাকে বসিতে আসন দিয়া, জল খাবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, আমি নিষেধ করাতে নিবৃত্ত হইলেন। পরে সম্মুখে বসিয়া, নানা কথায় আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। সুন্দরী যুবতীর রূপলাবণ্য ও হাব ভাব দেখিয়া, আমি যেন কেমন হইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি থাকিব কি যাইব, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ ভয়ে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমি বিধবাটিকে বলিলাম, "অনেকক্ষণ হয় আসিয়াছি, শীঘ্র আমাকে ঠাকুরের নিকট পৌঁছাইয়া দিন। আমার অসুখ বোধ হইতেছে, বরং অন্যদিন আসিব।" স্ত্রীলোকটি যেন অত্যন্ত দুঃখিত

হইলেন, কিন্তু কয়েক বার থাকিতে বলিয়া, আর বিশেষ জেদ্ করিলেন না; রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। আমি বাড়ী পঁহুছিয়া ঠাকুরের নিকটে নিজ আসনে যাইয়া বসিলাম।

ঠাকুর আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"**কি ব্রহ্মচারী, বেড়িয়ে এলে, বেশ ভাল লাগ্‌লো ?**"

আমি বলিলাম—"বিষম ভাল লাগ্‌লো। আমি কি আর এমন জানি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা আবার জান না ? না জেনেই কি গিয়েছিলে ?"

আমি খুব লজ্জিত হইয়া বলিলাম—"কি করিব ? উঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। আমার তেমন একটা ইচ্ছা ছিল না!"

ঠাকুর একটু তেজের সহিত বলিলেন—"তবে গেলে কেন ? ধর্ম্মলাভ কর্‌তে ইচ্ছা হ'লে, লোকের অনুরোধ উপরোধ ছাড়্‌তে হবে। কিসে কার মনে কষ্ট হবে, কিসে কার মন রক্ষা হবে, এসব দিকে তাকালে কখনও ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না। ঠিক প্রাণের সরল আকর্ষণের দিকে তাকায়ে সমস্ত কার্য্য কর্‌তে হয়। কারও অনুরোধে কোথাও যাওয়া বা কোনও কার্য্য করা ঠিক নয়। ঐরূপ কর্‌লে উপকার না হ'য়ে বরং অনেক সময়ে বিষম ক্ষতিই হয়। সহজভাবে প্রাণের আকর্ষণমত কার্য্য ক'রে গেলে, কোনও ক্ষতিই হয় না। অবশ্য এমনও ঘট্‌তে পারে যে, একজন লম্পটের উপর আকর্ষণ পড়্‌লো, আবার একজন সাধুর উপরও হ'লো না। সে সব স্থলে বুঝে নেওয়া বড়ই কঠিন; তা হ'লেও সরল ভাবে প্রাণের সহজ টানে কোন কার্য্য কর্‌লে পরিণামে অমঙ্গল ঘটে না। যিনি যত উন্নত হউন না কেন, স্ত্রীলোক হ'তে সকলকেই সর্ব্বদা তফাৎ থাক্‌তে হবে। এমন কি উর্দ্ধরেতাঃ হ'লেও, স্ত্রীলোক হ'তে বিষম অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।"

সৎসঙ্গ বিষয়ে উপদেশ।

ঠাকুরের এই সকল কথা শুনিয়া আমার বড়ই অভিমান হইল। ঠাকুরের উপরই একটু চাপ দিয়া আমি বলিলাম, "নিয়ত সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ করিয়াও এ সকল কুপ্রবৃত্তি আমার কিছুতেই গেল না!"

ঠাকুর বলিলেন—"সদ্‌গুরুর সঙ্গ! সে ত অনেক দূরের কথা, সৎসঙ্গও তোমরা ঠিকমত কর্‌ছ না। সৎসঙ্গ হ'লে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি নষ্ট হ'য়ে যায়।"

আমি বলিলাম—"আবার সৎসঙ্গ কিরূপে করতে হয়? সৎসঙ্গ কাকে বলে?"

ঠাকুর বলিলেন—"সাধুর সঙ্গে দশটা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা বলাই সৎসঙ্গ নয়। সাধুর নিকটে থেকে তাঁর সমস্তগুলি কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার, খুব ধৈর্য্যের সহিত, ধীর ভাবে দেখে যেতে হয়। কখন তিনি কি করেন, কার সঙ্গে কোন্ অবস্থায় তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন, তিনি কি প্রকারে সময় অতিবাহিত করেন, সাধুদের এ সমস্ত কার্য্যে নিয়ত মনোযোগ থাক্‌লে, চিত্ত তাতে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে; ধীরে ধীরে, নিজের দিকে যাহা কিছু ত্রুটি আছে ধরা পড়ে ও তাতে ধিক্কার জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এ সমস্ত বিকৃত ভাবও নষ্ট হ'য়ে যায়।"

বাবলায় অপ্রাকৃত হরিসঙ্কীর্ত্তন।

ঠাকুর এখানে আছেন খবর পাইয়া, কলিকাতাহইতে কয়েকটি গুরুভ্রাতা গতকল্য শান্তিপুরে আসিয়াছেন। প্রত্যূষে আমরা সকলেই গঙ্গাস্নানে গেলাম; গঙ্গা বহুদূরে, চড়াতে পঁহুছিয়াও প্রায় এক মাইল চলিতে হয়।

২৩শে কার্ত্তিক, রবিবার।

ঠাকুর বলিলেন—"বড় রাস্তার উপরে, যে স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব প্রতিষ্ঠিত আছেন, কিছু কাল পূর্ব্বেও গঙ্গা সেই স্থানে ছিলেন।"

আহারান্তে, আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে অদ্বৈতপ্রভুর ভজন স্থান দেখিতে, বাবলাতে চলিলাম। অনেক দূর চলিয়া আমরা একটি খাল পাইলাম।

ঠাকুর বলিলেন—"এই খাল এক সময়ে গঙ্গা ছিল।"

সন্ধ্যার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, আমরা বাবলাতে পঁহুছিলাম। একটি বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী, অদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরে সেবক রহিয়াছেন। বাবাজীর বিনয়, ভক্তি ও সেবা-নিষ্ঠা দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন, গঙ্গাহইতে এখন বহু দূরে। এক সময়ে গঙ্গা এই মন্দিরেরই ধার দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসিলে—

ঠাকুর আমাদিগকে বলিলেন—"স্থানের প্রভাব বড়ই চমৎকার। একটু স্থির হ'য়ে ব'সে নাম কর্‌লেই বুঝতে পার্‌বে।"

আমরা সকলেই স্থিরভাবে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই শুনিতে পাইলাম, বহু দূরহইতে যেন খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা ও মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি

সংযোগে একটি মহাসঙ্কীর্ত্তন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ভাবিলাম, ঠাকুরকে এস্থানে আজ উপস্থিত জানিয়াই, বুঝি আশপাশের লোক সঙ্কীর্ত্তন লইয়া এস্থানে আসিতেছেন। আমরা খুব উৎসাহের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত নাচিয়া উঠিল। দুই এক মিনিট অন্তরেই, সঙ্কীর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে সুস্পষ্ট বোধ হওয়াতে, আমরা কেহ কেহ আসন ছাড়িয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে মন্দিরের বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং অদূরেই সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে বুঝিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অদ্ভুত ভগবানের খেলা, ঠাকুরকে ছাড়িয়া যতই আমরা সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিবার আকাঙ্ক্ষায় চলিতে লাগিলাম, ততই সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া, দুই এক মিনিটের মধ্যে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। আমরা আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সঙ্কীর্ত্তনের মহা কোলাহল শুনিয়া তাহাতে যোগ দিবার আকাঙ্ক্ষায় যেমন আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, জানি না অকস্মাৎ কি প্রকারে সেই সঙ্কীর্ত্তন মুহূর্ত্তমধ্যে কোন্ দিকে চলিয়া গেল।"

ঠাকুর বলিলেন—"**ছেলেবেলা প্রায়ই আমি বাবলায় আস্‌তাম। এই সঙ্কীর্ত্তন শুন্‌তাম; তখন একবার এদিক্, একবার ওদিক্ ছুটাছুটি কর্‌তাম। স্থির হ'য়ে ব'সে নাম কর্‌লেই, ক্রমে ওতে আরও যোগ দিতে পার্‌তে। এই সঙ্কীর্ত্তন সাধারণ কীর্ত্তন নয়। তোমরা খুব ভাগ্যবান্, মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনেছ।**"

আমরা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। সমস্তই, ভগবান্ গুরুদেবের কৃপা। তাঁরই কৃপাতে সেই অপ্রাকৃত মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের আভাষ পাইলাম। কুবুদ্ধি বশতঃ, ঠাকুরের নিকটহইতে দূরে যাইতেই, তাঁর অপরিসীম কৃপার ফল মুহূর্ত্তমধ্যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ধন্য গুরুদেব! তোমার কৃপা ব্যতীত সমস্ত অলৌকিক অবস্থা, অদ্ভুত দৃশ্য ও অপ্রাকৃত আনন্দকেও কিছুই যেন মনে না করি, এই আশীর্ব্বাদ করিও। বাবাজী, ঠাকুরকে অদ্বৈতপ্রভু বলিয়া বহু স্তব স্তুতি করিলেন। বাবাজীর নিষ্কপট শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হিন্দুস্থানী বাবাজী এখানে আসিয়া রহিলেন কিরূপে? কতকালযাবৎ এখানে আছেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"**কতকালযাবৎ আছেন বলিতে পারি না। বহুকাল হ'তেই বাবাজীকে এই অবস্থায় দেখে আস্‌ছি। অল্প বয়সে ইনি অকস্মাৎ এখানে**

এসে পড়েন, অদ্বৈতপ্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ ক'রেই, এস্থানে প'ড়ে আছেন। এরূপ মরার মত প'ড়ে না থাক্‌লে কি আর ধর্ম্মলাভ হয়? ধর্ম্ম কি আর এমনই সহজ জিনিস? অভিমান শূন্য হ'তে হবে। বৃক্ষের যেমন বীজ না পচ্‌লে তা হ'তে অঙ্কুর বাহির হয় না, মানুষেরও, অভিমানটি একেবারে নষ্ট না হ'লে, ধর্ম্মের অঙ্কুর জন্মায় না। অভিমান যত কাল আছে, তত কাল প্রকৃত ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই; এ নিশ্চয় জান্‌বে, জীয়ন্তে মৃত হ'তে হবে।"

হিমালয়ে গুরু অন্বেষণ ও মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার।

২৪শে কার্ত্তিক, সোমবার:

আহারান্তে, ঠাকুরের নিকট বসিয়া, আমরা শান্তিপুরের অনেক কথা ঠাকুরের মুখে শুনিতে লাগিলাম। কথা প্রসঙ্গে, সুবিধা পাইয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্মস্থান, শুনিয়াছি এই শান্তিপুরেই ছিল। শান্তিপুরের আরও কোন প্রাচীন মহাত্মা এখন আছেন কি?"

ঠাকুর বলিলেন—"জীবিত আছেন কি না বলিতে পারি না; তবে হিমালয়ের উপরে একটি মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন, তাঁহারও জন্মস্থান এই শান্তিপুরে।"

ঠাকুর, কখন কি ভাবে তাঁর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, জানিতে আমাদের কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"গুরু নির্দ্দিষ্ট রয়েছেন, সময়ে লাভ হবে, পুনঃপুনঃ এরূপ কথা মহাত্মাদের মুখে শুনে, আমি গুরুর অনুসন্ধানে অস্থির হ'য়ে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগ্‌লাম। সেই সময়ে, আমি হিমালয়ে উঠে, বহু দুর্গম স্থানে, লামা গুরুদের মঠে মঠে, ঘুর্‌তে লাগ্‌লাম। কয়েকটি বৌদ্ধ যোগীর মুখে শুন্‌তে পেলাম, ঝরণার উপরে গভীর অরণ্যের ভিতর একটি গোফার সন্নিকটে, এই পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গে, একটি বাঙ্গালী মহাপুরুষ বহুকাল আছেন। প্রায় অহোরাত্র তিনি সমাধিস্থই থাকেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত শিষ্যেরা নিকটবর্ত্তী গোফা হ'তে বের হ'য়ে এসে তাঁকে চৈতন্য করান। মহাপুরুষের খবর পেয়ে তাঁর দর্শন আকাঙ্ক্ষায়, আমি অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়্‌লাম।

হিমালয়ের উপরে নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে, অজ্ঞাত পথে, মহাপুরুষের উদ্দেশে চল্‌তে লাগ্‌লাম। দুই দিন দুই রাত্রি আমার আহার নিদ্রা একেবারে ছিল না। তৃতীয় দিনে ক্ষুধা পিপাসায় শরীর এত অবসন্ন হ'ল যে, একটি বৃক্ষ-মূলে আমি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়্‌লাম। ভগবানের অদ্ভুত দয়া। একটি উলঙ্গ, দীর্ঘাকৃতি পর্ব্বতবাসী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাকে এসে সুস্থ কর্‌লেন; পরে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "বাচ্ছা, এহি দানা পায় লেও, ভুখ্ পিয়াস্ ছুট্ যায়েগা, পর্ব্বত পর যেত্‌না রোজ রহোগে, দু' এক দানা পায় লিও, ভুখ্ পিয়াস কভি নেহি হোগা।" এই বলিয়া, তিনি আমাকে কতকগুলি সর্‌ষের দানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দিলেন। আমি দুই একটি দানা খেতেই ক্ষুধা পিপাসা ও পথশ্রান্তি একেবারে দূর হ'য়ে গেল। ঐ বীজ অনেক দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, পাহাড়ে আমি যত কাল ছিলাম, ঐ বীজ দুই একটি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে খেতাম। পাহাড়বাসী সন্ন্যাসীকে ঐ মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্‌লেন, "হাঁ, বাঙ্গালী এক বড়া ভারী মহাত্মা পর্ব্বতকা উপরমে রহতে হ্যায়; কভি কভি নীচুমে আয়কে ঝরণামে আস্নান করকে বিজ্‌লিকা মাফিক্ তুরন্ত চলে যাতে। লম্বা লম্বা জটা, পানি ঝর্ ঝর্ গিরতি হ্যায়। এয়্‌সে চলে যাও, মিল যায়েগা।" এই ব'লে তিনি ঐ অরণ্যের ভিতর প্রবেশ কর্‌লেন। আমি ঐ পথ ধ'রে চল্‌তে চল্‌তে মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত হ'লাম। দুটি শিষ্য নিয়ত তাঁর সেবায় রয়েছেন দেখ্‌লাম। মহাপুরুষ অনাবৃত স্থানে প্রস্তরের উপরে একভাবে একাসনে সমাধিস্থ হ'য়ে থাকেন। রাত্রিতে বরফে মহাপুরুষের সর্ব্বাঙ্গ একেবারে ঢেকে যায়। পরদিন সকালে বরফের স্তূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। পরে যেমন বেলা হ'তে থাকে, বরফ গ'লে গ'লে, ক্রমে ক্রমে মহাপুরুষের কলেবরও প্রকাশ পেতে থাকে। শিষ্যেরাও ঐ সময়ে মহাপুরুষের সম্মুখে আগুন জ্বেলে তাপ দিতে আরম্ভ করেন এবং অবসর বুঝে সময় সময় খুব গরম গরম চা মুখে ঢেলে দেন। বেলা প্রায় ১১টার সময়ে মহাপুরুষের বাহ্যজ্ঞান হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হিমালয়ের উপরেও সাধুরা চা খান? চা তাঁরা কোথায় পান?"

ঠাকুর বলিলেন—"হিমালয়ের উপরে যে সকল বৌদ্ধযোগী মহাত্মা আছেন, নিয়তই তাঁদের ধুনিতে চায়ের জল চড়ান থাকে। দশ পনর মিনিট অন্তর অন্তর, তাঁরা একটু একটু চা খেয়ে থাকেন। সেই চা আমাদের চায়ের মত নয়। ঐ চায়ের গাছ খুব বড় হয়। সাধুরা পাতা এনে শুকায়ে রাখেন। পাতাগুলিও খুব বড় বড় হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"চায়ে কি তাঁরা দুধ দেন না?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, খুব উৎকৃষ্ট দুধ দেন। পালানে দুধ ভার হ'লেই, পাহাড়ের গাভীরা এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুধ ছেড়ে যায়। ঐ দুধ বরফময় প্রস্তরে পড়ামাত্রেই জমাট হ'য়ে যায়; সাধুরা ঐ দুধ চিমটা দিয়ে খুঁড়ে নিয়ে আসেন। গরম জলে ফেল্‌লেই উৎকৃষ্ট দুধ হয়। চায়েতে তাঁরা মিষ্টি দেন না। প্রয়োজন হ'লে, তাও অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারেন। ইক্ষুরসের মত মিষ্টরসযুক্ত লতা পাতা পাহাড়ে বিস্তর জন্মায়, সাধুরা সে সকলেরও সন্ধান রাখেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাপুরুষ কি কোন কথাই বলিলেন না?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, খুব বল্‌লেন; নিজের সমস্ত পরিচয় দিলেন। অল্প বয়সে উপনয়নের পরেই, একটি সন্ন্যাসীর সঙ্গ পেয়ে তিনি গৃহ ছেড়ে চ'লে যান। তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে অবশেষে এই বল্‌লেন, "বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা এই দু'টি ঠিক হ'লেই, ক্রমে যোগিজনদুর্লভ 'ব্রহ্মপদ' লাভ হয়। বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা না হ'লে কিছুই হয় না। বীর্য্যধারণ যেমন শরীররক্ষা বিষয়ে এক পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কারণ, সত্যও আত্মরক্ষা বিষয়ে ঠিক তদ্রূপ। অসত্য চিন্তা, অসত্য ব্যবহার যোগসাধন বিষয়ে, বিষম অনিষ্টকর। মিথ্যা কথা বলা যেমন মহা-পাপ, মিথ্যা কল্পনা করাও ঠিক সেইরূপ; যাঁরা যোগপথে চল্‌বেন, যাবতীয় কার্য্যেই তাঁদের সত্যের সঙ্গে যোগ থাকা চাই। নাটক, নভেল প্রভৃতি যাহার মূলই অসত্য বা মিথ্যা, তা শুনা বা পড়া যোগশাস্ত্রে নিষেধ। অসত্য চিন্তা

মহাপাপ জান্‌বে, ওতে মস্তিষ্ক নষ্ট করে। ভগবান্‌ই সত্য; ভগবচ্চিন্তাতে মস্তিষ্কের শক্তি সকল দিকেই এত বৃদ্ধি করে যে, তাহা বলা যায় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাধু মহাত্মাদের সঙ্গলাভ হ'লে, তাঁহারা যে সকল উপদেশ দিবেন, সেইমত কি আমরা চলিতে পারি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ইচ্ছা হ'লে খুব পার। যেখানে সত্য, যেখানে ন্যায়, সেখানেই আমাদের অধিকার আছে। সকল স্থানে, সকলেরই কাছে, আমরা শিক্ষালাভ কর্‌তে পারি, তাতে কোনও নিষেধ নাই; তবে প্রয়োজনও কিছুই নাই। এই সাধন ধ'রে চল্‌তে পার্‌লে, ক্রমে সমস্তই লাভ হবে; কিছুরই অভাব থাক্‌বে না। অন্যের উপদেশমত চল্‌তে গেলে, অনেক সময় ক্ষতিও হ'য়ে থাকে। নিষ্ঠার দিকেও অনিষ্ট হয়। অনেকেই নিজ মতে টেনে নিতে চেষ্টা করেন, এ ত প্রায়ই দেখা যায়।"

জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

২৫—২৯শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার—শনিবার।

এখানে আসিয়া আমার দু'দিন হোম বন্ধ ছিল। এখন নিত্য হোম করিতেছি। আজ হইতে ঠাকুর আমাকে আবার স্বপাক আহার করিতে বলিলেন। নানাপ্রকার অসুবিধাতেও আমি স্বপাক আহারের সমস্ত আয়োজন করিয়া লইলাম। ঠাকুরের সঙ্গে, অপরাহ্ণে আর বেড়াইতে সুবিধা পাইব না ভাবিয়া, বড়ই দুঃখ হইল। ভাবিলাম, "গুরুকুলে বাস করিতেছি, গুরুপরিবারের ব্রাহ্মণকন্যাই রান্না করিতেছেন, ঠাকুরের ভোগ হইতেছে, কোনও প্রকার অনাচারেরই সম্ভাবনা নাই, এখানে আবার স্বপাক! ইহার তাৎপর্য্য কি ? লোকসমাজে যে প্রকার জাতিভেদ প্রচলন রহিয়াছে, আমার প্রতি ব্যবস্থা ত দেখিতেছি তাহা অপেক্ষাও বহুগুণে কঠিন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক অবস্থায়, ঠাকুর সাধারণের অন্তরহইতে জাতিবুদ্ধির মূল উৎপাটন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও ব্যবহারিক জাতিভেদের আঁটাআঁটি, ঠাকুরের কার্য্য কলাপে ততটা দেখিতে পাইতেছি না। তবে আমার উপরই বা এত কঠোর নিয়মের আদেশ কেন ? ঠাকুরের মুখহইতে কোনও প্রকারে একবার জাতিভেদের একটু দোষ প্রকাশ হইলেই, আমার পক্ষে এ সকল কঠোরতার যে ব্যবস্থা, তাহা একেবারে উল্‌টাইয়া লইব; এইরূপ

স্থির করিয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাদের দেশে যে একটা জাতিভেদ প্রথা আছে, তা কি থাকা ভাল ?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"জাতিভেদ প্রথা শুধু আমাদের দেশে কেন, সে ত সর্ব্বত্রই রয়েছে। প্রকৃতিগত জাতিভেদ শুধু মনুষ্যসমাজে নয়, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সকলেরই ভিতরে আছে, দেখ্‌তে পাবে। এই জাতিভেদ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডভরা। কোথাও ইহা কেহ অতিক্রম কর্‌তে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যে জাতিভেদ এ দেশে প্রচলিত রয়েছে, তাহা সমাজগত। কোনও দেশে বা ব্যবসাগত, আবার কোথাও বা মর্য্যাদাগত বা অবস্থাগত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যে ভাবেই হউক না কেন, জাতিভেদ সকল দেশেই, মনুষ্যসমাজে সকল জাতির ভিতরেই আছে। কিন্তু ঋষিরা যে জাতিভেদের উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন, তাহা অন্য প্রকার, তাহা গুণগত। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ ভেদে যে জাতিভেদ, তাই ঋষিরা স্বীকার করেছেন, তাহাই স্বাভাবিক। সে হিসাবে, এখন শূদ্র জাতির ভিতরে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ জাতির ভিতরেও বিস্তর শূদ্র দেখা যায়। সামাজিক জাতি এক প্রকার, আর প্রকৃতিগত জাতি অন্য প্রকার। পরমহংস অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, কেহই এই জাতিবুদ্ধি ত্যাগ কর্‌তে পারে না। উৎকৃস্ট নিকৃষ্ট বুদ্ধি থাক্‌লেই, সেখানে জাতিবুদ্ধি থাক্‌বে। হিংসা, লজ্জা, মান, অপমান, ভাল, মন্দ বুদ্ধি যত কাল আছে, মানুষ তত কাল কোন প্রকারেই জাতিভেদ অতিক্রম কর্‌তে পারে না। যার তার হাতে খেলেই, জাতিবুদ্ধি যায় না ; বরং তাতে আরও বিষম অনিষ্টই হ'য়ে থাকে। যার পাক করা অন্ন আহার করা হয়, তার শারীরিক ও মানসিক সমস্ত ভাব, আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে ভোজনকারীর ভিতরে সংক্রামিত হ'য়ে থাকে। সাধারণ চক্ষে মানুষ তা দেখ্‌তে পায় না বটে, কিন্তু এ অতি সত্য ; এ সকল এক বিষম সমস্যা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ অবস্থা লাভ কর্‌লে, যার তার হাতে খাওয়ায় কোন অনিষ্ট হয় না ?"

ঠাকুর বলিলেন—"যে অবস্থা লাভ কর্‌লে, মানুষ সমস্ত বস্তুতে একেরই

অস্তিত্ব দর্শন করে। যিনি নিত্যশুদ্ধ, মঙ্গলময়, পতিতপাবন, যাঁর নামেতে মহা-পাপী উদ্ধার হ'য়ে যায়, তিনি যেখানে অবস্থান করছেন প্রত্যক্ষ হয়, তা কি *কখনও আর অপবিত্র মনে করা যায়? বিষ্ঠাতে চন্দনেতে যিনি নিজের সেই* ইষ্টদেবতারই অধিষ্ঠান প্রকাশিত দেখ্‌তে পান, তিনি কি তা পরম পবিত্র তীর্থ মনে না ক'রে থাক্‌তে পারেন? বস্তুবিশেষে তাঁর আর ভেদবুদ্ধি হবে কি ক'রে? এ প্রকার পরমহংস অবস্থা লাভ হ'লে, সর্ব্বত্র সকল কার্য্যেই তিনি ভগবল্লীলা দর্শন করেন, সর্ব্বত্রই তিনি অমৃত ভোজন করেন; তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তা না হ'লে, যত কাল ভেদবুদ্ধি আছে, তত কাল মুচি, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ একাকার ক'রে, যার তার হাতে খেলেই জাতিভেদ যায় না। ভিতর হ'তে জাতিবুদ্ধি যাওয়া সহজ কথা নয়, বড়ই কঠিন।"

প্রসাদসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ও শ্যামাক্ষেপার কথা।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাধারণের পক্কান্ন ভোজনে যে অনিষ্ট ঘট্‌বার সম্ভাবনা বল্‌লেন, ঠাকুরের প্রসাদ ভোজনেও কি সেইরূপ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে?"

ঠাকুর বলিলেন—"প্রসাদ ভোজন ত মহাভাগ্যের কথা, তাতে পরম কল্যাণই হ'য়ে থাকে। কিন্তু রান্না ক'রে ঠাকুরের নিকটে ধ'রে দিলেই, যে ঠাকুর তা গ্রহণ কর্‌বেন, আর প্রসাদ হবে, তা ত নিশ্চয় বলা যায় না। বহুকাল পূর্ব্বে বাল্যাবস্থায় এই শান্তিপুরে একটি মহাত্মাকে দেখেছি, সকলে তাঁকে শ্যামাক্ষেপা ব'লে ডাক্‌ত। শ্যামাক্ষেপা কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন, তা তাঁর চাল চলন, আচার ব্যবহারে বা কথা বার্ত্তায় বুঝ্‌বার যো ছিল না। একস্থানে তিনি কখনও থাক্‌তেন না। প্রায় নিয়তই রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, পাগলের মত ঘুরে বেড়াতেন। আহারের জন্য, ঠাকুরের ভোগ সর্‌বার সময় বুঝে, অকস্মাৎ শ্যামা-ক্ষেপা কোনও বাড়ী যেয়ে উপস্থিত হতেন। অনেক সময়ে মেয়েদের অসাব-ধানতা বশতঃ, ভোগরান্না সময়ে কোনও প্রকার অনাচার হ'য়ে পড়্‌লে, প্রসাদ না পেয়েই শ্যামাক্ষেপা উঠে পড়্‌তেন এবং গালাগালি দিয়ে ব'লে যেতেন, 'আরে, ভোগে এই গন্ধ পাচ্ছি; রান্নার সময়ে রান্ধুনী এই ক'রেছিল, এই হ'

আজ ইহা প্রসাদ হয় নাই; ঠাকুর যে ইহা সেবা করেন নাই, অনাহারে রয়েছেন; শীঘ্র গিয়ে আবার রান্না ক'রে দে।' আশ্চর্য্য এই যে, তিনি যেমন যেমনটি ব'লে যেতেন, অনুসন্ধানে জানা যেত, তা যথার্থ; মেয়েরা লজ্জায় ম'রে যেত। শ্যামাক্ষেপা কখন কার বাড়ী যেয়ে প্রসাদ পেতে উপস্থিত হন, এই ভয়ে মেয়েরা সশঙ্ক থাক্‌তেন এবং অত্যন্ত সাবধান হ'য়ে ব্যবস্থামত ভোগ রান্না করতেন। আমাদের বাড়ীতেও একবার এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া ব্যতীত, লোকালয়ে যাবার তাঁর আর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

শান্তিপুর নিবাসী কোন একটি গোস্বামী, একবার পুরীধাম হ'তে লিখে জানালেন, 'শ্যামাক্ষেপা শ্রীক্ষেত্রে কিছুদিনযাবৎ এসেছেন। প্রায়ই তাঁকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে দেখ্‌তে পাই।' অথচ দেখা গিয়েছিল, শ্যামাক্ষেপা সেই সময়ে শান্তিপুরেই ছিলেন। শ্যামাক্ষেপা আমাকে দেখ্‌তে পেলে, ছুটে এসে ধ'রে ফেল্‌তেন, কয়েক সেকেণ্ড ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকায়ে থেকে বল্‌তেন, "কাল কুচকুচে, লাল টুক্‌টুকে, সাদা ধপ্‌ধপে; আর এই হল্‌দে কিরে ভাই, আর এই হল্‌দে কিরে ভাই, পুনঃপুনঃ এইরূপ ব'লে এক দিকে ছুটে অদৃশ্য হতেন। কিছুকাল পরে শ্যামাক্ষেপা কখন কোথায় যে চ'লে গেলেন, তাঁর আর খোঁজ খবর পাওয়া গেল না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সন্ন্যাস গ্রহণ না ক'রে, ঘরে থেকে কি কেহ এ প্রকার পরমহংস অবস্থা লাভ করতে পারেন না?"

ঠাকুর বলিলেন "হাঁ, খুব পারেন। ভিতরে সমস্ত বাসনা কামনা থাক্‌তে, সাময়িক উৎসাহে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে, কঠোর বৈরাগ্যের পথে চলা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়। দুর্গের ভিতরে থেকে যেমন নিরাপদে যুদ্ধ করা যায়, সংসারে থেকেও সেই প্রকার বৈধ উপায়ে কর্ম্মক্ষয় করা সহজ। কর্ম্মক্ষয় না হ'লে ত কিছুই হবার যো নাই। সন্ন্যাস একটা কথার কথা নয় বা মত নয়, মানুষের ভিতরেরই একটা অবস্থা; ভগবানে সম্যক্ প্রকারে আত্মসমর্পণই সন্ন্যাস।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"উৎপাতশূন্য স্থানে থাকিয়া নিরুদ্বেগে ভগবানের উপাসনা করিতে হয় শুনিয়াছি। সংসারে নানাপ্রকার বিষম প্রলোভনের মধ্যে, বাঘ

মহিষের সঙ্গে লড়াই করিয়া, যাঁহারা স্থিরভাবে ভগবদুপাসনা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা কি করিবেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সম্মুখ যুদ্ধ আর কয় জনে কর্‌তে পারেন ? বীরত্বের পরিচয় দেওয়া ত আর ভগবদুপাসনার তাৎপর্য্য নয়। সংসারের প্রলোভন অতিক্রম ক'রে, নিরুপদ্রবে যাঁরা ভজন সাধন কর্‌তে না পারেন, তাঁরা অবশ্যই অন্য উপায় নিবেন। 'সংসারে থেকে ধর্ম্ম করা উচিত,' লোকে বলে বটে ; কিন্তু যাঁরা তা না পারেন, নিজেকে নিতান্ত দুর্ব্বল মনে করেন, তাঁরা যে অবস্থায় যেখানে যেয়ে ধর্ম্মলাভ কর্‌তে পারেন তাই কর্‌বেন। এ ভিন্ন আর উপায় কি ? সকলকেই যে এক পথ ধ'রে চল্‌তে হবে, এরূপও কিছু নয়। প্রকৃতি ভেদে, অবস্থা ভেদে, পথও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অবলম্বন করা আবশ্যক হ'য়ে থাকে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও কি আবার সাধারণ কর্ম্মবন্ধন থাকে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বাড়ী ঘর, টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি, এ সকলকে সংসার বলে না। এ সকল ত্যাগ কর্‌লেই সন্ন্যাসী হয় না। দেহাত্মবুদ্ধিই সংসার। এই দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট না হ'লে সমস্তই বিড়ম্বনা। যত দিন পর্য্যন্ত মানুষের যথার্থ বৈরাগ্য না জন্মে, তত দিনই কর্ম্ম থেকে যায়। বাহিরে একটা সন্ন্যাস গ্রহণ করুন আর নাই করুন, কর্ম্ম কর্‌তেই হবে। ভগবান্‌কে লক্ষ্য রেখে কর্ম্ম ক'রে গেলে, অচিরে সেই কর্ম্ম শেষ হ'য়ে যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জীব যখন পরাধীন, নিজ ইচ্ছায় কিছু করে না, তখন তার আবার বন্ধন কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"জীব সম্পূর্ণরূপে পরাধীন হ'লেও, বাসনা কামনা যা কিছু তার মনে নিয়ত উঠ্‌ছে, তাই তার বন্ধনের হেতু হয়। এই বাসনাই কর্ম্ম, এ ত আর স্বাধীন পরাধীনের অপেক্ষা রাখে না। আত্মার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাসনা কামনা ক্ষয় হয় ; উহা ক্ষয় হবার সময় ইহা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়।"

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দির।

শান্তিপুরের রাস।

৩০শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৫ই নবেম্বর।
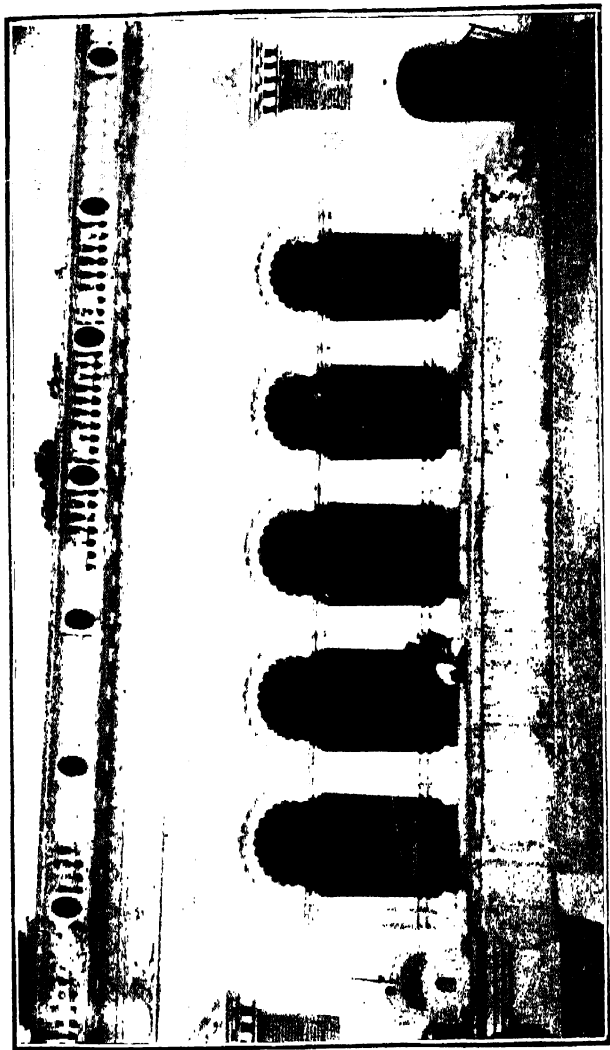
আজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। সকাল বেলা হইতেই সমস্ত শান্তিপুরবাসী, ভগবানের রাসোৎসব স্মরণ করিয়া যেন নাচিয়া উঠিলেন। সকল গোস্বামী প্রভুর বাড়ীতেই, কোথাও শ্যামসুন্দর, কোথাও রাধা-গোবিন্দ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বহুকালযাবৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আজ সকলে আপন আপন বাড়ীর ঠাকুরকে পরিপাটি করিয়া সাজাইতে, পরম উৎসাহ সহকারে নিযুক্ত হইয়াছেন। শান্তিপুরে আজ আনন্দের সীমা নাই।

ঠাকুর বলিলেন—"**ঢাকার জন্মাষ্টমী, শ্রীবৃন্দাবনের দোলযাত্রা, অযোধ্যার ঝুলন, এবং শান্তিপুরের রাসযাত্রা দেখ্‌বার জিনিস। এর তুলনা আর কোথাও নাই। চক্ষে যাঁরা না দেখেছেন, কিছুতেই তাঁদের বুঝান যায় না। এ সকল উৎসবে যাঁরা যোগদান করেন, তাঁদের ভিতরের সমস্ত অশান্তি, উদ্বেগ নষ্ট হ'য়ে গিয়ে চিত্ত প্রফুল্ল হ'য়ে উঠে।**"

সন্ধ্যার সময়ে আমরা সকলে, রাসোৎসব দেখিতে বাহির হইলাম। ঠাকুর, প্রথমে নিজ-বাড়ীর প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, শ্যামসুন্দরের প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগি-লেন। দরদর ধারে চক্ষের জল পড়িয়া, ঠাকুরের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় ১৫।২০ মিনিট কাল একভাবে অবিশ্রান্ত কান্দিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। একটু স্থির হওয়ার পর, শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া, মন্দিরহইতে বাহির হইলেন। বড় রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আমরা রাসযাত্রা দেখিতে লাগিলাম। বিগ্রহ সকলের বহুমূল্য বেশভূষা ও সজ্জার পারিপাট্য দেখিয়া, আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। আহা, যিনি ভগবদ্‌বুদ্ধিতে আপন ঠাকুরকে এ সকল ঐশ্বর্য্যে সাজাইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ধন্য হইয়া গিয়াছেন! আমি এ সকল বিপুল অর্থব্যয়ের আড়ম্বর দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেছি।

ঠাকুরের মুখে শ্যামসুন্দরের কথা।

একটু অধিক রাত্রিতে ঠাকুর নিজবাড়ীর শ্যামসুন্দরের কথা বলিতে লাগিলেন—

"**একবার শ্যামসুন্দর এসে আমাকে বল্‌লেন, 'ওরে, আমি সোণার**

চূড়ো পর্‌বো ; আমাকে একটি চূড়ো গড়িয়ে দে না।' আমি বল্‌লাম, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস টিশ্বাস করি না ; যারা করে, তাদের গিয়ে বল। আমি টাকা কোথায় পাব ?' শ্যামসুন্দর বল্‌লেন, 'দ্যাখ্, তোর খুড়ীমাকে বল্‌গে, তার ঝাঁপির ভিতরে টাকা আছে। তা নিয়ে নে না।' পরে খুড়ীমাকে এ বিষয় বলাতে, খুড়ীমাও বল্‌লেন, 'ওরে, কাল্ শ্যামসুন্দর এসে আমাকে স্বপ্নে বল্‌লেন—'ওগো, আমাকে চূড়ো গড়িয়ে দে না।' আমি বল্‌লাম—'আমি কোথায় টাকা পাব ? আমার ত কিছু নাই!' শ্যামসুন্দর বল্‌লেন—'ওগো, ৪০।৫০ টি টাকা কি তুই আর দিতে পারিস্ না ? দেখ্‌না, না পারিস্ ত বিজয়কে বল্‌গে, সে দেবে।'' খুড়ীমা এই ব'লে খুব কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, আর বল্‌লেন, '৬৭৲ টি টাকা আমি অতি গোপনে রেখেছিলেম, তা কেউ জানে না।' ঐ টাকা খুড়ীমা দিয়েছিলেন, আমি সেই টাকা দিয়ে ঢাকা হ'তে সোণার চূড়ো গড়িয়ে দিই। আজ শ্যামসুন্দর সেই চূড়ো পরেছেন। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে, আমি যখন এই ছাদের উপর গিয়েছিলাম, শ্যামসুন্দর উঁকি মেরে দেখে আমাকে বল্‌লেন, 'ওরে, এক্‌বার দেখে যা না, চূড়ো প'রে আমি কেমন সেজেছি!' আমি বল্‌লাম, 'আমি আর কি দেখ্‌ব, আমি ত আর তোমাকে মানি না।' শ্যামসুন্দর বল্‌লেন, 'তাতে আর কি, নাই বা মান্‌লি, একবার দেখ্‌তেও কি দোষ ?' পরে আমি শ্যামসুন্দরের কাছে যেয়ে, তাঁর স্নেহমাখা স্নিগ্ধ দৃষ্টি, উজ্জ্বল রূপের ছটা দেখে, একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়্‌লাম। শ্যামসুন্দর একটু হেঁসে বল্‌লেন, 'এ কি, তুই না আমাকে বিশ্বাস করিস্ না ?' আমি বল্‌লাম, 'ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া, তবে আর এত কাল এত ঘুরালে কেন ? সমস্ত ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে বিষম কালাপাহাড় করেছিলে কেন ?' শ্যামসুন্দর বল্‌লেন, 'তাতে আর তোর কি ? ভেঙ্গেও ছিলেম আমি, এখন আবার গ'ড়েও নিচ্ছি আমি ; তোর তাতে আর কি হয়েছে ? ভেঙ্গে গড়্‌লে আরও কত সুন্দর হয় জানিস্ ?' "

এই কথার পর, ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"প্রচারক অবস্থায়, সময়ে সময়ে মাঠাকুরাণীকে দেখ্‌তে আমি বাড়ী আস্‌তাম। একবার এই ঘরে মধ্যাহ্নে ব'সে আছি, শ্যামসুন্দর এসে বল্‌লেন—'দ্যাখ্, আজ আমাকে খাবার

দিয়েছে, আর জল দেয় নাই।' আমি অমনই খুড়ীমাকে ডেকে বল্‌লাম, 'খুড়ীমা! তোমাদের শ্যামসুন্দর বল্‌ছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দেও নাই।' খুড়ীমা আমাকে বল্‌লেন, 'হাঁ, শ্যামসুন্দর ত আর লোক পেলেন্ না; তুই ব্রহ্মজ্ঞানী কি না, তাই তোকে গিয়ে বলেছেন, জল দেয় নাই।' আমি বল্‌লাম, 'আচ্ছা, অনুসন্ধান ক'রে দেখ না।' খুড়ীমা অমনই অনুসন্ধানে জান্‌লেন, যথার্থই জল দেওয়া হয় নাই। এইরূপে শ্যামসুন্দর অনেক সময়ে অনেক কথা বল্‌তেন। পূজারী কোন প্রকার অনাচার বা ত্রুটি কর্‌লে, শ্যামসুন্দর এসে ব'লে যেতেন। শিশুকাল থেকে শ্যামসুন্দরের আশ্চর্য্য কৃপা দেখে আস্‌ছি; আমি না মান্‌লেও, তিনি কখনও আমাকে ছাড়েন নাই।"

ভাবের অমর্য্যাদা—নীলকণ্ঠের যাত্রাভিনয় বন্ধ।

ঠাকুর, আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া, দেশপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যাত্রা গান শুনিতে, একটি ভদ্রলোকের বাড়ী পঁহুছিলেন। শান্তিপুরের গণ্য মান্য অনেক গোস্বামী প্রভুও এই গান শুনিতে উপস্থিত হন। যাত্রা আরম্ভ হইলে, ঠাকুর ভাবাবেশে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অশ্রু কম্প পুলকাদি এক সঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়িল। নীলকণ্ঠ উহা দর্শন করিয়া মহা উৎসাহে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাব সংবরণ করিতে না পারিয়া, লাফাইয়া উঠিলেন এবং উচ্চ উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নীলকণ্ঠও মাতিয়া গিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে, ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। তখন গুরুভ্রাতাদের ভিতরেও ভাবের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। এ সময়ে গোস্বামী প্রভুরা সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এরা ভারি গোলমাল কর্‌ছে; শীঘ্র এদের থামায়ে দাও।" ভাববিরোধী দলের প্রতিকূল চেষ্টা দেখিয়া, নীলকণ্ঠ গান বন্ধ করিলেন, এবং বলিলেন, 'যে স্থলে এ সব ভাবের আদর নাই ও ভক্ত মহাপুরুষের মর্য্যাদা নাই, সে স্থলে আমি গান করি না। সে স্থানে থাকাও আমি অপরাধ মনে করি।' এই বলিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরও, আমাদের সকলকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

অগ্রহায়ণ।

সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর কথা।

১লা—৫ই অগ্রহায়ণ, ১৬—২০ নবেম্বর।

আহারান্তে, সকলে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, অবসর পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হিন্দুদের মঠে মন্দিরে সর্ব্বত্রই ত দেবদেবীর মূর্ত্তি—শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ—এ সমস্তই প্রতিষ্ঠিত দেখ্‌তে পাই; গেণ্ডারিয়ার সমাধি-মন্দিরে মাঠাকুরাণীর ফটোর সহিত যে নামব্রহ্মের পট প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছেন, ঐরূপ পটপ্রতিষ্ঠা কোথাও ত দেখি নাই!"

ঠাকুর বলিলেন—"কেন? কালনায় সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে নাম-ব্রহ্মের পট প্রতিষ্ঠিত আছে—বহুকাল পূর্ব্বে আমি তা দেখে এসেছিলাম। আরও দুই একটি স্থানে আছে।"

একটি গুরুভাই বলিলেন—"ভগবান্‌দাস বাবাজী কি প্রকারের সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন? সিদ্ধ শুনিলেই ত ভয় হয়!"

ঠাকুর বলিলেন—"দেশে সাধারণের সংস্কার এরূপই বটে। "সিদ্ধ" শুন্‌লেই লোকে একটা ভয়ানক কিছু মনে করে। ভগবানদাস বাবাজী বৈষ্ণব পরমহংস ছিলেন। ইনি যেন বিনয়ের অবতার ছিলেন। কারও দোষ কখনও দেখ্‌তে পেতেন না। দোষের কথা কেহ তাঁর কাছে বল্‌লে, উনি কেঁদে ফেল্‌তেন, সকলের চেয়ে নিজেকে হীন মনে কর্‌তেন।"

গুরুভাইটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ত ব্রাহ্ম অবস্থায় ওখানে গিয়াছিলেন; বাবাজী কিরূপ ব্যবহার করিলেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"প্রচারক অবস্থায়, আরও দু'টি ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে, সিদ্ধ ভগবান-দাস বাবাজীকে দর্শন করতে কাল্‌নায় গিয়েছিলাম। আমরা পৌঁছিতেই বাবাজী সকলকে সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বস্‌তে আসন দিলেন। পথশ্রান্তিতে আমার খুব পিপাসা পেয়েছিল; বাবাজীকে বলাতে, বাবাজী নিজ কমণ্ডলু ধুয়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল এনে, আমাকে পান করতে দিলেন। কমণ্ডলুটি বাবাজীরই বুঝ্‌তে
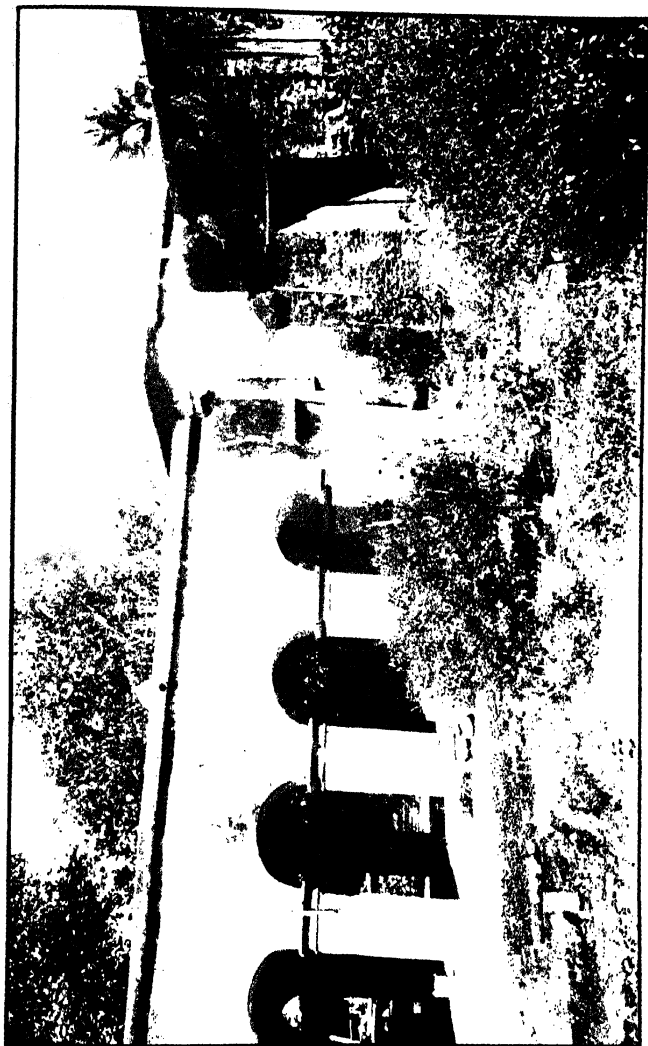
কাল্‌নার সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম।

পেরে, আমি বল্‌লাম—'বাবাজী! আমি যার তার হাতে খাই, জাত টাত কিছুই মানি না—ব্রহ্মজ্ঞানী; আমাকে অন্য একটা পাত্রে জল দিন।' বাবাজী খুব কাতরভাবে করজোড়ে বল্‌লেন, 'প্রভো! আমার আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবেন না। জাত কুল থাক্‌তে কি কখনও ভক্তি লাভ হয়? ব্রহ্মজ্ঞানই ত সমস্ত ধর্ম্মের মূল। আপনি দয়া ক'রে এই পাত্রেই জল পান করুন।' আমি জল পান ক'রে কমণ্ডলুটি রাখ্‌তেই, বাবাজী সেটি নিয়ে কপালে ছুঁইয়ে, সমস্তটা জল পান করলেন। কয়েকটি ভদ্রলোক ঐস্থানে ব'সে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক জন বল্‌লেন, 'বাবাজী! এ কি করলেন? ইনি যে পৈতা ফেলে দিয়েছেন, আর ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিছুই মানেন না।'

বাবাজী বল্‌লেন, 'আমার অদ্বৈতেরও ত পৈতা ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিন্তু দেখ, সেখানেও আমার গোঁসাই আচার্য্য।' ভদ্রলোকটি একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন, 'তা ঠিকই বলেছেন বাবাজী! আচার্য্য! আচার্য্য কেমন দেখ্‌তে ত পাচ্ছেন! কেমন জামা, জুতো, ধুতি, চাদর! বাঃ!' শুনিয়া বাবাজীর চ'ক্ষে জল এল, তিনি বল্‌লেন, 'আহা! প্রভুকে পরিপাটি ক'রে সাজান, এ ত আমাদেরই কর্ত্তব্য। এমনই দুর্ভাগ্য যে তা পার্‌লাম না! প্রভু নিজের প্রয়োজনমত জিনিস নিজেই সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছেন, তা দেখে যে একটু আনন্দ করব, হায় হায় সে অদৃষ্টও ঘট্‌ল না!' এই ব'লে বাবাজী বালকের মত হু হু শব্দে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়্‌লেন।

বাবাজীর ওখানেই নামব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত দেখি; তিনি খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাহার নিত্য সেবা পূজা কর্‌তেন।"

বৈরাগ্য ও ত্রিতাপ সম্বন্ধে উপদেশ।

আজ একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভাবে চলিলে প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হয়? আর বৈরাগ্য লাভ হইলে, কিসে তাহা জানা যাইবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"বিষয়ের আসক্তি নষ্ট না হ'লে, ত্রিতাপ না গেলে, যথার্থ

বৈরাগ্য লাভ হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ শোক, মান অপমানাদিতে যত কাল কর্ত্তব্য কার্য্য কর্‌তে বাধা জন্মাবে, তত কালই ত্রিতাপ নষ্ট হয় নাই—জান্‌বে। তত দিন পর্য্যন্ত খুব নিয়মে থাক্‌তে হয়। দিবসটিকে নানা কার্য্যে বিভাগ ক'রে, খুব নিষ্ঠার সহিত তাতে নিযুক্ত থাক্‌তে হয়। কিছুতেই ঐ সব নিয়মের অন্যথা-চরণ কর্‌তে নাই। এই প্রকারে চল্‌লেই, ক্রমে ত্রিতাপ নষ্ট হ'য়ে যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ত্রিতাপ কি? কষ্টই ত তাপ?"

ঠাকুর বলিলেন—"শুধু কষ্ট কেন? বিষয়ের অনুভূতি সমস্তই তাপ। দুঃখ যেমন তাপ, সুখও তেমনই তাপ। নিরানন্দ যেমন তাপ, আনন্দও তেমনই তাপ। সুখে দুঃখে, আনন্দে নিরানন্দে, মানে অপমানে চিত্তকে যত কাল স্পর্শ কর্‌বে, তত কাল যথার্থ ধর্ম্মের অঙ্কুরই জন্মায় নাই—জান্‌বে।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিষয়জ্ঞান ও তাপবোধ না থাকিলে, লোকে কোনও কার্য্য করে কিরূপে?"

ঠাকুর বলিলেন—"কর্ত্তৃত্বাভিমান যত কাল আছে, তাপও তত কাল আছে। কর্ত্তৃত্বাভিমান না গেলে, মানুষ মুক্ত হয় না। মুক্ত হ'লেও মানুষের কর্ম্ম দেখা যায় বটে, কিন্তু তা বালকের ক্রীড়াবৎ, উন্মাদের নৃত্যবৎ। একটা যন্ত্রের মত দেহদ্বারা তাদের কার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে মাত্র।"

ছেলেবেলায় উৎপীড়ন দর্শনে ঠাকুরের মূর্চ্ছা।

আজ দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী, অত্যাচারী, শান্তিপুরের একটি জমিদারের প্রকাণ্ড ভবনের জনমানবশূন্য শ্মশানতুল্য পরিণাম দেখিয়া, ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এক সময়ে এই বাড়ীর কতই জাঁক জমক ছিল! জমিদার * * * বাবুর ভয়ে, এ বাড়ীর ধার দিয়ে কেউ চল্‌তে সাহস পেত না। শান্তিপুরবাসীরা এঁর অত্যাচারের আশঙ্কায় সর্ব্বদা শঙ্কিত থাক্‌তেন। আজ তিনিই বা কোথায়, আর তাঁর সাধের বাড়ীই বা কোথায়? দেখ্‌তে দেখ্‌তে কিছু কালের মধ্যে একেবারে সমস্ত ছারখার হ'য়ে গেল। কিছুই আর চিরদিন এক অবস্থায়

থাকে না, সঙ্গেও কিছুই যায় না ; তবু একে অন্যকে পীড়ন ক'রে সুখী হ'তে চায়, বড় লোক হ'তে চায় ! পরিণাম যে কি, তা একবার কেউ ভাবে না। ”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“এই জমিদার কি প্রকার অত্যাচারী ছিলেন ? অত্যাচার ক'রে তাঁর কি দুর্দ্দশা ঘটেছিল ? ”

ঠাকুর বলিলেন—“ এঁর এক দিনের অত্যাচার আমি চক্ষে দেখেছি। মনে হ'লে এখনও শরীর শিউরে উঠে। তখন আমার বয়স ছয় সাত বৎসর ; সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে করতে, একদিন এই বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হ'য়ে শুন্‌লাম, জমিদার বাবু টাকার জন্য একটি গরীব লোকের উপর ভয়ঙ্কর পীড়ন করছেন। আমি খেলা ফেলে ছুটে গিয়ে এই বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে দেখি, একটি লোকের উপরে বাঁশডলা দিচ্ছে, লোকটি যন্ত্রণায় হাত পা আছড়াচ্ছে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে, আর সময়ে সময়ে তার দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। দেখেই, আমি উন্মত্তের মত হ'য়ে, একেবারে জমিদারের সম্মুখে লাফায়ে প'ড়ে, খুব চীৎকার ক'রে তাঁকে বল্‌তে লাগ্‌লাম ‘ তুমি ডাকাত ! ডাকাত !! লোকটি যে ক্লেশে ম'রে গেল ; তোমার লাগ্‌ছে না ? ভাল চাও, এখনই একে ছেড়ে দাও, এখনই একে ছেড়ে দাও। ’ এই কয়টি কথা ব'লেই, আমি মূৰ্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলাম। জমিদার বাবু কিন্তু তখনই লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। ছেলেরা গিয়ে বাড়ীতে আমার মূর্চ্ছার খবর দিল। কিছুক্ষণ পরে, আমার জ্ঞান হ'লে, জমিদার বাবু আমাকে বল্‌লেন, ‘ওহে, তোমার কথাতেই ঐ বেটাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। ভাল, তোমার ত খুব সাহস দেখ্‌ছি ! আমাকে তুমি ধমক্ দিলে ! একটুকুও ভয় হ'লো না ?’ আমি বল্‌লাম, ‘ ভয় কেন করব ? আমি ত ঠিকই বলেছি ! জান না আমি গোঁসাইদের ছেলে ? ’

এর কিছুকাল পরেই জমিদার বাবু, একটি অসহায়া ব্রাহ্মণ বিধবার বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে, তাঁর যথাসর্ব্বস্ব লুট্ করলেন। বিধবাটি রান্না চড়ায়েছিলেন ; ভাতের হাঁড়িটি লাথি মেরে ফেলে দিলেন, পরে তাঁর উপর যথেচ্ছ অত্যাচার কর্‌লেন। বিধবাটি আর কি করবেন ? এই মাত্র বল্‌লেন—‘ আমি নিতান্ত অসহায়া বিধবা,

হায়, হায়, আমার উপর তুমি এ ব্যবহার কর্‌লে! আচ্ছা, আমি আর কাকে বল্‌ব ? আমার আর কে আছে ? ভগবান্‌কেই বল্‌ছি, তিনিই এর বিচার কর্‌বেন। *যেমন যেমনটি আমাকে তুমি কর্‌লে, ঠিক তেমন তেমনটি তোমার* স্ত্রীরও ঘট্‌বে।' আশ্চর্য্য এই যে, এ ঘটনার কিছুদিন পরেই জমিদার বাবু, একটি শক্ত মামলায় প'ড়ে, একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হ'লেন; কঠিন পরিশ্রমের সহিত জমিদার বাবুর জেল হ'লো; জেলে তিনি ভুগ্‌তে ভুগ্‌তে মারা গেলেন। একদিন তাঁর বিধবা স্ত্রী, হবিষ্যান্ন কর্‌তে রান্না চাপিয়েছিলেন, শত্রুপক্ষের লোকেরা সেই সময়ে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে সমস্ত লুট্‌ কর্‌লো। আধসিদ্ধ ভাতের সঙ্গে পিতলের হাঁড়িটি একজন লাথি মেরে ফেলে দিয়ে, তাও নিয়ে গেল। নীচ প্রকৃতি ছোটলোকদের নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচার ভুগে, জমিদারের স্ত্রী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী হ'তে বের হ'য়ে পড়্‌লেন। কথায় বলে, 'দুঃখ পেয়ে হাড়িনী শাপে, এড়াতে পারে না বামুণের বাপে।' কথাটা বড়ই সত্য। নিতান্ত অধম অপদার্থ দুরাচার ব্যক্তিও যদি দারুণ ক্লেশ পেয়ে শাপ দেয়, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণও তার হাত এড়াতে পারেন না।"

সমস্তই অসার—ধর্ম্মই সার।

ইহার পর ঠাকুর বলিলেন—"কিছুই ত থাকে না। সমস্তই অসার, একমাত্র ধর্ম্মই সার। সংসারের সুখের জন্য, অর্থের জন্য, কখনই অসত্য পথ অবলম্বন করবে না, ধর্ম্ম ত্যাগ করবে না। এতে সংসার থাকে থাক্‌, যায় যাক্‌। বরং ভিক্ষা ক'রে সারাটি জীবন কাটায়ে দিবে। পতির প্রতি যেমন সতীর, ধর্ম্মের প্রতিও সেই রকম সাধকের সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখে চল্‌তে হয়। স্বয়ং ভগবান্‌ই সকল অবস্থায় ধর্ম্মার্থীকে রক্ষা ক'রে থাকেন।"

নাম ও ধ্যান সম্বন্ধে উপদেশ।

শান্তিপুরে আসিয়া অবধি, এখানে অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইতেছে। আমার বেশ দেখিয়া অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন—"তুমি কোন্‌ ভাবের উপাসক ?"

আমি তাঁহাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারি না। কারণ, আমি কোনও বিশেষ একটা ভাব লইয়া সাধন করি না। নানা প্রকারের ভাবই আমার ভিতরে সময়ে সময়ে আসে, আবার চলিয়া যায়। ঠাকুরকে আজ জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ ভাবের উপাসক, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা কি বলিব?"

ঠাকুর বলিলেন—"যার যে ভাব ভাল লাগে, সে তাই বল্‌বে। বিষ্ণু ভাল লাগ্‌লে বৈষ্ণব বল্‌বে, শিব ভাল লাগ্‌লে শৈব বল্‌বে, এইরূপ।"

আমি বলিলাম—"এক সময়ে একটা ভাব ভাল লাগে, আবার একটু পরেই অন্য আর একটা ভাব শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। একটা কিছু, স্থিরভাবে ধরিয়া থাকিতে পারি না। এরূপ চঞ্চলতা হয় কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"নানা প্রকার অবস্থায় প'ড়ে, সংসর্গেতে ও সন্দেহেতে, পূর্ব্বাভাস এসে উপস্থিত হয়। যত কাল কর্ম্ম আছে, তত কাল কেহই কোন একটাতে স্থির হ'তে পারে না; এরূপ চঞ্চলতা ত্যাগ হওয়া অসম্ভব হয়। নামই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, নামই ধ'রে থাক। এই নামেরই ভিতর দিয়ে ভগবানের অনন্ত রাজ্য, অনন্ত রূপ, অনন্ত ভাব ও অনন্ত লীলা প্রকাশ পাবে। অনন্ত রাজ্যে অনন্ত দিক্ দিয়ে অনন্ত ভাবে চল্‌তে হবে। কোনও একটি বাদ পড়্‌লে, পরে মনে হ'তে পারে, ওদিক দিয়ে ওভাবে চল্‌লে আরও সুবিধা হ'ত। এ প্রকার আক্ষেপ পরে আর না আসে, সে জন্য নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে, নানা ভাবে, নানা দিক্ দিয়ে চলা সাধকের পক্ষে প্রয়োজন। এতে সমস্ত জানাও হয়।"

এসব শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"মন ত নিতান্ত চঞ্চল, তার উপরে বাহিরের উপসর্গও বিস্তর, স্থির হ'য়ে নাম করিব কি উপায়ে? আমাদের কি কিছু ধ্যানের ব্যবস্থা নাই?"

ঠাকুর বলিলেন—"বৈধ ধ্যান ও রাগের ধ্যান, এই দুই প্রকার ধ্যান আছে বটে—তবে আমাদের সে সকলের কোনও প্রয়োজন নাই। মনটিকে কোন একটি চক্রে বসায়ে এবং চক্ষের দৃষ্টি কোন একটি বস্তুতে স্থির রেখে নাম করতে হয়, এরূপ কর্‌লে অনেক উৎপাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। কার্য্যটিও

সকল অবস্থায়ই প্রায় ঠিক চলে। চক্রে মন রেখে নাম কর্‌তে কর্‌তে, একটুকু স্থির হ'লেই দেখা যায়, চক্রের ভিতরে একটি রূপের প্রকাশ হয়; যেমনই প্রকাশ, অমনই টপ্ ক'রে ধরা। কল্পনা ক'রে আমাদের কোনও রূপের ধ্যান নাই। ভগবানের রূপ অনন্ত। কোন্ রূপে তিনি কার কাছে প্রকাশিত হবেন, কে বল্‌তে পারে? আর এক রূপেই যে তিনি সর্ব্বদা দর্শন দিবেন, তারই বা নিশ্চয় কি? শুধু শ্বাস প্রশ্বাস ধ'রে নাম ক'রে যাও, তাতেই সমস্ত ঠিক হ'য়ে আস্‌বে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"নাম করিতে করিতে মন স্থির হইবে, না মন স্থির করিয়া নাম করিতে হইবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা কি আর কেউ পারে? ভগবানের নাম, শ্বাস প্রশ্বাস ধ'রে কর্‌তে কর্‌তে, তাঁরই কৃপায় মন স্থির হ'য়ে আসে। ওরূপ কর্‌লে ক্রমে সবই বুঝ্‌তে পারবে।"

নয় বৎসর বয়সে ঠাকুরের দয়া ও উদারতা।

আজ বিকাল বেলা, ঠাকুরের সঙ্গে বাড়ীহইতে বাহির হইয়া, প্রায় দেড় মাইল দূরে, নির্জ্জন স্থানে, একটি জীর্ণ কুটীরে উপস্থিত হইলাম। একটু সময় সেখানে বসিয়া, ঠাকুর বলিলেন—"বহুকাল পূর্ব্বে এই কুটীরে একটি হীনজাতি ভজনানন্দী বৈষ্ণব বাবাজী ছিলেন। সময়ে সময়ে বাড়ী হ'তে আমি তাঁকে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ এনে দিতাম। অনেক দিন হ'লো, তিনি দেহ রেখেছেন। তার পর হ'তে এই স্থান শূন্য প'ড়ে আছে।"

বাবাজীর সহিত, ঠাকুরের কোথায় কি ভাবে পরিচয় হইয়াছিল জানিতে ইচ্ছা হওয়ায়, ঠাকুরকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"আমার ছেলেবেলা, নয় বৎসর বয়সের সময়, একটি সমারোহের কার্য্যে প্রসাদ পেতে, বাবাজী আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের ভোজনের পূর্ব্বে অপর জাতিদের ত আর দেওয়া হয় না। বাবাজী দরজায় দাঁড়ায়ে দু' তিন বার খাবার চাইলেন, তাঁকে বলা হ'লো, 'একটু অপেক্ষা করুন, ব্রাহ্মণেরা বস্‌লেই আপনাকে খাবার দিচ্ছি।' বাবাজী আর

অপেক্ষা না ক'রে চ'লে যেতে প্রস্তুত হ'লেন। আমি অমনই বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বল্‌লাম, 'একটি বৈষ্ণব প্রসাদ চেয়ে, না পেয়ে চ'লে যাচ্ছেন! ক্ষুধিত হ'য়ে খাবার চাচ্ছেন; খাবার রয়েছে, দিয়ে দিবে—এতে আবার ব্রাহ্মণ শূদ্র কি?' আমাকে সকলে বল্‌লেন, 'বাবাজীকে একটু বস্‌তে বল্‌গে।' আমি এসে দেখি, বাবাজী দ্বারে নাই, রাস্তায় চ'লে যাচ্ছেন। অমনই দৌড়ে গিয়ে বাবাজীকে ধর্‌লাম, অনেক ক'রে বল্‌লাম; কিন্তু বাবাজী আর ফির্‌লেন না। তখন তাঁর ঠিকানাটি জিজ্ঞাসা ক'রে রাখ্‌লাম। একটু পরেই ব্রাহ্মণেরা সেবায় বস্‌লেন, আমিও অমনই একজনের মত প্রসাদ চেয়ে নিয়ে, জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এখানে এসে উপস্থিত হ'লাম। বাবাজীকে প্রসাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'বাবাজী! প্রতিদিন কি ভাবে আপনার সেবা চলে?' বাবাজী বল্‌লেন—'ভিক্ষা করি। তার পর ভগবান্ যে দিন যে রকম দেন, সেরূপই জুটে।'

এর পর, যত কাল বাড়ীতে ছিলাম, ক্ষুধা হ'লেই আমার বাবাজীর কথা মনে হ'ত। চেষ্টা ক'রে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ রেখে বাবাজীকে এখানে এনে দিতাম, না হ'লে আহারে আমার রুচি হ'ত না। শান্তিপুরে কিছু কাল পূর্ব্বেও বৈষ্ণব মহাপুরুষদের অভাব ছিল না। আজকাল আর সেরূপ মহাত্মাদের বড় দেখা যায় না। ক্রমে সমস্তই লোপ হ'য়ে গেল।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি, দিন রাত কেবল উহাই মনে উঠিতেছে। আহা! ছয় সাত বৎসরের বালক অবস্থায়, যিনি একজনের যাতনা দেখিয়া, ছট্ ফট্ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং নয় বৎসর বয়সে যিনি, সংস্থানশূন্য ভিক্ষোপজীবী ক্ষুধিত বাবাজীর কথা মনে করিয়া, বহু কাল প্রতিদিন আহারে তৃপ্তিলাভ করেন নাই, রৌদ্র বৃষ্টিতেও দেড় মাইল চলিয়া গিয়া যিনি খাবার দিয়া আসিতেন, হে ভগবন্, জন্মান্তরে এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলাম যে, সেই দয়ার শরীরের আশ্রয় পাইলাম? ধন্য দয়ার ঠাকুর! তোমার গৌরবে আমরাও ধন্য।

ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলাম—"অন্যের রোগ শোক, ক্ষুধা পিপাসাদির যন্ত্রণা দেখিয়া তেমন লাগে না কেন? মুখে একটা 'আহা' 'উহু' করি মাত্র। কত কালে যথার্থ দয়া প্রাণে জাগিবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা কি বলা যায়? সকলেরই ভিতরে সকল সদ্বৃত্তি আছে, *সময় হ'লেই তা ফুটে উঠে। যেমন বৃক্ষের ফল ফুল সময়ে প্রকাশ হয়। নিয়মে চ'লে, সময়ের প্রতীক্ষা ক'রে, প'ড়ে থাক।"*

প্রশ্ন করিলাম—"সময়ে হবে, ইহা অনেক সময় বলেন। এই সময়ের অর্থ কি কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা শুধু নয়। ঋতুবিশেষে এক এক জাতীয় বৃক্ষের ফল ফলে, কিন্তু সেই ঋতুতে গাছটিরও ফল প্রসবের উপযুক্ত বয়স হওয়া চাই। চারা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত, ছাগল গরু হ'তে তা রক্ষা করা, বেড়া দেওয়া, জল দেওয়া, উত্তাপ লাগার ব্যবস্থা করা—এ সকল যেমন আবশ্যক, সকলেতেই সেই প্রকার। নিয়মে না থাক্‌লে সময়ও উপস্থিত হয় না।"

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর ভবিষ্যদ্‌বাণী।

আহারান্তে, নানা কথার পর, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুনিয়াছি, এক বাবাজী নাকি আপনাকে 'মালা তিলক ধারণ করিতে হইবে' এরূপ কথা বহুকাল পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন? সে কবে? আপনি কি বাবাজীকে ঐ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিয়াছিলেন, না অমনই?"

ঠাকুর বলিলেন—"ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের কিছু কাল পরে, সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন কর্‌তে নবদ্বীপে গিয়েছিলাম। সে সময়ে এ দেশে সকলেই বাবাজীকে মহা সিদ্ধপুরুষ ব'লে ভক্তি শ্রদ্ধা কর্‌তেন। বাবাজীর নিষ্কিঞ্চন ভাব, স্বাভাবিক বিনয় ও ভক্তিভাব দেখে বড়ই আনন্দ হ'লো। বিড়াল কুকুরকেও তিনি ভূমিষ্ঠ হ'য়ে নমস্কার কর্‌তেন। ছেঁড়া কাঁথা, নারকেলের মালা ও একটি মাটির করোয়া ভিন্ন, বাবাজীর আর কিছুই সম্পত্তি ছিল না। আমি বাবাজীর নিকটে কিছু সময় ব'সে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'বাবাজী, ভক্তি কিসে হয়?' বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে, কোনও উত্তর না দিয়ে, একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে থেকে

নবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর আশ্রম।

থর থর ক'রে কাঁপ্তে লাগ্‌লেন। তাঁহার সমস্ত শরীরটি পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হ'তে লাগ্‌ল, মস্তকের শিখাটি খাড়া হ'য়ে উঠ্‌ল। বাবাজী অস্ফুটস্বরে একটি গভীর হুঙ্কার ক'রে বল্‌লেন, 'কি বল্‌লে গোঁসাই ? তুমি বল্‌লে ভক্তি কিসে হয় ! তুমি বল্‌লে ভক্তি কিসে হয় !! য়্যাঁ, তুমি বল্‌লে ভক্তি কিসে হয় !!!' এই বলেই সমাধিস্থ হ'লেন। তিন ঘণ্টা কাল বাবাজীর আর বাহ্য সংজ্ঞা ছিল না। সে সময়ে বাবাজীর শরীরে অশ্রু কম্প পুলকাদি নানা প্রকারের আশ্চর্য্য ভাব দেখে, আমি একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। সমাধিভঙ্গের পর বাবাজী, সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম ক'রে, করজোড়ে বল্‌লেন, 'প্রভু ! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিষ্কিঞ্চন কাঙ্গাল হ'তে পারি। তা না হওয়া পর্য্যন্ত ত ভক্তির নাম গন্ধও নাই। এখন আপনি যে ভাবেই চলুন না কেন, আপনার ললাটে তিলক, কণ্ঠে মালা, পরিষ্কার আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। ভক্তি ত আপনারই ভাণ্ডারের জিনিস, আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি আর ভক্তির অভাব আছে ?' বাবাজীর কথা শুনে চ'লে এলাম। তখন আমি একবার কল্পনাও করি নাই যে, কখনও আমাকে আবার তিলক মালা নিতে হবে। আর একটি ভদ্রলোক বাবাজীকে ঐ প্রশ্ন করায়, বাবাজী ব'লে ছিলেন, 'দু'টি পয়সায় ভক্তি লাভ হয়।' সে ভদ্রলোকটি শুনে বল্‌লেন, 'সে কি বাবাজী, দু' পয়সায় ভক্তি লাভ ! সে আবার কেমন ভক্তি, আপনি আমাকে উপহাস কর্‌লেন ?' বাবাজী বল্‌লেন—'হরে কৃষ্ণ ! উপহাস করি নাই, ঠিকই বলেছি। দু'টি পয়সা দিয়ে একখানা বটতলার ছাপা 'নরোত্তম দাসের প্রার্থনা' এনে কিছুকাল পড়ুন, তা হ'লেই সব বুঝতে পার্‌বেন।"

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দূরদৃষ্টি, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, যাহা সিদ্ধ পুরুষেরা লাভ ক'রে থাকেন, তা কি যোগ ক'রে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"যোগ ক'রেই এ সকল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, না হ'লে হয় না, এমন কিছু নয়। যে কোন প্রকারে চিত্তটি একাগ্র হ'লেই হ'লো; তখন আপনা আপনি এ সমস্ত ঐশ্বর্য্য এসে পড়ে। কিন্তু এসব ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কর্‌লেই সর্ব্বনাশ। গোপনে রাখ্‌লেই এ সব শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এ সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করা সহজ, কিন্তু রক্ষা করাই শক্ত। যোগীদের পক্ষে এসব

ঐশ্বর্য্যের ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। কত শত যোগীর সাধনের সম্পত্তি, এই ঐশ্বর্য্যের তুফানে প'ড়ে, একেবারে ডুবে গেছে। বড়ই সাবধানে থাক্‌তে হয়।"

আমি আবার বলিলাম—"প্রয়োগই যদি না করিলাম, ব্যবহারই যদি না হইল, তবে আর এ সকল শক্তিতে লাভ কি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সমস্ত শক্তি, সমস্ত ঐশ্বর্য্যই ত ভগবানের, তাঁরই কৃপায় এসব মানুষের লাভ হয়। তাঁরই ইঙ্গিত অনুসারে তা প্রয়োগ কর্‌তে হয়। নিজ ইচ্ছায় কিছু কর্‌তে গেলেই গোল।"

খোদার উপর খোদ্দারী।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"শাস্ত্রে যে সকল কার্য্যকে সৎকার্য্য বলিয়াছেন, ধর্ম্মকার্য্য বলিয়াছেন, সে সকল বিষয়েও কি যোগৈশ্বর্য্য প্রয়োগ করিতে নাই ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সৎ অসৎ বুঝা বড় সহজ নয় ত। মুসলমানদের একখানা ধর্ম্মগ্রন্থে এ বিষয়ে বড় সুন্দর একটি গল্প আছে। একটি দয়ালু ফকির, সহরে দুঃখ দরিদ্রতা রোগ শোক ইত্যাদিতে লোকের ক্লেশ দেখে, ভাব্‌লেন— 'আহা! খোদা এদের ত কিছুই কর্‌ছেন না!' তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা কর্‌লেন, 'প্রভো! একটি দিনের জন্যও যদি শক্তি দিয়ে, মাত্র এই সহরে আমাকে তোমার খোদ্দারী দাও, তা হ'লে আমি সকলের সকল প্রকার ক্লেশ দূর ক'রে পরম শান্তি স্থাপন করি।' খোদা 'তাই হউক' ব'লে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর কর্‌লেন। ফকির সাহেব, সহরে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হ'লেন। অমনই তিনি যাবতীয় প্রাণীর দুঃখ কষ্ট, রোগ শোক একেবারে দূর ক'রে, মহা আনন্দের ঢেউ তুলে দিলেন। একটি ভয়ঙ্কর দুর্ব্বৃত্ত ঘোর পাষণ্ড ব্যক্তি ঐ সহরে একটি সুন্দরী যুবতীর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিল। বহু চেষ্টাতেও যুবতীর জীবদ্দশাতে সে কোন প্রকারে উহাকে পায় নাই। অকস্মাৎ স্ত্রীলোকটির

দেহ ত্যাগ হ'লো। তার আত্মীয় স্বজনেরা তাকে কবর দিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই ঐ দুরাচার ব্যক্তি তা জান্‌তে পেরে, নির্জ্জন স্থানে ঐ কবরের কাছে উপস্থিত হ'লো এবং যুবতীর মৃত শরীর কবর হ'তে তুলে নিয়ে তারই উপর নিজ জঘন্য বৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার উদ্যোগ কর্‌তে লাগ্‌ল। ফকির সাহেবের নজরে যেমনই এই ব্যাপার পড়্‌লো, অমনই তিনি তরোয়াল হাতে নিয়ে লাফায়ে উঠ্‌লেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তার কাছে উপস্থিত হ'য়ে 'কাফের' 'কাফের' ব'লে চাৎকার ক'রে, তার গর্দ্দান লক্ষ্য ক'রে তরোয়াল হাঁক্‌লেন। খোদা তৎক্ষণাৎ ঐ তরোয়াল ধ'রে ফেল্‌লেন এবং ফকির সাহেবকে বল্‌লেন, 'এ কি কর্‌ছ? কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য খোদ্দারী পেয়েই এতটা! এর সারা জীবনে প্রতিদিন এই রকম কত দুষ্কার্য্য দেখেও, আমি একে ক্ষমা ক'রে আস্‌ছি; আর দশটির মত, সকল অবস্থায়ই আমি একে প্রতিপালন কর্‌ছি, একটি দিনের জন্যও একে উপবাসী রাখি নাই; আর তুমি, মাত্র একটা দোষ দেখেই একে একেবারে বধ কর্‌তে উদ্যত হ'লে! যাও, আর তোমার খোদ্দারী কর্‌তে হবে না।' ফকির সাহেব বল্‌লেন, 'প্রভো! আমি ত অন্যায় কিছু করি নাই। কোরানেই ত ব্যবস্থা আছে, এরূপ অপরাধীকে বধ কর্‌তে হয়।' খোদা বল্‌লেন, 'কোরানের ব্যবস্থা কি তোমার জন্য, না আমার জন্য?' ফকির বল্‌লেন—'মানুষেরই জন্য, আমার জন্য।' খোদা বল্‌লেন, 'তবে? আজ ত তুমি আর তুমি নও, আজ যে তুমি খোদা হয়েছিলে। খোদার জন্য ত আর কোরানের ব্যবস্থা নয়!' ফকির সাহেব তখন, ভগবানের কার্য্য ও অসীম দয়া দেখে এবং নিজের বিচারবুদ্ধি ও অবস্থা বুঝে, একেবারে মুগ্ধ ও লজ্জিত হ'য়ে পড়্‌লেন। সাধারণ লোকের অসাধারণ শক্তি লাভ হ'লে, তার দ্বারা সংসারের বিশেষ অনিষ্টই হয়। এ জন্যই শ্রীরামচন্দ্র শূদ্র তপস্বীকে বধ করেছিলেন।"

ঠাকুর এসব বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। শক্তিলাভ হইলে, সম্পদ অপেক্ষা বিপদই বেশী।

ঠাকুরের শান্তিপুরহইতে কলিকাতা গমন।

৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার।

ঠাকুরের বাল্যলীলাভূমি শান্তিপূর্ণ মধুর শান্তিপুরের বাস, আজ আমাদের ফুরাইল। ঢাকা, বরিশাল, কলিকাতা ও কাকিনা প্রভৃতি স্থানের গুরুভ্রাতারা, ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতার গুরুভ্রাতাদের প্রাণের অতিশয় আগ্রহ জানিয়া, কিছু দিন পূর্ব্বে ঠাকুর তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন, অবিলম্বেই তিনি তথায় পঁহুছিবেন। কলিকাতার গুরুভ্রাতাদের কাহারও অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, সকলেই গরীব। ঠাকুরের সঙ্গে বহু লোক উপস্থিত হইলে, ব্যয়ভার কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইবে ভাবিয়া, তাঁহারা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং অনেক লোক লইয়া ঠাকুর কলিকাতা পঁহুছিলে বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে, ইহাও তাঁহারা ঠাকুরকে পরিষ্কার জ্ঞাত করাইয়াছিলেন। ঠাকুর, তখন তাঁহাদের সেই কথার কোনও উত্তর না দিয়া, একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র।

শান্তিপুরহইতে ঠাকুরের কলিকাতা পঁহুছিবার নির্দ্দিষ্ট দিন অবগত হইয়া, শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্য বাবু, মণি বাবু, বৃন্দাবন বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা যথাসময়ে আহিরীটোলা ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ৩।৪টি মাত্র লোক আসিবে অনুমানে, তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে ঠাকুরের জন্য এক খানা ছোট বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাস্তায় অকস্মাৎ ষ্টীমারের গতি রুদ্ধ হওয়াতে, যথাসময়ে ষ্টীমার কলিকাতা পঁহুছিতে পারিল না। এদিকে গুরুভ্রাতারা বহুক্ষণ ষ্টীমারের প্রত্যাশায় থাকিয়া, অবশেষে রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে সকলেই হতাশপ্রাণে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন।

কলিকাতা পঁহুছিতে আমাদের অনেক রাত্রি হইল। ঠাকুর ষ্টীমারহইতে নামিয়াই, কাহারও প্রত্যাশায় না থাকিয়া, একেবারে ব্রাহ্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। আমরা নগেন্দ্র বাবুর বাসায় পঁহুছিয়া দেখিলাম, তিনি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী “মা আনন্দময়ী” আমাদের আট দশটি লোকের আহারের সুব্যবস্থা রাখিয়া, খুব উৎকণ্ঠার সহিত ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহাতে মনে হইল, পূর্ব্বেই উঁহারা কোনও প্রকারে আমাদের সকলের ঐ দিনে তাঁহাদের বাসায় পঁহুছিবার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন।

পরদিন, ঠাকুরের খবর পাইয়া সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুভ্রাতাদের আনন্দের আর সীমা নাই। উঁহাদিগকে পাইয়া আমরাও খুব প্রফুল্ল হইলাম। কিন্তু এত লোকের সমাবেশ কোথায় হইবে ভাবিয়া, সকলেই একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব মহাশয়, বার দিনের ছুটি লইয়া বৈদ্যনাথ চলিলেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহার খালি বাড়ীতে আমাদের থাকিবার সুবিধা হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার খালি বাড়ীতে, আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। এক দিন মাত্র নগেন্দ্র বাবুর বাসায় থাকিয়া, ৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার আহারান্তে, ঠাকুরের আসন লইয়া ঐ বাড়ীতে আমরা উপস্থিত হইলাম।

মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীটের বাসা।

৮ই—১৫ই অগ্রহায়ণ।

এই বাসায় পঁহুছিয়া, ঠাকুরের থাকিবার ঘরখানা আমরা সর্ব্বাগ্রে পছন্দ করিয়া লইলাম। রাস্তার উপরে, খোলা মেলা দোতলা ঘরের এক কোণে ঠাকুরের আসন পাতিলাম; এই ঘরের ভিতর দিকে, সাম্‌নেই বড় বারেন্দা এবং বারেন্দাসংলগ্ন একধারে দু'খানা বড় বড় কুঠ্‌রী আছে। ঠাকুরের সঙ্গে যে কয়টি গুরুভ্রাতা রহিয়াছেন, স্বচ্ছন্দরূপে তাঁহারা এই বাসায় থাকিতে পারিবেন ভাবিয়া, সকলেরই মনে খুব আনন্দ হইল। কিন্তু এই আনন্দ বেশীক্ষণ আমাদের রহিল না। এখন দেখিতেছি, অপরাহ্ণে দর্শনার্থী হইয়া দলে দলে লোক আসিয়া যখন বাড়ীটিকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে, তখন স্থানাভাবে বড়ই অসুবিধা হয়। সন্ধ্যাকীর্ত্তনের পরে, একটু বেশী রাত্রিতে, বাহিরের লোকের সংঘট্ট কমিয়া যায় বটে, কিন্তু তখন আবার গুরুভ্রাতাদের ভিড়ে অস্থির হইয়া পড়ি। আফিস আদালত ছুটি হইলেই, গুরুভ্রাতারা সকলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অনেকে সারারাত্রি এখানে থাকিয়া, প্রত্যূষে আপন আপন বাসায় চলিয়া যান। ঠাকুরের ঘরটি সমস্ত রাত্রিই লোকে পরিপূর্ণ থাকে। দু' তিন ঘণ্টা কালও কেহ ঘুমান কি না সন্দেহ। রাত্রিতে সামান্য জলযোগ করিয়া, প্রায়

অভুক্ত অবস্থায়, ক্লান্তশরীরে, গুরুভ্রাতারা এখানে অবস্থান করেন। তাঁহারা প্রায় সারারাত্রি এইভাবে জাগরণ করিয়া, প্রতিদিন আফিস আদালতের এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কার্য্য অবাধে সুচারুরূপে কি প্রকারে সম্পন্ন করিতেছেন, ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি।

বৃন্দাবন বাবুর সেবানিষ্ঠা।

ঠাকুরের প্রতি গুরুভ্রাতাদের আন্তরিক টানের এক একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া, অবাক্ হইয়া যাইতেছি। ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করিতে, কোনও দিকের কোনও প্রকার বাধা, গুরুভ্রাতারা তৃণতুল্যও মনে করেন না। কোনও কারণে ঠাকুরের সেবার একটুকু অসুবিধা হইতেছে শুনিলেই, উঁহারা একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন।

আজ আমাদের উনন ধরাইবার ঘুঁটে না থাকায়, সকালে মেয়েরা আসিয়া জানাইলেন, "ঘুঁটে ফুরাইয়া গিয়াছে। ঘুঁটে না আনিলে গোঁসাইয়ের রান্না হবে না।" শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'ঘুঁটে এনে দিচ্ছি' বলিয়া, তখনই বাসাহইতে বাহির হইলেন। ঘুঁটের অনুসন্ধান করিতে করিতে কোথাও না পাইয়া, অবশেষে তিনি অনেক ঘুরিয়া, গোয়াবাগানে একটি ঘুঁটের দোকানে উপস্থিত হইলেন। মুটের দ্বারা ঘুঁটে বাসায় লইয়া যাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইবে ভাবিয়া, তিনি কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া জুতা, মোজা, কোট ও গরম গাত্রবস্ত্র পরিহিত থাকা অবস্থায়ই, ঘুঁটের ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া লইলেন। অমনই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, বড় রাস্তার উপর দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে, বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি একটি নগণ্য লোক নহেন, পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, কায়স্থসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী, এবং কলিকাতার বহু সম্মানিত লোকের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ঠাকুরের প্রতি ইঁহার সুন্দর সখ্যভাব। ইঁহার অসাধারণ সরলতা ও উদারতার কথা, ঠাকুর অনেক সময়ে বলিয়া আনন্দ করেন।

ঠাকুরের মুক্তিফৌজ দর্শন—আমার অভিমান চূর্ণ।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, জেনারেল্ বুথ্ ও মুক্তি-ফৌজ সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। ঠাকুর, পুস্তকখানা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। এ সময়ে মুক্তিফৌজের অধ্যক্ষ জেনারেল্ বুথ্ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিকট অনেক সময় আলোচনা হইতে লাগিল।

নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীর, পরোপকারী, দয়ালু জেনারেল্ বুথের অসাধারণ সেবাব্রত এ সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় লর্ড-পরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলারাও, সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, এই মহাত্মার দৃষ্টান্তানুসারে রোগি-সেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। উঁহারা কাঙ্গালবেশে, ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, রাস্তার নিরাশ্রয়, অন্ধ, খোঁড়া, এমন কি—কুষ্ঠ রোগীদিগকেও—আগ্রহের সহিত উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে লইয়া আসেন এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। রোগীদিগের প্রতি ইঁহাদের দরদ, ভালবাসা এবং রোগীদিগের অত্যাচারেও ইঁহাদের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সেবাপরায়ণতার কথা শুনিয়া, ঠাকুর কান্দিয়া ফেলিলেন এবং উঁহাদিগকে দর্শন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"**পরদুঃখে যাঁদের প্রাণ কাঁদে, তাঁরা তীর্থস্বরূপ; তাঁদের দর্শনেও লোক পবিত্র হয়।**"

এই বলিয়া, ঠাকুর, বেলা প্রায় দুটার সময়ে, সকলকে লইয়া মুক্তিফৌজ দর্শন করিতে চলিলেন। সকলের সঙ্গে আমিও যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ঠাকুর তখন, আমার দিকে চাহিয়া, খুব স্নেহভাবে বলিলেন—"**আমার আসনটি শূন্য ঘরে থাক্‌বে; তুমি এই সময়টুকু এখানে থাক্‌তে পার্‌বে না?**"

একটি গুরুভাই বলিলেন—"কেন? বাসায় ত আরও লোক আছে।"

ঠাকুর আবার বলিলেন—"**শুধু আসনের জন্যও নয়। মুক্তিফৌজের ভিতরে অল্পবয়সী যুবতী মেয়েরা সব আছেন, ব্রহ্মচারীর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?**"

আমি, ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া, যাইতে নিরস্ত হইলাম। নিজ আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'হায়রে কপাল! এই ব্রহ্মচর্য্যে আমার প্রয়োজন কি, যদি সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় ঠাকুরের সঙ্গেই থাকিতে না পারিলাম?'

মনে বড় দুঃখ হইল, ঠাকুরের উপর খুব অভিমানও আসিয়া পড়িল। ভাবিলাম,

"ঠাকুর এই মাত্র বলিলেন, 'উঁহারা তীর্থস্বরূপ, উঁহাদের দেখ্‌লেও পুণ্য হয়।' ভাল, ঠাকুর সকলকে লইয়া তীর্থে গেলেন, সকলে পবিত্র হইবে, আর শুধু আমিই গেলে একেবারে অপবিত্র হইয়া যাইতাম? বিশেষতঃ, ঠাকুর যেখানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন, সেখানেও আমাকে লইয়া যাইতে এত আশঙ্কা! ঠাকুর আমাকে কি এতই অপদার্থ, এতই কামুক মনে করেন? এই প্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে, ঠাকুরের উপর আমার অত্যন্ত অভিমান আসিয়া পড়িল। আমি ঠাকুরকে ভাবিতে ভাবিতে, মুক্তিফৌজই দেখিতে লাগিলাম। এ সময়ে, নিজেরই অজ্ঞাতসারে, কল্পনার স্রোতে পড়িয়া, সুন্দরী মেয়েদের অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য মনে মনে আঁকিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই অদম্য কামের উত্তেজনায় পড়িয়া গিয়া, আসনহইতে উঠিয়া পড়িলাম এবং একবার ঘর একবার বাহির করিয়া, ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। অবশেষে, ঘর্ম্মাক্তকলেবরে একেবারে অবসন্ন হইয়া বারেন্দায় পড়িয়া রহিলাম।

আমার অভিমান চূর্ণ করিতে, দয়া করিয়া, ঠাকুরই আমার প্রকৃত রূপ আমাকে দেখাইলেন—এ সময়ে ইহা আমি বেশ বুঝিলাম।

ঠাকুর, আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছেন, সুতরাং এই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে কিছুতেই ত প্রশ্রয় দিবেন না! এই জন্যই আমাকে স্ত্রীলোকদের ভিতরে নিজের সঙ্গেও নিলেন না। বলিলেন—"ব্রহ্মচারীর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?"

ইহা আর আমি বুঝিলাম কই? আমি এই কথার অন্যপ্রকার অর্থ বুঝিয়াছিলাম; যেন আমার প্রকৃতির দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াই, ঠাকুর ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক, নিজের অবস্থা নিজে না বুঝিয়া, যেমন ঠাকুরের কার্য্যে অভিমান করিয়াছিলাম, তেমনই দয়া করিয়া ঠাকুর, আমার প্রকৃতি আমাকে দেখাইয়া আমার সেই অভিমানটি চূর্ণ করিলেন।

ঠাকুরের অনুপস্থিতি সময়ে, পোষ্টাফিসের ডেপুটি কণ্ট্রোলার, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস মহাশয় আসিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন আসিলে গোঁসাইকে নির্জ্জনে পাইব?" ইঁহার সহিত আলাপে জানিলাম, দু' এক দিনের মধ্যেই ইনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ইঁহাকে আমি দু'টা হ'তে তিনটার মধ্যে আসিতে বলিলাম।

গুরুভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আসিয়া, ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইনি আমার বড় দাদার অত্যন্ত বন্ধু ও সমপাঠী, ইঁহার কথায়,

দাদাকে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আসিতে লিখিলাম; ঠাকুরের অনুমতির অপেক্ষাও করিলাম না।

ঠাকুর বাসায় আসিলে, অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"নিয়মে থাকিয়া সাধন ভজন যতই করিতেছি, ততই ত রিপুর বৃদ্ধি দেখিতেছি। সাধারণ লোক অপেক্ষা, সাধকদের কি রিপুর প্রাবল্য অধিক? কামের উত্তেজনার ত কিছুতেই বিরাম হইতেছে না।"

ঠাকুর বলিলেন—"কাম যে আমাদের শরীরে ও মনে অত্যন্ত অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। সাধারণ লোকদের অপেক্ষা সাধকদের আবার এ সব অনেক প্রবল হ'য়ে থাকে; কারণ, এসমস্ত ত আত্মারই বৃত্তি। জল উত্তাপাদি দ্বারা যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে, সাধন ভজন দ্বারাও সেই প্রকার আত্মার বৃত্তি সকলের পুষ্টি হয়। তবে যত কাল এ সকল বৃত্তি বহির্ম্মুখ থাকে, তত কালই রিপুর মত কার্য্য করে। অন্তর্ম্মুখ হ'লেই সাধক তখন বুঝ্‌তে পারেন, এ সকলের বৃদ্ধির কত প্রয়োজন ছিল; এই বৃদ্ধিতেই তখন আবার কত আনন্দ! সাধন ভজন দ্বারা আত্মার সমস্ত বৃত্তির পুষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এ সকল বৃত্তি বহির্ম্মুখ অবস্থায় যত কাল থাকে, তত কালই রিপুর মত কার্য্য করে, অনিষ্টকর বোধ হয়; কিন্তু ভগবৎকৃপায় একবার মুখটি ফিরে গেলে, তখন ইহারাই আবার পরম উপকারী হ'য়ে থাকে। সাধকদের জীবনের অবস্থা সমস্তই স্বতন্ত্র প্রকারের। সাধারণ লোকের মত এঁদের কিছুই নয়। একমাত্র তাঁর অনুগত হ'লেই নিরাপৎ।"

কলেজের কতিপয় ছাত্রের সঙ্কীর্ত্তন; মুকুন্দ ঘোষের আকর্ষণ।

ঠাকুর, কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া, একদিন শ্রীযুক্ত মুকুন্দ ঘোষ, ঠাকুরকে কীর্ত্তন শুনাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, সেইমত দিনও ধার্য্য হইয়া যায়। ঠাকুর ঐ দিন অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, ভয়ানক জ্বর হইল; এদিকে মুকুন্দ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই দিনেই অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। মুকুন্দ ঘোষ তাহাকে লইয়া শ্মশানে গেলেন। অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময়ে, বঙ্কুলাল বাবু, অমিয় বাবু প্রভৃতি কলেজের ছাত্রগণ, ঠাকুরকে গান শুনাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের অসুখের সংবাদ পাইয়া,

তাঁহারা আর উপরে উঠিলেন না; নীচে থাকিয়াই হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন ক্রমে ক্রমে বেশ জমাট হইয়া পড়িল; ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায়ও আসনে স্থির থাকিতে না পারিয়া, উঠিয়া পড়িলেন এবং লাঠিতে ভর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে যাইয়া, কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া সকলেরই উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। ঠাকুর উচ্চ উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, গুরুভ্রাতারাও মাতিয়া গেলেন। এই কীর্ত্তনে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সকলে ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া রহিলেন। এই সময়ে মুকুন্দ ঘোষও হঠাৎ আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কীর্ত্তনান্তে আমাদের কোনও গুরুভ্রাতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এ সময়ে কিপ্রকারে আসিলেন?" তিনি বলিলেন, "শ্মশানে প্রভুর কথা মনে হইতেই, প্রাণ যেন কেমন হইয়া-গেল, তাই সৎকারের পরই বাড়ীতে না গিয়া, ছুটিয়া আসিয়াছি; আসা আমার সার্থক, আজ আমার পূর্ণ দর্শন হইল। পূর্ব্বে আর একবার প্রভুর এই রূপ দর্শন পাইয়াছিলাম।"

অনুসন্ধানে জানিলাম, গত ১২৯৪ সালে, ঠাকুর যখন শান্তিসুধার বিবাহের কথা স্থির করিতে, কলিকাতা চোরবাগানে আসিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর বাসায় ছিলেন, তখন একদিন নগেন্দ্র বাবুর সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া, তিনি কাঁসারিপাড়ার শ্রীযুক্ত হরজহরের বাড়ী গিয়াছিলেন। ওখানে ঠাকুর ভগবানের নাম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, মুকুন্দ ঘোষ কীর্ত্তন করেন। এই কীর্ত্তনে ঠাকুরের অবস্থা দেখিয়া অনেকে সংজ্ঞাশূন্য হন, মুকুন্দও একে-বারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। সেইহইতে নিয়ত মুকুন্দের প্রাণে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, ঠাকুরকে আর একবার পাইলে কীর্ত্তন শুনাইয়া ঐ রূপ দর্শন করেন।

বৈষ্ণব দর্শন—মহাপ্রভুর কথা।

আজ ঠাকুর, একটি ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, বাহির হইলেন। যোগজীবন, সতীশ এবং আমি, ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম। অনেক রাস্তা হাটিয়া, আমরা একটি বাড়ীতে পঁহুছিলাম। ভদ্রলোকটি, ঠাকুরকে দেখিয়াই অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের সকলকেই তিনি তাঁর কোঠাঘরের দোতালার বারেন্দায়, আগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেন। ঠাকুর, তাঁকে খুব ভক্তি করিয়া নমস্কার করিলেন। ভদ্রলোকটি বৃদ্ধ। মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত; গৌড়িয়া বৈষ্ণব অথবা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের খুব উচ্চ অবস্থার লোক বলিয়া অনুমান হইল। ভগবৎপ্রসঙ্গে নানাপ্রকার সাত্ত্বিক ভাব উভয়েরই শরীরে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর, বৃদ্ধটি, ঠাকুরকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি শ্রীবৃন্দাবনে বহু দিন ছিলেন ; ওখানে তাঁকে কখনও দেখিতে পাইলেন ? শুনিয়াছি, তিনি এখনও সেই শরীরেই আছেন।"

ঠাকুর বলিলেন—হাঁ, ঠিক সেইই আছেন। একদিন দয়া ক'রে হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'লেন ; দর্শন মাত্রেই বুঝ্‌লাম মহাপ্রভু।"

বৃদ্ধটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর, কিছু বলিলেন কি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"দর্শনমাত্রেই পায়ের উপর প'ড়ে খুব কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম, কত কি বল্‌লাম। তিনি মাথায় হাত বুলায়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, 'সমস্তই ত পূর্ণ হ'য়েছে, আর কেন ? স্থির হও, স্থির হও। আমি ত তোমাদেরই ঘরে কেনা।' ঐ সময়ে আমি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়্‌লাম। পরে জ্ঞান হ'লে উঠে দেখি, আর তিনি নাই, চ'লে গেছেন।"

ঘণ্টা দুই পরে, আমরা ঠাকুরের সঙ্গে বাসায় আসিলাম।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৈরিক গ্রহণ।

অপরাহ্ণ প্রায় ৩ টার সময়ে, আমাদের পরম আত্মীয়, বহুকালের পরিচিত, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়, ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর, তাহাকে খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। তিনি বলিলেন, 'নির্জ্জনে আমার কিছু বলিবার আছে।' শুনিয়াই আমি আসনহইতে উঠিয়া বারেন্দায় গেলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গলার আওয়াজ একটু বড়, বারেন্দায় থাকিয়াও তাঁর কয়েকটা কথা শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, "গঙ্গোত্রীহইতে হিমালয়ের উপরে গিয়া কিছু কাল ছিলাম। একদিন ব্যাসদেবের দর্শন পাইলাম। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কয়েকটি উপদেশ দিলেন, এবং আপনার নিকটহইতে গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করিয়া আপনার উপদেশমত চলিতে বলিলেন। আপনি দয়া করিয়া, আমাকে গৈরিক বস্ত্র দিন এবং কি প্রকারে আমাকে চলিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিন।"

ঠাকুর বলিলেন—"সর্ব্বত্রেই মঠ মন্দিরাদিতে ভগবানের বিগ্রহ দর্শন ক'রে, সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম কর্‌লে, উপকার হ'য়ে থাকে। সত্যকে লক্ষ্য রেখে, সরল ভাবে চল্‌লেই সব হয়। গৈরিক ধারণ কর্‌লে, বীর্য্যও ধারণ কর্‌তে হয়, শাস্ত্রের এরূপ ব্যবস্থা আছে ; না হ'লে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।"

এই বলিয়া ঠাকুর, আমাকে ডাকিয়া নিজের একখানা বহির্বাস, বিদ্যারত্ন মহাশয়কে দিতে বলিলেন। তিনিও ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া উহা লইয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের শাসন ও সান্ত্বনা।

আমাদের বাসাটি ছোট হওয়াতে, দিন দিন বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সকালে ও রাত্রিতে লোকের ভিড় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েকটি গুরুভগ্নী নিয়ত এখানে থাকাতে, আর আর স্ত্রীলোকেরাও দলে দলে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন। ঠাকুর নিজেই দয়া করিয়া তাঁর ঘরে আমাকে আসন করিতে দিয়াছেন, তাই অনেকটা আরামে আছি। কিন্তু রান্না, খাওয়া ও হোমাদি কার্য্যের খুবই অসুবিধা প্রত্যহ ভুগিতেছি। উপরের ঘরের সম্মুখের বারেন্দায় আমি নিত্য হোম করি। এ সময়ে প্রায়ই গুরুভ্রাতাভগিনীদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'য়ে থাকে। কাঁচা কাঠের ধোঁয়াতে সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। গুরুভ্রাতারা আমাকে এখানে হোম করা বন্ধ করিতে অনেক বার বলিয়াছেন, কিন্তু আমি কাহারও কথা গ্রাহ্য করি নাই, বরং উল্টা তাঁহাদিগকে ধম্‌কাইয়া দিয়াছি। আজ ভিজা কাষ্ঠ অনেক চেষ্টায় জ্বালাইয়া, যেমন তাহাতে কয়েকটি মাত্র আহুতি দিয়াছি, অতিরিক্ত ধোঁয়াতে অস্থির হইয়া, আমাদেরই একজন, তাঁর ছেলেটিকে কোলে লইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—"তুমি কি রকম লোক? সকলকে মেরে ফেল্‌বে নাকি? রেখে দেও তোমার হোম। সকলকে জ্বালাতন কর্‌লে যে।" আমি উঁহার হাতনাড়া, মুখনাড়া ও বিরক্তিভাবের কথা শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিলাম, এবং খুব তেজের সহিত বলিলাম—"বটে? লোকের উপর বড়ই ত দয়া দেখ্‌তে পাচ্ছি। ছেলেটা যখন টেঁ টেঁ ক'রে চীৎকার করে এবং সকলকে জ্বালাতন ক'রে তুলে, তখন ছেলেটার মুখ চেপে ধরতে পার না? তখন ছেলেটাকে কি সরিয়ে দাও? তোমাদের জ্বালা হয় ব'লে, আমার নিত্যকর্ম্ম আমি করব না? বাঃ!" তিনিও আমার কথার উত্তর দিতে না পারিয়া সরিয়া পড়িলেন। সেই মুহূর্ত্তেই ঠাকুর, আসনহইতে খুব বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—**"কে আছ ওখানে? এক্ষণই আগুনে জল ঢেলে দেও। এ কি রকম? একটা সাধারণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি নাই!"**

ঠাকুরের মুখহইতে যেমনই ঐ কথা বাহির হওয়া, অমনই দুই তিনটি গুরুভাই জল আনিতে ছুটিয়া গেলেন। আমি নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া, নিজের মান রাখিতে, নিজেই

তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বে জল ঢালিয়া আগুন নিবাইয়া দিলাম। ঠাকুর আমাকে দশ জনের কাছে, এতটা অপ্রস্তুত করিলেন মনে করিয়া, ছাদের উপর চলিয়া গেলাম। লজ্জায় ও অভিমানে আমার সমস্ত শরীর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুরের উপর খুব রাগিয়া গেলাম। ভাবিলাম, এদিকে আপন আপন নিয়মে অটল থাকিতে, দিনের মধ্যে দশবার উপদেশ দিচ্ছেন, এখন ত এদের কষ্ট দেখে আমার নিয়মটি ভেঙ্গে দিতে একবারও ভাব্লেন না! সিঁড়িঘরে যাইয়া আবার আগুন জ্বালিয়া হোম করিলাম। আর ঠাকুরের ঘরে যাইব না স্থির করিয়া, নিতান্ত অপ্রশস্ত চারফুট মাত্র স্থানে কুকুরকুণ্ডলী হইয়া পড়িয়া রহিলাম। সমস্তটি দিন মানসিক ক্লেশে ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইলাম।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে, ঠাকুর অকস্মাৎ ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে ওখানে ঐ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন—"কি, তুমি এখানে হোম কর্‌বার ঠিক ক'রে নিয়েছ? সে বেশ হয়েছে। সকলকে ক্লেশ দিয়ে কি ওভাবে কিছু কর্‌তে আছে? উপাসনা করতে গিয়ে কারও ক্লেশ জন্মালে উপাসনা হয় না। বিশেষতঃ বৃদ্ধ, বালক, রোগী ও গর্ভবতী, এদের সুবিধা সকল অবস্থায়ই সকলের আগে দেখ্‌তে হয়। না হ'লে অপরাধ হ'য়ে পড়ে। যাও, এখন গিয়ে রান্না কর।"

ঠাকুর, এমন স্নেহভাবে এই কথাকয়টি বলিলেন যে, আমার ভিতর একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ঠাকুর, কখনও কারও ক্লেশ দেখিয়া সহ্য করিতে পারেন না; এ আবার শিশুর ক্লেশ ও রোগীর ক্লেশ! তার পর আমার মানসিক ক্লেশেই বা উদাসীন রহিলেন কই? কখনও ছাদে আসেন না, আজ আমার যাতনার বিষয় কিছু না বলাতেও, নিজে উহা অনুভব করিয়া, আমাকে ঠাণ্ডা করিতে, ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধন্য দয়াল ঠাকুর! এই দয়াই ত আমাদের ভরসা!

আজ অপরাহ্ণে, বাসাটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একটি অনুগত শিষ্য আসিয়া, বহুক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিলেন। আমি এই সময়ে রান্নার চেষ্টায় ছাদে চলিয়া গেলাম, সময়ে সময়ে আসিয়া দু' একটা কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন—ধন্, মন্, তন্, এ সমস্তই গুরুদেবের চরণে উৎসর্গ না হ'লে কিছুই হ'ল না, সবই বিড়ম্বনা। কথাটি শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিল।

মা আনন্দময়ীর সঙ্গীত।

আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী (শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী), আমাদের অনেক গুরুভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া, অপরাহ্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ইঁহাকে 'মা আনন্দময়ী' বলিয়া ডাকেন। মা আনন্দময়ী যখন যেখানে যান, স্বাভাবিক স্নেহ ও ভালবাসাতে সেখানকার সকলকে যেন আনন্দে ডুবাইয়া রাখেন। আমি রান্নার চেষ্টায় হয়রান হইয়া যাইতেছি বুঝিতে পারিয়া, মা আমাকে বলিলেন—'কেন বাবা এ কষ্ট? সকলের সঙ্গে একমুঠো খেয়ে নিলেই ত পার!' আমি বলিলাম—'কি কর্‌বো মা? নিজে রান্না ক'রে খাই, ইহা যে উনি ভাল বাসেন।' রান্না করিয়া কোন প্রকারে আহার করিয়া নিজ আসনে যাইয়া বসিলাম। সন্ধ্যাকীর্ত্তন শেষ হইতে রাত্রি প্রায় নয়টা হইল।

ঠাকুরের আহারান্তে, মা আনন্দময়ী, একটি একতারা লইয়া গান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে গান এমন জমাট হইয়া পড়িল যে, সকলেই নিশ্চল ভাবে আপন আপন আসনে পুত্তলিকার মত স্থির হইয়া রহিলেন। মা আনন্দময়ী ভাবে বিভোর। কিছু ক্ষণ পরে, কীর্ত্তনের পদ, মধুর কণ্ঠস্বরে মিলিত হওয়ায়, এমনই ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল যে, ঠাকুরও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ঘন ঘন অশ্রু কম্প পুলকাদিতে অবশ হইয়া, আসনেই বারংবার ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। ঐ সময় 'হরিবোল' 'হরিবোল', 'জয়রাধে' 'জয় রাধে', 'আঃ উঃ' ইত্যাদি এক একটি শব্দ ঠাকুরের মুখহইতে নির্গত হওয়াতে, একটা প্রবল শক্তি, ঝঞ্ঝাবাতের মত আসিয়া, ঘরের ভিতরে ও বাহিরে, সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। চারিদিকে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। কেহ কেহ চীৎকার করিতে লাগিলেন, কারও কারও বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। আবার কতকগুলি লোক মূর্চ্ছিত অবস্থায়ই গড়াইতে গড়াইতে ঠাকুরের দিকে চলিলেন। আমার কখনও ভাব হয় না; আমি স্থির হইয়া সকলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ভাবের বিকাস দেখিতে লাগিলাম। এইরূপে, ক্ষণে স্থির ক্ষণে অস্থির অবস্থায়, প্রায় সমস্তটি রাত্রি অতিবাহিত হইল।

মা আনন্দময়ীর পুত্র (মণীন্দ্রনাথ) বলিলেন—"ঐ সময়ে গোঁসাইয়ের ভিতরহইতে প্রবল শক্তি আসিয়া আমাকে অভিভূত করিল। মনে হইল, আজ গোঁসাই এ ভাবেই শক্তিসঞ্চার করিয়া আমাকে কৃপা করিলেন।"

প্রসাদী বস্ত্র স্পর্শে ভাবাবেশ।

ঠাকুর, দিনরাত আসনেই বসিয়া থাকেন; বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কখনও আসন ছাড়িয়া উঠেন না। ঠাণ্ডা ঘরে, একটানা বসিয়া থাকাতেই, বোধ হয়, পায়ে বাতের বেদনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে শীতও খুব পড়িয়াছে। মণি বাবু এবং বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরের জন্য একটি উলের 'ট্রাউজার' আনিয়া ঠাকুরকে পরিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর এসকল কখনও ব্যবহার করেন না, কিন্তু উঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া, খুব সন্তোষভাবে গ্রহণ করিলেন এবং ৫।৭ মিনিট পরিয়া রহিলেন। পরে উহা খুলিয়া বৃন্দাবন বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—"বৃন্দাবন! তুমি এটি পর, তুমি পর্‌লেই আমার পরা হবে।"

বৃন্দাবন বাবু, কোনও প্রকার দ্বিধা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ উহা পরিয়া বসিলেন। আমরা সকলে দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, 'ঠাকুরের ব্যবহৃত বস্ত্র তিনি স্বয়ং হাতে ধরিয়া দিলেন, উহা ত মাথায়ই রাখিতে হয়; বৃন্দাবন বাবুর এ কিপ্রকার ধৃষ্টতা যে, অনায়াসে উহা পায়ে লাগাইয়া পরিলেন!'

তিন চারি মিনিট পরেই, বৃন্দাবন বাবু উহা অতিশয় ব্যস্ততার সহিত খুলিয়া ফেলিলেন এবং বিস্মিত হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন—"মশায়! এ কি? একটা 'ইনেনিমেট্' (Inanimate) বস্তুতেও এত ইলেক্‌ট্রীসিটি (Electricity) ঢুকিল! আমার সমস্তটি শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, কিছুতেই আর এটি রাখিতে পারিলাম না। এ কি রকম?" এই বলিয়া, বৃন্দাবন বাবু পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। আমরা ত তখন অবাক্! ভাবিলাম, 'ঠাকুরের হাত পা টিপিয়া শরীরের সেবা করিয়াও ত কত সময় কাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু কখনও ত এমন একটা কিছু অনুভব হয় না, যাহাতে শরীর ও-মন অস্থির বা অন্যপ্রকার হয়; আর, দু' চার মিনিটের জন্য ঠাকুরের ব্যবহৃত বস্ত্র, বৃন্দাবন বাবু স্পর্শ করিয়া এমনই হইলেন যে, শরীর তাঁর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল! তিনি পুনঃ-পুনঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন, এবং কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মধ্যাহ্নে, ঠাকুরের আহারান্তে, প্রসাদ লইয়া মহা হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। বৃন্দাবন বাবু, খুব নিরীহ প্রকৃতির লোক বলিয়া, আজ প্রসাদ পাওয়ার সুবিধা করিতে পারিলেন না। শূন্য পাতাখানামাত্র কুড়াইয়া লইয়া, দ্রুত পদে নীচে চলিয়া গেলেন; উহা কপালে কয়েক

বার স্পর্শ করাইয়া, খুব আগ্রহের সহিত, ডাঁটা সহিত সমস্ত কলাপাতাখানাই চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁর ভক্তিভাবে ছল্ ছল্ চক্ষু ও সমস্তটি মুখের এক প্রকার চমৎকার প্রভা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ধন্য বৃন্দাবন বাবু!

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ঠাকুর কয়েকটি গুরুভ্রাতার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে বৃন্দাবন বাবুর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবন বাবুও তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—"**বৃন্দাবন, তোমার বাড়ীটি ত বেশ। তোমার সেই কুঞ্জ কই?**" শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। ঠাকুর, কিছু ক্ষণ ওখানে দাঁড়াইয়া, করজোড়ে বাড়ীটিকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া, বাসায় চলিয়া আসিলেন। একটু পরে কথায় কথায় বলিলেন— "**বৃন্দাবনের বাড়ী যেয়ে শরীরটি আমার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল; ইচ্ছা হ'ল, একবার ঐ মাটিতে প'ড়ে খুব গড়িয়ে নেই। বাড়ীটি কি সুন্দর! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন!**"

রাত্রিতে বৃন্দাবন বাবু আসিয়া, ঠাকুরের ঐ কথা শুনিতে পাইয়া, ঠাকুরকে বলিলেন, "মশায়! বাড়ী পরিষ্কার হোক আর যাই হোক, এখন ভূতের জ্বালাতনে বাড়ীতে টেকা যে শক্ত হ'য়ে পড়্‌ল! আপনার সাধন নিয়ে আর কিছু হোক্ আর নাই হোক্, ভূতে কিন্তু বেশ বিশ্বাস হ'ল।"

ঠাকুর বলিলেন—"**শুধু ভূতে কেন? যাহা সত্য সে সকলেই ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস হবে। সবই ত উড়ায়ে দিয়ে বসেছিলে!**"

আমাদের একটি গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নন্দ বাবু অন্য সম্প্রদায়ের একটি মহাত্মার নিকট যাতায়াত করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। অদ্য তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরুর সঙ্গ অপেক্ষা, অন্য কোন সাধুর সঙ্গে যদি অধিক আনন্দ হয়, তা হ'লে সেখানে যাওয়া যায় কি না, এবং গুরুর নিকট না আসাতে কোন অপরাধ হয় কি না?"

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন—"**যার যেখানে গিয়ে আনন্দ হবে, উপকার পাবে, সে সেখানেই যাবে। গুরুর কাছে যেয়ে আনন্দ না হ'লে, উপকার না পেলে, সেখানে না যাওয়াই ভাল; এরূপ স্থলে যাওয়াতে বরং পাপই হয়।**"

বাসা পরিবর্ত্তন।

আমাদের বর্ত্তমান বাসাতে জলের, পাইখানার, রান্নার ও থাকার বড়ই অসুবিধা হইতেছে ; তাহার উপর দিন দিন লোকসংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ঠাকুরমা, একটি ঝি ও সীতানাথকে * সঙ্গে লইয়া, কিছুকাল এখানে থাকিবার প্রত্যাশায়, শান্তিপুর হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চারি পাঁচ দিন মাত্র থাকিয়াই চলিয়া গেলেন। শ্রীমতী শান্তিসুধা ও তাঁহার ছেলে (দাউজী) দ্বারভাঙ্গায় ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের এখানে আনাইয়াছেন। শান্তিসুধার সঙ্গে থাকিবার সুযোগ পাইয়া, কয়েকটি গুরুভগ্নীও উপস্থিত এখানেই রহিয়াছেন। মণি বাবু, বৃন্দাবন বাবু প্রভৃতি তিন চারিটি গুরুভ্রাতা, বাড়ী ঘরের সম্বন্ধ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, আফিসের সময় বাদে, দিবারাত্রি এখানেই আছেন। তাঁহারা ভাতেসিদ্ধ ভাত খাইয়া আফিসে চলিয়া যান, রাত্রিতে মুড়ি মুড়কি দু' এক মুঠা পাইলেই যথেষ্ট মনে করেন। তার পর নবাগত লোকের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এদিকে বাড়ীর মালিক সুরেশ বাবুরও ছুটি শেষ হইয়া আসিল। সুতরাং অবিলম্বেই আমাদের অন্যত্র না যাইয়া উপায় নাই। ঠাকুর সকলকেই একটি বাসার অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুরুভ্রাতারা, নিজেদের বাসার সন্নিকটে বাড়ী তালাস করিয়া, সুবিধা অসুবিধা ঠাকুরকে জানাইতেছেন। শ্রীচরণ বাবুর চেষ্টায়, শ্যামবাজার বড় রাস্তার তেমাথার উপরে, কান্তি ঘোষের বাড়ীর তেতালাটি মাত্র ভাড়ায় পাওয়া গেল। বাসাখানা, নবীন বাবুর বাড়ীর কাছে, রাস্তার ঠিক বিপরীত দিকে। কিন্তু তেতালায় ঠাকুরের থাকা হইলে, নিয়ত উঠা নাবা সকলেরই অসুবিধা হইবে বলিয়া, ঠাকুর একটু অসম্মতি জানাইলেন। পরে নবীন বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের আগ্রহ এবং মণি বাবুর জেদ দেখিয়া, অগত্যা সেই বাসায়ই যাইতে রাজি হইলেন। পরদিন আহারান্তে, আমরা ঐ বাসাতেই যাইব, স্থির হইয়া গেল।

১৫ই অগ্রহায়ণ।

শ্যামবাজারের বাসা।

অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতার পারলৌকিক কল্যাণার্থে উপাসনাদি হইবে। ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া, যোগজীবনের সহিত তথায় চলিয়া গেলেন। শ্যামবাজারের নূতন বাসায়, উপস্থিত বেবন্দোবস্তের ভিতরে, পীড়িতাবস্থায় শান্তিসুধার থাকার অসুবিধা হইবে,

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, মঙ্গলবার।

* শ্রীমান সীতানাথ, প্রভুজীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺ ব্রজগোপাল গোস্বামীর পৌত্র ও যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামীর পুত্র।

এইজন্য বৃন্দাবন বাবু, তাঁহার বাসায় উঁহাকে লইয়া গেলেন। শান্তিসুধা এখন কয়েক দিন সেখানেই থাকিবেন।

অপরাহ্নে, আমরা সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া শ্যামবাজারের বাসায় পঁহুছিলাম। এ বাড়ীর তেতালাটিমাত্র আমাদের জন্য লওয়া হইয়াছে। হল্‌ঘরের মধ্যস্থলে, দেওয়ালের ধারে, উত্তরমুখে ঠাকুরের আসন পাতিলাম। ঠাকুর, নিজ আসনের পশ্চিম দিকে, দরজাটি মাত্র ব্যবধান রাখিয়া, আমাকে আসন করিতে বলিলেন, আমি সেইমত ঠাকুরের বামদিকে প্রায় চার ফুট অন্তরেই নিজের আসন করিলাম। নিত্যহোম, আমায় অন্যত্র করিতে হইবে।

বাসার অবস্থা দেখিয়া খুব ভালই মনে হইল। হল্‌ঘরের ভিতরে অনায়াসে পঞ্চাশ জন লোক থাকিতে পারে। এই ঘরের দক্ষিণে ও উত্তরে অপ্রশস্ত লম্বা বারেন্দাও রহিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুই খানা ঘর আছে। পূবেরঘরের সম্মুখে, দক্ষিণ দিকে দোতালার প্রকাণ্ড ছাদ এবং পশ্চিমের ঘরের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে বড় একখানা রান্নাঘর আছে। বাড়ীর একেবারে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি মাত্র পাইখানা। উহা ঠাকুরের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল।

হল্‌ঘরের পশ্চিম দিকের ঘরখানাতে, ভাণ্ডার রাখার ব্যবস্থা হইল। চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের নিকট গুরুভ্রাতারা বসিয়া থাকিতে অসুবিধা বোধ করেন, সুতরাং এই ঘরে প্রয়োজনমত তাঁহাদের বিশ্রাম করাও চলিবে। হলের পূর্ব্ব দিকের ঘর, মেয়েদের জন্য রহিল।

তেতালায় জলের কোন ব্যবস্থা নাই ; ভারীর দ্বারা জল তুলিয়া লইতে হইবে। পাইখানা একটি মাত্র থাকায়, গুরুভ্রাতারা নবীন বাবুর বাড়ী যাইবেন। রাস্তাহইতে তেতালা পর্য্যন্ত সোজা সিঁড়ি থাকাতে, এ বাড়ীতে যাতায়াতের কোনও ক্লেশ নাই। নবীন বাবু, তাঁর বাড়ীখানা গুরুভ্রাতাদের দিয়া রাখিলেন। আবশ্যকমত যে কেহ, ওখানে অবাধে যাইতে ও থাকিতে পারিবেন।

আজ সন্ধ্যাহইতে না হইতেই, দলে দলে গুরুভ্রাতারা আসিয়া পড়িলেন। খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তনের খুব ঘটা পড়িয়া গেল। সকলেরই এ বাসায় আসিয়া মহা আনন্দ। সঙ্কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর স্বহস্তে হরির লুট দিলেন। গুরুভ্রাতারা, আজ অনেকেই এখানে রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রায় একটা পর্য্যন্ত, আনন্দ-আলাপে কাটাইয়া, আমরা নিদ্রিত হইলাম।

শ্যামবাজারে ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য।

শেষ রাত্রিতে, প্রায় ৪টার সময়ে, ঠাকুর আসনে উঠিয়া বসেন। গুরুভ্রাতারাও অনেকেই এই সময়ে জাগরিত হন এবং আপন আপন আসনে বসিয়া সাধন করিতে আরম্ভ করেন। কিছু ক্ষণ পরে, ঠাকুর করতাল বাজাইয়া দুই তিনটি গান করেন। তৎপরে গুরুভ্রাতারা ভোর পর্য্যন্ত প্রাতঃসঙ্গীত করিয়া থাকেন।

ঠাকুর, প্রত্যূষে কীর্ত্তনান্তে আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যান। অর্দ্ধঘণ্টা পরে, আসনে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। বেলা প্রায় ৮টার সময়ে চা-সেবা হয়। তৎপরে, কিছুক্ষণ গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া, পাঠ আরম্ভ করেন। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত পাঠ হয়। ১১টার পরে অর্দ্ধঘণ্টার জন্য শৌচে যান। ১২টার সময়ে আহার হয়। আহারের পর, অর্দ্ধঘণ্টাকাল, ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার অবসর পাওয়া যায়। তৎপরে ঠাকুর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেন। এই সময়ে অবিরল-ধারে অশ্রুবর্ষণে, ঠাকুরের বুকের আলখিল্লা ভিজিয়া যায়। ৪টার পর তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয়, তখন নানা শ্রেণীর লোকের সমাগমে ঘরটি পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কথা-বার্ত্তা, প্রশ্ন-উত্তর, হাসি-গল্প সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। আমি নিজের রান্নার ব্যাপারে এই সময়ে ব্যস্ত থাকি, সুতরাং অনেক প্রয়োজনীয় কথা শুনিতে পাই না। বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটিলে বা প্রয়োজনীয় উপদেশ হইতে থাকিলে, রান্না ফেলিয়া, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। রান্নাঘরটি খুব নিকটে বলিয়া এ বিষয়ে আমার বেশ সুবিধা হইয়াছে।

সন্ধ্যায় হরি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই সময়ে ঘরের ভিতরে সকলের স্থান হয় না। সঙ্কীর্ত্তন সাধারণতঃ রাত্রি ৯॥ টার মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। পরে ঠাকুরের সেবা হয়। তৎপরে রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত, গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে, ঠাকুরের হাসি-গল্পে, কথায়-বার্ত্তায় কাটিয়া যায়, তার পর একেবারে নিস্তব্ধ। রাত্রি ৩টা বাজিয়া গেলে ঠাকুর একবার শয়ন করেন। কোন কোন দিন সমাধিস্থ থাকায়, শয়ন করাও হয় না। এই ভাবে সমস্ত দিনরাত্র অতিবাহিত হইতেছে।

যথার্থ সত্য কি উপায়ে লাভ হয়।

আকাশবাণী—"গণ্ডি ছাড়"।

১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার।

ঠাকুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কৃতবিদ্য একটি ব্রাহ্মবন্ধু (শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত), ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'যথার্থ সত্য কি উপায়ে লাভ হয়?'

ঠাকুর বলিলেন—"যথার্থ সত্য লাভ করতে হ'লে, সকল প্রকার সংস্কার-বর্জ্জিত হ'তে হয়। সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হ'লে, মনটি একেবারে নির্ম্মল হ'য়ে যায়, তখন কোন ভাবই আর থাকে না। সেরূপ অবস্থায়ই সত্যর অনুসন্ধান। মত, আচরণ, ভাব ও সংস্কার মন হ'তে একেবারে চ'লে গেলে, যা লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত সত্য। সংস্কারবর্জ্জিত অন্তরে, সত্যের এক কণা মাত্র প্রকাশ হ'লেও, তাহাই অমূল্য। বৌদ্ধ যোগীরা, প্রণালীগত উচ্চসাধন অবলম্বন করবার প্রারম্ভেই, এই সংস্কারটিকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট ক'রে নেন্। এতে তাঁদের প্রায় তিন বৎসর সময় লাগে। গোড়াতে সংস্কার বর্জ্জিত হন ব'লেই, বৌদ্ধদিগকে অনেকে নাস্তিক বলেন।"

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"যাঁরা কোনও মতের বা সংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে চলেন, তাঁরাই বিশেষ বিশেষ দলের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। যাঁরা কোনও মতামতের বা সংস্কারের অধীন না হ'য়ে, কেবল মাত্র নিজের অন্তরে সত্যেরই অনুসন্ধান করেন, তাঁদের কোনও দল নাই, সম্প্রদায়ও নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক অবস্থায়, কিছু কালের জন্য আমি বাগআঁচড়ায় ছিলাম, ঐ সময়ে আমার কার্য্যপ্রণালী, বক্তৃতা ও উপদেশাদি নিয়ে, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে খুব হুলুস্থুল পড়েছিল। আমি অত্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাতে লাগ্‌লাম। আমার কয়েকটি বন্ধু, ঐ সকল আলোচনার প্রতিবাদ করতে, কলিকাতা হ'তে আমাকে পুনঃপুনঃ লিখ্‌তে লাগ্‌লেন এবং আমাকে কলিকাতায় উপস্থিত হ'তে বল্‌লেন। আমি বিষম সমস্যায় প'ড়ে গেলাম। নিজের স্বাধীনবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে, ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে থাকা ঠিক হবে কি না, প্রাণে সর্ব্বদা এই আলোচনা হ'তে লাগ্‌ল। আমি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা

করলাম—'ঠাকুর, এ সময়ে আমার কি করা কর্ত্তব্য, ব'লে দাও।' এ সময়ে পরিষ্কাররূপে আকাশবাণী হ'ল, 'শুন্‌লাম গণ্ডির ভিতরে থাকলে, জীবনে সত্য লাভ হবে না।' আকাশবাণী শুনে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। মানুষের দিকে চেয়ে চল্‌লে, ধর্ম্মকর্ম্ম কখনও হয় না। মানুষে আমার কার্য্যের নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন, সেই দিকে দৃষ্টি পড়্‌লেই সর্ব্বনাশ। কারও দিকে না তাকায়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে, যদি নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কার্য্য ক'রে যেতে পারি, তবেই রক্ষা, না হ'লে নিজেকে বাঁচান বড়ই কঠিন। সত্য অনন্ত, সত্যের ভাব অনন্ত, সত্যের রূপ অনন্ত, আবার এই সত্যলাভের উপায়ও অনন্ত। এই সত্যলাভের জন্য, সকলকেই যে একই পথে, একই মতে চল্‌তে হবে, তা বলা যায় না। মানুষ যেমন পৃথক্ পৃথক্, তাদের প্রকৃতিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সকলকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী চল্‌তে হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন পথ, সুতরাং প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন অবলম্বন করা আবশ্যক হয়।"

একটি লোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়! আহারের সঙ্গে কি ধর্ম্মের কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, খুব আছে। আহারবিষয়ে খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন। অপবিত্র আহারে শরীরে ব্যাধি জন্মে, মনও অত্যন্ত চঞ্চল হয়; সুতরাং ধর্ম্মলাভ কঠিন হ'য়ে পড়ে। সর্ব্বদা পবিত্র আহার করতে হয়।"

আনুগত্যই ব্রহ্মচর্য্য।

আজ সমস্ত দিন উদ্বেগে ও অশান্তিতে গিয়াছে। ধর্ম্মলাভ করিব আশায় সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় কত ক্লেশ করিয়া দিন কাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু কোন একটা বিষয়ে যে কৃতকার্য্য হইব এরূপ ভরসা পাইতেছি না। ঠাকুর, ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত! তাতে উপকার আর কি হইতেছে? স্ত্রীসঙ্গটিই মাত্র করিতেছি না। মনে

মনে সমস্তই ত চলিতেছে। একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলে সেই ধ্যানেই ত থাকিতে অধিক আরাম পাই। হায়! হায়! আমি আবার জীবনে ধর্ম্মলাভ করিব? যে সকল গুরুভ্রাতা স্ত্রীসঙ্গ করিতেছেন, তাঁহারাও ত আমা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিয়া আনন্দ করিতেছেন! সুতরাং এ ব্রহ্মচর্য্যে লাভ কি? যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য আর হইল কই? ইত্যাদি চিন্তায় আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সকলে নিদ্রিত হইলেন, আমি বিছানায় পড়িয়া, সময়ে সময়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, ছট্ ফট্ করিতেছি; ঠাকুর সমাধিস্থ; রাত্রি প্রায় ২'টা, অকস্মাৎ ঠাকুরের মুখ দিয়া এই কথাকয়টি বাহির হইয়া পড়িল—

"এক পরিবারের দুই কর্ত্তা, এক রাজ্যে দুই রাজা, মঙ্গল কখনও হয় না। নিজে ম'রে গিয়ে ইষ্টদেবতাকে দেহমনের রাজা করতে হবে। না হ'লে আর কল্যাণ নাই। বৃক্ষের বীজ পচ্‌লেই তা অঙ্কুরিত হয়। অভিমান নষ্ট হ'লেই চিত্তে চৈতন্য প্রকাশ পাবে।"

একটু থেমে আবার বল্‌লেন—"গভীর নিশীথে, নির্জ্জনে, নিজের ভিতরে প্রবেশ ক'রে, অনুসন্ধান করলে ক্রমে জানা যায় আমি কি! ব্রহ্মচর্য্যই সমস্ত সাধনের গোড়া। অনুগত না হ'লে, সেটি হবার যো নাই। একমাত্র গুরু-কৃপায়ই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য হ'লে, আর কিছুই বাকি থাকে না। তখন সমস্ত অবস্থা করতলন্যস্ত আমলকবৎ হ'য়ে থাকে। আনুগত্যই ব্রহ্মচর্য্য।"

আমি, অবশিষ্ট রাত্রিটুকু, ঠাকুরের এই কথাকয়টি ভাবিয়া ভাবিয়া কাটাইলাম। কোনও প্রশ্ন নাই, ইঙ্গিত নাই, নিজের জ্বালায় নিজে জ্বলিতেছি; সমাধিস্থ থাকিয়াও, ঠাকুর তাহা অনুভব করিয়া, উপদেশ দানে আশ্বস্ত করিলেন। ধন্য দয়াল ঠাকুর!

এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হইবে।

ঠাকুর, এই বাড়ীতে আসিয়াছেন, পরে বহুলোকের সমাগম হইতেছে। দর্শন-প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য, ঠাকুর অপরাহ্ণ চারিটা হইতে সন্ধ্যা কাল পর্য্যন্ত, সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রতিদিনই অপরাহ্ণে, বহুদূরহইতেও, বিভিন্ন অবস্থার লোক, সঙ্গ প্রত্যাশায়, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেছেন। শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয়

মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়, ঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ আলোচনায় পরম সন্তোষ লাভ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হইবে ?"

ঠাকুর এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—"স্কুল কলেজের ছেলেদের জীবনের উপরেই দেশের সমস্ত কল্যাণ নির্ভর করছে। আমাদের দেশে, ঋষিদের সময়ে, তাঁহারা, ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই, বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা অভ্যাস করায়ে দিতেন। বর্ত্তমান সময়ে, ছেলেদের শিক্ষা সে প্রণালী ধ'রে হয় না। এজন্য শিক্ষালাভ ক'রেও সে প্রকার ফল হয় না। আমি যখন ঢাকাতে ছিলাম, স্কুল কলেজের ছেলেরা এসে প্রায়ই এই প্রশ্ন করতেন, 'মহাশয় আমাদের কু-অভ্যাস কিসে ত্যাগ করতে পারব ? ছেলেবেলা আমাদের পিতা, মাতা, শিক্ষক বা অভিভাবকেরা কখনও বুঝায়ে দেন নাই যে, বীর্য্য নষ্ট করা অনিষ্টকর ; সুতরাং সে বিষয়ে সাবধান হ'তে কখনও চেষ্টা করি নাই। এখন বুঝ্‌ছি যে, ওতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি করব ? অনেক কালের কু-অভ্যাস এখন আর বহু চেষ্টাতেও ছাড়্‌তে পারছি না।' বাস্তবিক সর্ব্বত্রই এ বিষয়ে ছোট ছোট ছেলেদের ভিতরে একটা শিক্ষা না থাকাতে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হ'চ্ছে। আমাদের দেশে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, তাঁরা যদি ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলে মিশে এমন সুবিধা ক'রে দেন যে, ছেলেরা তাদের ভিতরের সমস্ত অবস্থা নিঃসঙ্কোচে শিক্ষকদের নিকট বল্‌তে পারে, এবং এ সকল কু-অভ্যাসের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ, সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়েও একটা সংস্কার ছেলেদের মনে জন্মায়ে দেন, তা হ'লেই তাদের এবং দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। যে শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং যার উপর ব্যক্তিগত জীবনের ও দেশের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করছে, সম্প্রতি দেশে আর সে শিক্ষা নাই। একবার, অনেক দিন হয়, হিমালয়ে একটি মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম ; তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এ দেশের কল্যাণ কিসে হয় ?' তাতে তিনি বলেছিলেন, 'একমাত্র সত্য ও বীর্য্য রক্ষা করলেই দেশের কল্যাণ হবে।' তা ব্যতীত দেশের আর কল্যাণ নাই।"

ঠাকুর এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু, দেশমান্য সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক। ঠাকুরের মুখে এ সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

ধর্ম্ম সহজে লভ্য নয়।

১৮ই অগ্রহায়ণ। কয়েকটি ভদ্রলোক আসিয়া 'ধর্ম্ম কি উপায়ে সহজে লাভ হয়' এ বিষয়ে ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"আজ কাল দেখ্‌ছি, সকলেই খুব সহজে ধর্ম্মলাভ করতে চায়। ধর্ম্ম যে কত মূল্যবান্ বস্তু, ধর্ম্ম লাভ করা যে কতদূর কঠিন, তা একবার কেহ ভাবে না। অন্তরের কু-অভ্যাস, সমস্ত দূর না হ'লে, ধর্ম্ম কিছুতেই লাভ হয় না। বহুদিনের কু-অভ্যাস, মানুষ ইচ্ছামাত্রেই দূর করতে পারে না; তা দু'এক দিনের কর্ম্মও নয়। এসব দূর কর্‌তে যে সময়টুকু লাগে, ততটুকু সময়ও কেহ ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে চায় না। খুব শীঘ্রই একটা কিছু পেতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে; তাই কিছুই হয় না। তার পর সকলেই আবার আপন আপন রুচিমত ধর্ম্ম চায়। নিজ রুচির সঙ্গে একটু অমিল হ'লে, তা ধর্ম্ম ব'লেই কেহ স্বীকার করে না। এই দু'টি কারণে, ধর্ম্ম লাভ করা লোকের কঠিন হ'য়ে পড়েছে। ধর্ম্ম একটা গাছের ফল নয় যে, ইচ্ছামাত্রই তা টপ্ ক'রে কেহ পেড়ে নিবে।"

তাঁহারা আবার প্রশ্ন করিলেন, "ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে, তাঁর প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, না শুধু জপ তপ করিলেই হইবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"ভগবান্‌কে সহজে লাভ করা যায় না। কেহ সর্ব্বদা তাঁর প্রিয় কার্য্য ক'রে তাঁকে লাভ করেন। কেহ বা সর্ব্বদা ধ্যান ক'রে তাঁকে প্রাপ্ত হন; কোন কোন ব্যক্তি নিয়ত জপ ক'রে তাঁর দর্শন লাভ করেন। সকলের এক প্রকার নয়। কে যে কোন্ ভাবে চ'লে তাঁকে লাভ ক'রতে পার্‌বে, বলা যায় না। সকলকেই যে ধ্যান ধারণা জপ তপ ক'রে তাঁকে লাভ করতে হবে, এমনও কিছু নয়। তাঁর কৃপায়ই তাঁকে লাভ করা যায়। কৃপাই সমস্তের মূল।"

জিজ্ঞাসার অবস্থা; হিন্দুভাব ও পাশ্চাত্যভাব।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পুরাণাদিতে দেখা যায়, শিষ্য, গুরুর নিকটে কোনও বিষয় প্রশ্ন করিলে, সেই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই, শিষ্যের ভিতরে সেই জ্ঞানটিও প্রস্ফুটিত হইত। আমাদের তা হয় না কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"বিবেক, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও মুমুক্ষুতা এই সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন না হ'লে, তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে কারও জিজ্ঞাসা করবার অধিকারই হয় না। এ সকল অবস্থা লাভ ক'রে প্রশ্নটি কর্‌লে, উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও লাভ হয়। তা না হ'লে, মনে যা আসে তাই যদি ভাসা ভাসা ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়, উত্তরটিও সেইরূপ ভাসা ভাসা হ'য়ে থাকে; কোনও ফলই হয় না। অন্তরে যথার্থ ব্যাকুলতা না হ'লে, বস্তুর প্রকৃত অভাবজ্ঞান না জন্মালে, প্রশ্ন করা, ছেলেদের পয়সা না নিয়ে, বাজারের সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখে, দর জিজ্ঞাসা করার মতই হয়। ওর কোন মূল্যই নাই। অনেক সময়ে প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়া, আচার্য্যেরা কোন প্রয়োজনই মনে করতেন না; এমন কি, ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত বলেছিলেন, 'তপ! তপ! তপ!' তপস্যা কর, তপস্যা কর, তপস্যা কর্‌লেই সমস্ত বুঝ্‌তে পারবে।'

একজন বলিলেন, "একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসংশয় হইলে, তাহা করিতে যেমন উৎসাহ হয়, না বুঝিয়া করিলে সে প্রকার ত হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন—"ঐ সকল পাশ্চাত্যভাব। আগে বুঝ্‌বো পরে কর্‌বো, এ আমাদের দেশের বা সনাতন ধর্ম্মের ভাব নয়। আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তাদের উপদেশ, 'আগে কর, পরে বুঝ।' সকল বিষয়েই কতকগুলি স্বীকার্য্য আছে, তা মেনে নিতেই হয়! যেমন ক এর পর খ, খ এর পর গ পড়্‌তে হয়। এতে, গোড়া ধ'রে, 'তা কেন' প্রশ্ন কর্‌লে, শিক্ষা কখনও হয় না।"

আজ হোমের জন্য বিল্বপত্র সংগ্রহ না হওয়ায়, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোনও ফুল দিয়া কি হোম হয় না?'

ঠাকুর বলিলেন—'শাক্তদের হোম অপরাজিতা ফুল দিয়া হয়, আর বৈষ্ণবদের কুন্দ পুষ্প ও শ্বেত করবী দ্বারা ব্যবস্থা আছে।'

ব্রজমায়ীদের স্বাভাবিক ভাব ও ভজন।

গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে নানা কথায় ঠাকুর আজ শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজমায়ীদের ভাব ও ভজন সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—"নিতান্ত সাধারণ অবস্থার গরীব দুঃখী পাড়াগেঁয়ে ব্রজমায়ীদেরও ভগবানের প্রতি যেরূপ একটা স্বাভাবিক স্নেহ মমতা বাৎসল্যভাব দেখা যায়, বহু সাধন ভজনেও তা লাভ করা দুঃসাধ্য। গোবিন্দজীকে তাঁরা এখনও সেই ভাবেই দেখেন। দলে দলে ব্রজমায়ীরা দধি, দুগ্ধ, মাখনাদি ভাঁড়ে ভাঁড়ে নিয়ে, সমস্ত রাস্তা নৃত্য ও গান কর্‌তে কর্‌তে, গোবিন্দজীর মন্দিরে এসে উপস্থিত হন, ঠিক নিজের কোলের ছেলেটিকে মা যেমন আদর করেন, তেমনই তাঁরা গোবিন্দজীকে কত প্রকারে আদর করেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করেন, গায়ে হাত বুলায়ে দেন, চুমো খান, নিজের পায়ের ধূলো হাতে নিয়ে, গোবিন্দজীর কপালে মাখায়ে দেন, এবং আশীর্ব্বাদ করেন; গোবিন্দজীকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাৎসল্যভাবে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন। তাঁকে, তাঁরা ঠিক যেন ঘরের ছেলে মনে করেন। এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।"

১৯শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্রজমায়ীদের ভগবানের প্রতি কি শুধু বাৎসল্য ভাবই হয়, না অন্যান্য ভাবও হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"ব্রজমায়ীদের সকলেরই ত আর এক প্রকার ভাব নয়। ভজন ত কত প্রকারের। কেহ বা নানা প্রকার বেশভূষা ক'রে, অলঙ্কারাদি প'রে, এক একবার নিজের দিকে তাকাচ্ছেন, নিজেরই রূপ নিজে দেখে ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়্‌ছেন। এ অবস্থায় তাঁরা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়েও অনেক সময় প'ড়ে থাকেন। কেহ বা দু' ঘণ্টা ধরে মুখই পুঁচ্‌ছেন, তিলকই কত বার কর্‌ছেন আর পুঁচ্‌ছেন! পছন্দমত হ'য়ে গেলে, আয়নাতে একবার নিজের মুখখানি নিজেই দেখে, একেবারে অবশাঙ্গ হ'য়ে ঢ'লে পড়েন। তিন চার ঘণ্টা আর সংজ্ঞাই থাকে না। শরীরে কত প্রকার ভাবেরই খেলা হ'তে থাকে! কেহ বা একখিলি পান মুখে দিয়ে, চার পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে তাই চিবাচ্ছেন। চোখের জলে

বুক ভেসে যাচ্ছে। ভাবে ডগমগ। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সমস্তই এককালে প্রকাশ হ'য়ে পড়্ছে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। সাধারণ লোকে এ সকল ভাব, এ সকল অবস্থা কি প্রকারে বুঝ্বে? এ সকল ভজনই বা কি প্রকারে জান্বে? দেহদ্বারা ভগবানের ভজন, এযে কত মধুর, তা যিনি করেন তিনিই জানেন। শ্রীবৃন্দাবনে এ সব ভাবেই ভগবানের উপাসনা। ঐশ্বর্য্যভাবে উপাসনা বড় দেখা যায় না। স্থানের প্রভাবই এমন চমৎকার যে, একটা সাধন ভজন নিয়ে থাক্লেই, চিত্তে আপনা আপনি এ সকল ভাব ও ভক্তি উদয় হ'য়ে থাকে।"

ভাব কাকে বলে?

২০শে অগ্রহায়ণ, ৫ই ডিসেম্বর, শনিবার।

আজ শনিবার বলিয়া, বেলা দুইটা হইতেই, ঠাকুরের নিকট বিস্তর লোকের সমাগম আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মসমাজের গণ্যমান্য, ঠাকুরের কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া, বিবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গের পর ঠাকুরকে বলিলেন, 'বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাবভক্তি, দেখিতেছি, বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের ভিতরেই প্রবেশ করিতেছে। আর তাতে জ্ঞানের দিক্‌টা যেন দিন দিন নির্ব্বিয়া যাইতেছে।'

ঠাকুর বলিলেন—"বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাবভক্তি হ'লে জ্ঞানের দিক্ কখনও নিবে যায় না। নাচাকোঁদা, কান্নাকাটি, মাতামাতি করা—এ সকলকে ত আর ভাব বলে না। ভাব বড় সহজ জিনিস নয়।"

একটি বাবু বলিলেন, "মহাশয়! আমরা ত ওসবকেই ভাব বলি; ভাব তবে কি?"

ঠাকুর বলিলেন—"ভাব ত ঢের পরে। ভাবের অঙ্কুরমাত্র জন্মিলে যে সকল অবস্থা দেখা যাবে, বৈষ্ণব শাস্ত্রে তা এইরূপ বলেছেন—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

ভাব জন্মিবার পূর্ব্বেই এ সকল ত হওয়া চাই; মুখে 'ভাব ভাব' বল্লেই ত হবে না।

১। "ক্ষান্তি"—সকল বিষয়েই তার ধৈর্য্য ও ক্ষমা থাক্‌বে। নিন্দা অপমান অত্যাচারাদি যত দুর্ব্যবহারই তার প্রতি হউক না কেন, কিছুতেই তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না। সর্ব্বদা ক্ষমাশীল হবে।

২। "অব্যর্থকালত্বম্"—সে কখনও বৃথা কালক্ষেপ কর্‌বে না; সর্ব্বদাই আত্মার কল্যাণকর কিছু না কিছু অনুষ্ঠান নিয়ে সময় অতিবাহিত কর্‌বে।

৩। "বিরক্তি"—সকল বিষয়েতেই তার বৈরাগ্য, বিষয়ে অনাসক্ত ভাব জন্মিবে।

৪। "মানশূন্যতা"—গর্ব্ব অভিমানাদি কিছুই তার থাক্‌বে না।

৫। "আশাবদ্ধসমুৎকণ্ঠা"—ভগবৎকৃপালাভ এবং নিজের অভিলষণীয়-বস্তুপ্রাপ্তি বিষয়ে একটা খুব দৃঢ় বিশ্বাস থাক্‌বে। ইষ্টবস্তুলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই একটা ব্যস্ততা থাক্‌বে।

৬। "নামগানে সদারুচিঃ"—ভগবানের নাম কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই অভিলাষ হবে, আনন্দ হবে।

৭। "আসক্তি স্তদ্‌গুণাখ্যানে"—ভগবানের গুণ কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই সে অনুরক্ত থাক্‌বে।

৮। "প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে"—ভগবানের বসতি স্থলে কেহ কেহ বলেন বিগ্রহ প্রতিমা ও তীর্থাদিতে, আবার কেহ কেহ বলেন সমস্ত চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সর্ব্বভূতে—তার প্রীতি ও ভালবাসা হবে।

"ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে"। ভাবের অঙ্কুরমাত্র যার জন্মেছে, এ সকল লক্ষণ পূর্ব্বেই তার হবে। ভাব কি একটা তামাসার কথা? চক্ষের একটু জল পড়্‌লেই ভাব হ'লো?

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচি স্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

সর্ব্বপ্রথমেই শ্রদ্ধা ; শাস্ত্রে ও সদাচারে বিশ্বাস। শাস্ত্র সদাচারে বিশ্বাস জন্মিলেই সাধুসঙ্গের অধিকার হয়। শাস্ত্র সদাচারের অনুসরণ ক'রে, সাধুরা কিরূপ জীবন লাভ করেছেন, কি প্রকার শান্তিতে, আরামে, আনন্দে দিন যাপন কর্‌ছেন, এ সমস্ত দেখে শুনে সাধুদের মত জীবন লাভ কর্‌তে একটা আকাঙ্ক্ষা হয়, আগ্রহ হয়। এ প্রকার হ'লেই, তখন ভজন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর্‌তে কর্‌তে, সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হ'য়ে যায়। অন্তরে কোনও প্রকার অনিষ্টকর, প্রতিকূল অবস্থাই আর থাকে না, ভজনেতে ক'রে সমস্ত নষ্ট হ'য়ে যায়। এসব হ'য়ে গেলে তার পর ভাব। এই ভাবের পরে ভক্তি, তার পর প্রেম। ভাব বৃক্ষ, ভক্তি পুষ্প, প্রেম সুপক্ক ফল। এ সকল বহুদূরের কথা।"

প্রশ্ন—"অশ্রুকম্পপুলকাদি যে হয়, তাহা কি ভাব নয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"ওসব ভিতরের একটা অবস্থার বিকাস বটে, কিন্তু অশ্রু কম্প হ'লেই তার এসব ভাব হয়েছে, এরূপ যে মনে কর্‌তে হবে, তার কোনও অর্থ নাই। কোন্ ভাব উপস্থিত হ'লে, চখের জল ঐ সময়ে কোন্ দিক্ দিয়ে, কি ভাবে পড়্‌বে, কোন্ ভাবের চ'খের জলের স্বাদ কিপ্রকার হবে, তা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন ক'রে শাস্ত্রকর্ত্তারা, ভক্তির দর্শনশাস্ত্রে মীমাংসা ক'রে গেছেন। অভ্যাসের দ্বারাও ত অনেকে অশ্রুকম্পপুলকাদি আরম্ভ ক'রে থাকেন।"

গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও মহাপুরুষের লক্ষণ।

প্রশ্ন—"মশায়! অনেকে বলেন, গুরুকরণ না হ'লে ধর্ম্মলাভ করা যায় না। এ বিষয়ে আপনার মত কি?"

ঠাকুর বলিলেন—"মতামতের কথা আমি কিছু জানি না ; বল্‌তেও পারি না। তবে আমি এ কথা নিশ্চয়রূপে জেনেছি যে, গুরু ব্যতীত ধর্ম্ম কখনও লাভ হ'তে পারে না। সামান্য একটা কিছু জান্‌তে হ'লে, সামান্য একটু শিক্ষালাভ করতে হ'লে, গুরুর প্রয়োজন হয় ; গুরু ব্যতীত হবার যো নাই। আর সর্ব্বাপেক্ষা যে বিষয়টি দুর্ব্বোধ, গুরু ব্যতীত অনায়াসে তা লাভ হবে, এ কখনও হয় না।"

প্রশ্ন—“পশু, পক্ষী, মনুষ্য—সকলেরই ত কার্য্য দেখিয়া শিক্ষালাভ হইতেছে; সাধারণ ভাবে সকলেই ত গুরু, তবে বিশেষভাবে একজন মানুষকে ধরা কেন?”

ঠাকুর বলিলেন—“বিশেষভাবে একটি মানুষকেই ধরতে হবে। একটি বিশেষ ব্যক্তিতে গুরুত্ব স্থাপন করতে পারলেই প্রকৃত গুরু লাভ হয়। তখন সমস্ত পদার্থই গুরুময় হ'য়ে যায়। এরূপটি হ'লে সাধারণ গুরুভাব আর থাকে না।”

প্রশ্ন—“কিরূপ অবস্থার লোককে গুরু করিতে হয়?”

ঠাকুর—“যাঁতে ভগবানের চিৎ শক্তির বিলাস হয়, যাঁতে তাঁর জ্ঞান শক্তির প্রকাশ হয়, তিনিই গুরু। গুরু অন্য কেহ হ'তে পারে না। মহাপুরুষেরাই গুরু।”

প্রশ্ন—“আমাদের ত অন্তর্দ্দৃষ্টি নাই, বাহিরের কি কি লক্ষণ দ্বারা আমরা মহাপুরুষদের বুঝিতে পারিব?”

ঠাকুর বলিলেন—“সাধারণতঃ এই পাঁচটি লক্ষণ দ্বারা মহাপুরুষদের চেনা যায়।

প্রথমতঃ—মহাপুরুষেরা কখনও আত্মপ্রশংসা করেন না; কার্য্যদ্বারা বা অন্য কোন প্রকারেও নিজেকে বড় ব'লে জানান্ না।

দ্বিতীয়তঃ—মহাপুরুষেরা কখনও পরনিন্দা করেন না।

তৃতীয়তঃ—মহাপুরুষেরা কখনও বৃথা সময় নষ্ট করেন না; আত্মার কল্যাণকর, কোনও একটা অনুষ্ঠানে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন।

চতুর্থতঃ—মহাপুরুষেরা সর্ব্বজীবে দয়া করেন; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি, বৃক্ষলতার পর্য্যন্ত দুঃখে সহানুভূতি করেন; অন্যের সমস্ত অবস্থা নিজের ব'লে অনুভব করেন; কাহারই একটা উদ্বেগের কারণ হন না।

পঞ্চমতঃ—মহাপুরুষেরা সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন; কখনও কোনও কারণে চঞ্চল হন না।”

মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বান।

এ সকল কথা শেষহইতে হইতেই, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শমূর্ত্তি প্রাতঃস্মরণীয় ধার্ম্মিকপ্রবর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদেশানুসারে, তাঁহার অনুগত সেবক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়, ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয়, ঠাকুরের কুশলাদি প্রশ্ন করিয়া বলিলেন—"মহর্ষি অসুস্থ, কাণে ভাল শোনেন না, দৃষ্টিশক্তিও খুব কমিয়া গিয়াছে; আপনি কলিকাতায় আছেন শুনিয়া, আপনাকে দেখিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া, আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। তাঁর কতকগুলি কথা, আপনাকে তিনি বলিতে ইচ্ছা করেন।" শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শেষহইতে না হইতেই, ঠাকুর মহর্ষিকে উদ্দেশ করিয়া, করজোড়ে নমস্কার করিতে করিতে বলিলেন—"**আমার পরম সৌভাগ্য যে, তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন। আমি তাঁকে দর্শন কর্‌তে যাব। কখন গেলে তাঁকে দর্শনের সুবিধা হবে।**"

শাস্ত্রী মহাশয় বেলা তিনটাহইতে পাঁচটার মধ্যে সময় নির্দ্দেশ করিলেন। ঠাকুরও ঐ সময়েই তথায় উপস্থিত হইবেন বলিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যার সময় চলিয়া গেলেন। আমাদেরও সন্ধ্যাকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

মহর্ষির সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎকার—মহর্ষির ভাব ও উপদেশ।

২১শে অগ্রহায়ণ, রবিবার; ৬ই ডিসেম্বর।

আজ গুরুভ্রাতারা, ঠাকুরের সঙ্গে মহর্ষিকে দর্শন করিতে যাইবেন, সকলেরই মনে কত আনন্দ! আমি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া, অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে ঠাকুরের নিকটে নিজ আসনে বসিয়া, ভাবিতে লাগিলাম—"আমার ভাগ্যে বুঝি মহর্ষির দর্শন ঘটিবে না! যে সময়ে সকলে মহর্ষির নিকট যাইবেন, আমার তখন আহারের সময়। একদিন উপবাস করিয়া থাকিতে আমি কোন কষ্টই মনে করি না, কিন্তু আহার ত আমার শুধু আহার নয়! উহা ঠাকুরের আদেশমত, আমার সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত একটি বিশেষ নিয়ম। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে, ঠাকুর কি অসন্তুষ্ট হইবেন না? ঠাকুরকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও আমার সাহস হয় না। এখন কি করি?" এই প্রকার ভাবিয়া, ঠাকুরের নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ঠাকুরের নিয়মিত পাঠ শেষ হইলে, এগারটার সময় আমাকে নিজ হইতেই বলিলেন— "কি, আজ তুমি কি করবে? রান্না না ক'রে একমুঠো প্রসাদ পেয়ে নিলে হয় না?"

আমি শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়া বলিলাম, "আমি কখনও মহর্ষিকে দর্শন করি নাই, যেতে বড় ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর—"তা হ'লে প্রসাদই দু'টা পেয়ে নিও।"

আমার সুবিধামত ব্যবস্থা ঠাকুর নিজ হইতেই করিলেন দেখিয়া, আনন্দে আমার কান্না আসিল। যথাসময়ে প্রসাদ পাইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

আজ রবিবার। স্কুল, কলেজ, আদালতাদি বন্ধ বলিয়া, অনেক গুরুভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা দু'টার পর, তের চৌদ্দজন গুরুভ্রাতা, ঠাকুরের সঙ্গে চলিলেন। প্রায় তিনটার সময় আমরা পার্কষ্ট্রিটে মহর্ষির ভবনে পঁহুছিলাম। দেখিলাম, মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, সম্মুখের হলঘরে রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়াই, খুব আদর করিয়া, ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। এবং মহর্ষিকে, সশিষ্যে ঠাকুরের আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। মহর্ষি ঐ সময় ধ্যানাবস্থায় ছিলেন বলিয়া, আট দশ মিনিট কাল নীচের ঘরেই আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়া মাত্রেই, মহর্ষি সকলকে উপরে যাইতে সংবাদ দিলেন, ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা সকলেই যাইয়া মহর্ষির নিকটে উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম, প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যস্থলে একখানা 'ইজি-চেয়ারে' মহর্ষি অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থায় রহিয়াছেন। দক্ষিণে ও বামে দু'খানা চেয়ার রহিয়াছে এবং তাহারই নিকটে দু'খানা লম্বা বেঞ্চ এমন ভাবে রাখা হইয়াছে যে, তাহাতে বসিয়া সকলেই মহর্ষিকে দর্শন করিতে পারেন। ঠাকুর দুই বেঞ্চের মধ্যস্থলে যাইয়া নমস্কার করিয়া, মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে পবিত্রমূর্ত্তি বৃদ্ধ মহর্ষির শুভ্র মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক, মস্তক ঘন ঘন কম্পিত করিয়া, গদগদ স্বরে "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়, গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ।" পুনঃপুনঃ বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, গণ্ডস্থল ভাসিয়া অশ্রুধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। ঠাকুরও ভাবাবেশে যেন অবশাঙ্গ হইয়াই মহর্ষির বামভাগস্থিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ঠাকুর ও মহর্ষি উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আমরাও সকলে ঐ সময়ে মহর্ষিকে ভূমিতে

পড়িয়া প্রণাম করিলাম এবং উভয় পার্শ্বস্থ লম্বা বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির দক্ষিণ দিকের চেয়ারে বসিয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া, মহর্ষি তাঁহাকে বলিলেন, 'ইঁহাদের দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে, ইঁহারা কে?' শাস্ত্রী মহাশয়, মহর্ষির কাণের কাছে মুখ রাখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ইঁহারা সকলেই গোঁসাইয়ের শিষ্য।"

মহর্ষি বলিলেন, "মানুষ যখন একটা উৎকৃষ্ট খাবার বস্তু পায়, শুধু নিজে না খাইয়া অন্যান্যকেও উহা দিতে ইচ্ছা করে, ইনিও সেইরূপ নিজে যাহা ভোগ করিতেছেন, শিষ্যদিগকেও তাহা দিতেছেন; ইহাতে ওঁর বিন্দুমাত্রও স্বার্থ নাই, শিষ্যদের কল্যাণই আকাঙ্ক্ষা করেন। ইনিই ধন্য, ইনিই যথার্থ শিষ্যদের সন্তাপহারক। ইঁহার দর্শনে প্রাচীন ঋষিদের ভাবই প্রাণে জাগ্রত হয়।" এ সকল কথার পর, ঠাকুরের কুশল প্রশ্ন করিয়া, বোলপুরের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বলিলেন, "বোলপুরে একটি আশ্রম হইয়াছে। শীঘ্রই উহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য হইবে। সশিষ্যে তুমি ঐ উৎসবে যোগদান করিলে বড়ই আনন্দিত হইব। ঐ আশ্রমটির প্রয়োজন এবং নিয়মপ্রণালী কিরূপ হওয়া তুমি ভাল মনে কর, জানিতে ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর বলিলেন—"ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আশ্রম আছে। তাই সাধু সন্ন্যাসীরা ঐ সকল দেশে যাতায়াতে কোনও অসুবিধা বোধ করেন না। কিন্তু বঙ্গদেশে ঐ প্রকার কোন ধর্ম্মাশ্রম নাই বলিলেই হয়। যে দুই একটি আছে—তাহাও সম্প্রদায় বিশেষের। সকল ধর্ম্মার্থিগণ একটা স্থানে আশ্রয় পেয়ে, আপন আপন ভজন সাধন অবাধে করতে পারেন, এরূপ একটি স্থানের বড়ই প্রয়োজন মনে হয়। শান্তিনিকেতন যদি সাধু সন্ন্যাসী, ফকির দরবেশাদি, সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভগবদুপাসকগণের শান্তির সাধারণ স্থান হয়, তবে বড়ই কল্যাণ হয়। দেশের একটা যথার্থ মঙ্গল হয়। অসাম্প্রদায়িক ভাবের আশ্রম কোথাও দেখা যায় না। দেশে এটির বড়ই অভাব।"

মহর্ষি, ঠাকুরের কথা শুনিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধু! সাধু!! বাস্তবিক যাহাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম, তাহাদের কথায় অন্তরকে স্পর্শ করে, প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। যথার্থ সাধুর কথা এইরূপই হয়। না হ'লে কথা ভাসা ভাসা হ'য়ে যায়।

তুমি যে রকম বলিলে তাই হওয়া ঠিক, ইহা সত্য। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ভার যাঁহাদের উপর রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মতের অনৈক্যে গোলমাল চলিতেছে। তোমার এই অসাধারণ উদার ভাব, কখনও তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমার অন্তরের কথা আমি কাহাকেও বলি না, কেহ উহা বুঝে না। তুমি বুঝিবে, তাই তোমাকে আজ প্রাণের কথা বলিয়া ঠাণ্ডা হইব।" এই বলিয়া, মহর্ষি নিজ জীবনের কথার সঙ্গে, হাফেজের কবিতা মধ্যে মধ্যে আওড়াইয়া, তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া মহর্ষি চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"ভগবান্‌কে যেমন ভাবে পাইতে আকাঙ্ক্ষা, তেমন ভাবে পাইতেছি না। সময় সময় তিনি দয়া করিয়া দর্শন দিয়া বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হইয়া যান, যতক্ষণ আবার সেই প্রেমময়ের উজ্জ্বল রূপ দর্শন না পাই, উন্মত্তের মত থাকি, প্রাণ আমার ধড়্‌ফড়্ করে, সময় যে কি ভাবে কাটাই, তিনিই জানেন। তিনি দয়া করিয়া দর্শন না দিলে, কি আর করিব! জ্ঞানের দ্বারা কখনও তাঁকে লাভ করা যায় না, জ্ঞান একটা কথার কথা মাত্র। যথার্থ প্রেম ভক্তিই তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। তাহা ত আর চেষ্টাসাধ্য নয়। তাঁরই দয়ায় হয়; "পুরুষকার" অর্থশূন্য কথা। তাঁর চরণে নির্ভরই সার। শ্বেত অশ্বমেধের ঘোড়া করিয়া, তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়াছেন। তাঁর এই বাক্যই ভরসা করিয়া তাঁর দয়ার দিকে চাহিয়া পড়িয়া আছি।" এই বলিয়া মহর্ষি বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর "**জয় গুরু, জয় গুরু,**" বলিতে লাগিলেন। একটু পরে, চোখ্‌মুখ মুছিয়া, মহর্ষি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, "যে ক্ষেত্রে ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হয়, পূর্ব্ব হইতেই তার লক্ষণ দেখা যায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন, এই চারিটি একসঙ্গে না থাকিলে প্রকৃত সত্য বস্তু, ষোলআনা ধর্ম্ম, লাভ হয় না। তোমাতে এই চারিটি উপযুক্ত রূপে রহিয়াছে। বিশুদ্ধ অদ্বৈত প্রভুর বংশে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়াছ, তাঁর কৃপায় প্রকৃত সংশিক্ষা, সদুপদেশ পাইয়াছ। তার পর, মনুষ্য-চেষ্টায় সাধন ভজনও যতটা সম্ভব, তাহাও পূর্ণ মাত্রায় তুমি করিয়াছ, সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপা, তাহাও তোমার প্রতি যথেষ্ট রহিয়াছে। তুমিই ধন্য।" এই বলিয়া মহর্ষি সংস্কৃত একটি শ্লোক পড়িলেন—

"কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতীচ তেন।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ঃ॥"

"তুমি যাহাই কর, যখন যেরূপ ভাবে চল, ভগবান্ তাহাই অতি সুন্দর দেখিতেছেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"আপনিই ত আমাকে হাতে ধ'রে মানুষ করেছেন। আমার সবই ত আপনা হ'তে। আপনিই ত আমার গুরু!"

ঠাকুরের কথা শেষহইতে না হইতেই, মহর্ষি একটু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা ঠিকই ব'লেছ, গুরু ত বটেই! তবে সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরুমশায়ের মত! ক, খ শিখিতে হইলে প্রথম যেমন ছেলেদের গুরুমশায়ের নিকটে শিখিতে হয়, পরে ঐ ছেলেরাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পাইয়া, ঐ গুরুমশায়েরও' গুরুর উপযুক্ত হয়। এখন পাঠশালার গুরুমশায়কে গুরু বলিলে যেমন হয়, তোমার বলাও ঠিক সেইরূপই হইতেছে।" ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। মহর্ষি এই প্রকার নানা কথা তুলিয়া, ঠাকুরের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন গাত্রোত্থান করিয়া, মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া, বলিলেন—

"আমি আপনার বালক, আমাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।"

মহর্ষি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারি না, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হউক।"

আমরাও সকলে একে একে মহর্ষির চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করতঃ বাসায় ফিরিতে প্রস্তুত হইলাম। মহর্ষি খুব হৃষ্টান্তঃকরণে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের মঙ্গল হইবে, গোঁসাইকে তোমরা কখনও ছাড়িও না, ইনি তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন।"

মহর্ষির নিকটহইতে বাহির হইবার পরেই, গুরুভ্রাতা শ্রীচরণ বাবু, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনেছি সদ্‌গুরুর কৃপা না হ'লে এরকম অবস্থা খোলে না। মহর্ষির এ অবস্থা কিরূপে হ'ল?"

ঠাকুর বলিলেন—"মহর্ষির উপর সদ্‌গুরুর কৃপা হয় নাই, কে বল্‌লে?"

—:০:—

শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রভু। মহর্ষির প্রতি গুরুকৃপা! সগর্ভ ও বিগর্ভ সমাধি।

আমরা ঠাকুরের সঙ্গে, সিটি কলেজের 'প্রিন্সিপ্যাল' শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গুরু, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসায় পঁহুছিলাম। নবীন বাবু, অতি আগ্রহের সহিত আমাদিগকে বসাইয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিলাম আপনার সহিত নাকি

মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল? তিনি কি বলিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া বলিলে বিশেষ সুখী হইব।"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তাঁর দর্শন পেয়ে প্রথম আমার বাক্যস্ফুরণ হ'ল না, চরণতলে প'ড়ে কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম। কিছুক্ষণ পরে মনের আবেগ একটু শিথিল হ'লে, বল্‌লাম—'ঠাকুর, বড় ঘুরেছি।' তিনি বল্‌লেন, 'তোদের কুলেরই ত এই ধরম।' আমি বল্‌লাম—'দেব, দয়া ক'রে পুনরায় প্রকাশ হ'য়ে, কলির মলিন জীব সকলকে উদ্ধার করুন।' তিনি বল্‌লেন—'প্রকাশ হ'লে কে আর আমাকে এখন বিশ্বাস করবে। সে সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।' এইরূপ আরও কত কি বল্‌লেন।" ঠাকুর তৎপরে নবীন বাবুকে বলিলেন—"আমার যেন মনে হয়, তাঁকে সে ভাবে দরদ করবার তেমন কেহ ছিল না; থাক্‌লে আরও কিছুদিন তিনি থাক্‌তেন।"

নবীন বাবুর সহিত ঠাকুরের আরও মহাপ্রভুসম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সন্ধ্যার পর আমরা বাসায় পঁহুছিলাম।

রাত্রিতে খুব সঙ্কীর্ত্তন হইল, মহর্ষির সম্বন্ধে আজ অনেক কথাবার্ত্তা হইল। নগেন্দ্র বাবুর প্রশ্নে ঠাকুর বলিলেন, "মহর্ষি যখন হিমালয়েতে সাধন কর্‌তেন, তখন একদিন একটি হিমালয়পর্ব্বতনিবাসী মহাপুরুষ, দৃষ্টিদ্বারা মহর্ষির ভিতরে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। মহাপুরুষের কৃপার পর হ'তেই, মহর্ষির অবস্থা খুলে গেছে, ভগবদ্‌ধ্যানে মহর্ষির সমাধি হয়।"

প্রশ্ন—"ভগবৎ ধ্যান ব্যতীতও সমাধি হয় কি?"

ঠাকুর—"সমাধি দুই প্রকার। সগর্ভ ও বিগর্ভ। বায়ুরোধ পূর্ব্বক শরীর স্থির রেখে যে সমাধি হয়, সে বিগর্ভ সমাধি; তাতে কোন উপকারই হয় না। বাজিকরেরাও কুম্ভক ক'রে ঐ প্রকার সমাধি করে। ধর্ম্ম কর্ম্মের সহিত ওর কোনও সম্বন্ধই নাই। যোগবাশিষ্টে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। একদিন বশিষ্ঠ দেব রামচন্দ্রকে নিয়ে, একটি নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হ'য়ে, মাটি খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে একটি পাকা কুঠরী পেলেন; উহার ভিতরে প্রবেশ ক'রে রামচন্দ্রকে দেখালেন, একটি লোক শূন্যে অবস্থান করছে। বশিষ্ঠদেব তার চৈতন্য সঞ্চার করবামাত্রই,

সে তিনপাক ঘুরে, তানা না-না-না ক'রে হাত পেতে—'মহারাজ! রূপিয়া দেও' প্রার্থনা করল। বহুকাল পূর্ব্বে, সে অর্থ প্রত্যাশায়, কুম্ভক যোগে সমাধিস্থ হ'য়ে, শূন্যে কি প্রকারে অবস্থান করতে হয়, তাই দেখাচ্ছিল। কোনও প্রকারে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়, তার কুম্ভক আর ছুটল না। রাজার রাজত্ব গেল, বাড়ী অরণ্য হ'য়ে গেল, কিন্তু তার ঐ সমাধি আর ভাঙ্গল না। বশিষ্ঠদেব তার জ্ঞান সঞ্চার করবামাত্রই, পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে, সে সেই রাজাকে অনুমান ক'রে, শ্রীরামচন্দ্রের নিকট "রূপিয়া দেও" প্রার্থনা করল। মুদ্রা ক'রে, কুম্ভক ক'রে, হঠযোগের নানা প্রকার প্রণালী ক'রে, যে সমাধি হয় তা কিছুই নয়। ভগবৎ চিন্তার সহিত যে সমাধি, তা-ই প্রকৃত সমাধি।

যাঁরা ভগবানের সঙ্গে যোগ আকাঙ্ক্ষা করেন, সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য বা শক্তিকেই তাঁরা নিতান্ত অনর্থ মনে ক'রে ত্যাগ করেন। সমস্ত ঐশ্বর্য্য দাসীর মত সর্ব্বদা তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে, কিন্তু তাঁরা একবার ফিরেও সে দিকে চান না। যথার্থ যোগ লাভ করতে হ'লে, বীর্য্য ধারণ করতে হয়। সত্য কথা না বললে, বীর্য্য ধারণ হয় না। সত্য কথা বলতে হ'লে, বাক্য সংযম করতে হয়। প্রায় মৌনই হ'তে হয়। আজকাল রাজযোগ বড়ই কঠিন। এতে কৃত-কার্য্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভক্তিযোগই এ সময়ের উপযোগী, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কিছুই হবার যো নাই।"

সমস্ত অবতার—পূর্ণভগবান্। আনুসঙ্গিক প্রশ্ন।

২২শে অগ্রহায়ণ।

আজ অবতারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"কোন কোন সময়ে বিশেষ কোন প্রয়োজনে, ভগবানের শক্তি, ব্যক্তি বিশেষের ভিতর দিয়ে কার্য্য করে দেখা যায়, তাহাই অবতার। ঐ কার্য্যটি শেষ হ'য়ে গেলেই, ঐ ব্যক্তিতে ঐ শক্তি আর থাকে না। তখন আর সে

অবতারও নয়। যেমন 'পরশুরাম' বিশেষ একটা সময়ের জন্য অবতার। আবার যাবজ্জীবন অবতারও থাকে, যেমন 'রামচন্দ্র'। অংশ, কলা, আবির্ভাব, আবেশাদি বহুপ্রকার অবতার আছে। অবতার সর্ব্বদাই পূর্ণ, কারণ ভগবৎশক্তির প্রকাশই অবতার। ভগবান্ সর্ব্বদাই পূর্ণ। তবে তাঁর অংশ, অংশাংশ ইত্যাদি বল্‌বার তাৎপর্য্য এই যে, কোথাও জ্ঞানের কার্য্য, বীর্য্যের কার্য্য, কোথাও বা ভক্তির কার্য্যই দেখা যায়। ভগবান যে কার্য্যে যতটুকু শক্তি প্রকাশ করা আবশ্যক বুঝেন, ততটুকুই মাত্র করেন, তাই ব'লে অন্যশক্তি তাতে নাই, বলা ঠিক নয়। পূর্ণ মাত্রায়ই আছে, প্রকাশ করেন না মাত্র। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি কোন ক্ষেত্রে ভগবৎ শক্তির আবেশ হয় তথায় পূর্ণ শক্তিই র'য়েছে বুঝ্‌তে হবে। ভগবান্ কোথাও অপূর্ণ নন্, সর্ব্বত্র সকল অবস্থায়ই পূর্ণ। অবতার সমস্তই পূর্ণ, যতটুকু প্রকাশ ততটুকুই লোকে জানে মাত্র।"

সাকার ধ্যানে ভগবানকে লাভ করা যায়, না নিরাকার ধ্যানে? কোন্ মত ঠিক জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর বলিলেন—"মত একটা কিছু নয়। ওসব মতামতে হয় না। সাকার ধ্যানই কর, আর নিরাকার ধ্যানই কর, যা-ই কর, কিছুতেই ভগবানকে লাভ করা যায় না। তিনি স্বপ্রকাশ, নিজে দয়া ক'রে যখন প্রকাশ হন, তখনই তাঁকে জানা যায়। চিত্তশুদ্ধ না হ'লে, তাঁর প্রকাশ ধরা যায় না। সাধন ভজন যাই কর না কেন, আগে চিত্তশুদ্ধিটি চাই; চিত্তশুদ্ধ না হ'লে, ভগবানের প্রকাশ হয় না। প্রথমে চিত্ত শুদ্ধ কর।"

শরীরটিকে নীরোগ ও দীর্ঘকালস্থায়ী কি উপায়ে রাখা যায় জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর বলিলেন—"শরীরটিকে নীরোগ ও দীর্ঘকালস্থায়ী রাখ্‌তে হ'লে, আহারের পরিমাণ ও সময় ঠিক রাখ্‌তে হয়। বীর্য্যধারণই মূল, কিন্তু ঐ নিয়ম দু'টির রক্ষা না হ'লে, বীর্য্যধারণও ঠিক মত হয় না। পূর্ব্বে যোগী ঋষিদের সকলেরই এদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁরা কখনও ঐ নিয়ম দু'টির অন্যথা কর্‌তেন না।"

—

কালীঘাটে কালী দর্শন—উদাসী সাধু দর্শন—স্পর্শ করা বিষয়ে উপদেশ।

আজ ঠাকুর, আমাদের সকলকে লইয়া, কালীঘাটে কালী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কালী-মন্দিরে লোকের খুব ভিড় ছিল। ঠাকুরকে পাণ্ডারা খুব আগ্রহ ও যত্নের সহিত ভিতরে লইয়া গেলেন—সঙ্গে মাত্র আমরাই রহিলাম। কোন প্রকার অসুবিধাই হইল না। কালীকে মালা ও ডালী দিয়া, নমস্কার করিতে করিতে, করজোড়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে, ঠাকুর যখন 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তখন ঠাকুরের আধ কান্নাস্বরে আমাদেরও প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। কালীর নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া, ঠাকুরের আপাদমস্তক থর্‌থর্ কাঁপিতে লাগিল। ঠাকুর এদিকে ওদিকে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন, আমরা অতি সাবধানে ঠাকুরকে বাহিরে লইয়া আসিলাম। দলে দলে লোক আসিয়া, ঠাকুরের চরণধূলি লইতে লাগিল, লোকের ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুরকে লইয়া আমরা রাস্তায় আসিলাম। একটু চলিয়াই, ঠাকুর একটি 'রকে' বসিয়া পড়িলেন। এবং বলিলেন—"**জগন্নাথের রূপের সহিত, এই কালীর রূপের সাদৃশ্য আছে, মা'র কত দয়া! সকলকেই মা দয়া কর্‌ছেন।**"

২৩শে অগ্রহায়ণ।

কালীর মাহাত্ম্য বলিতে বলিতে, ঠাকুর ভাবাবেশে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে, একটি বৃদ্ধা কাঙ্গালিনী আসিয়া, ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বাবা! আজ আমার জন্ম সার্থক। আর আমার কিছু নাই; একটি পয়সা মাত্র আছে, এইটিই তুমি দয়া ক'রে নেও," এই বলিয়া বুড়ী পয়সাটি ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর খুব আগ্রহের সহিত উহা হাতে লইয়া, মস্তকে কিছুক্ষণ ধারণ করিয়া রহিলেন, পরে মহেন্দ্র বাবুর হাতে দিলেন। পাছে না নেন, তাই বলিলেন—"**অযাচিত দান অগ্রাহ্য কর্‌তে নাই, এই পয়সাটি আপনার কন্যাকে দিবেন।**" মহেন্দ্র বাবু যত্ন করিয়া রাখিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াই, ঠাকুর অকস্মাৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি বটগাছের ধারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কয়েকটি সন্ন্যাসী, আপন আপন আসনে বসিয়া, ধুনি তাপিতে ছিলেন। একটি সৌম্যমূর্ত্তি, ভস্মাবৃতাঙ্গ, ভজনানন্দী সন্ন্যাসীকে, ঠাকুর নমস্কার করিয়া, কয়েকটি টাকা সেবার্থে দিয়া বলিলেন—"**এজন্যই ভগবান আজ আমাকে এখানে এনেছেন।**"

ঠাকুর, আশ্রম হইতে যাত্রা করিবার সময়েই, কয়েকটি টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, তাঁহাদের অযাচক বৃত্তি, দু'দিন একেবারে আহার জুটে নাই। সন্ন্যাসীটির প্রভাবে ঐ স্থানটি যেন অন্য প্রকার হইয়া রহিয়াছে। উদাস ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ, ঐ স্থানে পঁহুছিবামাত্রেই আমাদের কারও কারও পরিষ্কার অনুভব হইতে লাগিল। অল্প সময় ওখানে বসিয়াই, ঠাকুর বাসায় যাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। জ্বর হইল। অবিলম্বে গাড়ী করিয়া, আমরা তাঁহাকে লইয়া, বাসায় পঁহুছিলাম। নিয়মিত সন্ধ্যাকীর্ত্তনের পর ঠাকুর সুস্থ হইলেন। অধিক রাত্রিতে কথায় কথায় বলিলেন, "ভাবাবেশে থাক্‌লে অথবা অন্যমনস্ক থাক্‌লে, কখনও তাকে স্পর্শ কর্‌তে নাই। স্পর্শ কর্‌তে হ'লে, তিনবার ডেকে, তাকে জানায়ে, স্পর্শ কর্‌তে হয়। এখনও অনেক স্থলে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। হঠাৎ কেহ স্পর্শ কর্‌লে, তার সমস্তগুলি ভাব, দেহে সঞ্চার হয়। শরীরটি আগাগোড়া যেন জ্ব'লে যায়। এই নিয়ম, সাধারণের জানা নাই ব'লে, অনেক সময় অনেক উৎপাতে পড়্‌তে হয়।"

রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের আকাঙ্ক্ষা ও অনুরোধ।

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

কলিকাতার সুবিখ্যাত দানশীল, বিপুল ধনাধিপতি কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে, শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়, অদ্য বেলা দুইটার সময় ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় প্রতিমাসে সহস্র সহস্র টাকা ধর্ম্মার্থে দান করিতেছেন। উপযুক্ত পাত্রে অর্থ দান করিয়া, তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। আপনার সম্বন্ধে, তিনি অনেক কথা লোকমুখে শুনিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। আপনাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁর বড়ই আগ্রহ জন্মিয়াছে। আপনার নির্দ্দিষ্ট আয় কিছুই নাই, অথচ অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তানেরা, বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মলাভ আকাঙ্ক্ষায়, আপনার আশ্রয় লইয়া, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন; আকাশবৃত্তির উপরই আপনার সম্পূর্ণ নির্ভর। তাই ঠাকুর মহাশয়, আপনার নিকটে আমাকে পাঠাইয়া, এই বিষয় জানাইতে বলিলেন যে, তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা একলক্ষ টাকা আপনাকে তিনি উৎসর্গ করেন, এবং ধর্ম্মার্থে আপনার ইচ্ছামত তাহা ব্যয়িত হয়। আপনার অবসর মত, অনুগ্রহ করিয়া, একবার যদি তাঁহার বাড়ী গিয়ে, তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায় আপনাকে জানাইয়া, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ টাকা আপনার হাতে অর্পণ করেন। এখানে আগন্তুক লোকের সমাগম সংবাদ এবং যাঁহারা সর্ব্বদা আছেন, তাঁহারা কিরূপ অবস্থার লোক আর কি প্রকার অভাবে থাকিয়াও তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তে আছেন ইত্যাদি তিনি বিশেষ ভাবে জ্ঞাত আছেন।"

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা শুনিয়া, ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল; মুখটি স্ফীত ও আরক্ত হইয়া উঠিল; ঠাকুর করজোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিয়া, বলিতে লাগিলেন—"**ঠাকুর মহাশয়কে বলিবেন—আমার এখানে যা যথার্থ প্রয়োজন, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে, ভগবান তা প্রতিদিন দিয়ে থাকেন। একটি কাণাকড়িরও অভাব রাখেন না, তাঁরই দ্বারে দীনহীন কাঙ্গাল হ'য়ে, তাঁর নাম নিয়ে, যেন প'ড়ে থাক্‌তে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর্‌তে বল্‌বেন. তিনি ঐ টাকা ধর্ম্মার্থে যথায় ইচ্ছা দিতে পারেন। আমি তা গ্রহণ কর্‌লে, আমার বিশেষ অনিষ্ট হবে মনে করি। বড়লোকের বাড়ী যেতে আমার ভয় হয়।**"

বিদ্যারত্ন মহাশয়, আর এই কথার কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, পরে চলিয়া গেলেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়, বহু সাধুকেই মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ও খুব সদ্ভাবে এই কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন।

ছোট দাদার সেবা—ঠাকুরের অশ্রু।

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

আমরা কলিকাতা পঁহুছিতেই দ্বারভাঙ্গাহইতে পত্র আসিল, শান্তিসুধা তথায় অতিশয় পীড়িতা, দাউজীও রক্ত আমাশয় রোগে খুব ভুগিতেছেন। ঠাকুর এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রেই, যোগজীবনকে তথায় পাঠাইয়া, শান্তিসুধাকে এখানে আনাইয়াছেন। শান্তিসুধা কয়দিন বৃন্দাবন বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া, এখানে আসিয়াছেন। এখন প্রবল জ্বরে ও পেটের অসুখে তিনি মরণাপন্ন, এখানে সেবা শুশ্রূষা করিবার কেহই নাই। আমরা সকলেই তাঁহার অবস্থা দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু কি করিব! সাংসারিক আরাম আনন্দ, সুখভোগ, বিষময় জ্ঞান করিয়া, শুধু ঠাকুরের অমৃতময় সঙ্গলাভেই আমরা মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। এখানে রোগীর উৎপাত ঘাড়ে লইয়া, বিষ্ঠা মূত্র ঘাঁটিতে ভাল লাগিবে কেন? সুতরাং আমরা অনেকেই রোগীহইতে তফাৎ থাকিয়া, রোগীর সেবা শুশ্রূষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, এই প্রকার

কর্ত্তব্য বুদ্ধির উপদেশই একে অন্যকে দিতেছি মাত্র। এদিকে শান্তিসুধার অবস্থাও ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে।

ছোট দাদা কলিকাতায় থাকিয়া এম, এ, ও আইন পড়িতেছেন। তাঁহার অবসর বড়ই কম; তথাপি ঠাকুরের সঙ্গলাভের লোভ ত্যাগ করিতে না পারিয়া, ঝামাপুকুরহইতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও আসিয়া, প্রত্যহ ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যাইতেছেন। শান্তিসুধার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কান্দিয়া উঠিল, তিনি সকল দিকের প্রয়োজন, এমন কি ঠাকুরের সঙ্গ-লাভের আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, অসামান্য ধৈর্য্য সহকারে, প্রায় অর্দ্ধক্ষিপ্তা, উৎকটপীড়িতা শান্তিসুধার সেবায় একটানা নিযুক্ত রহিলেন। সন্তুষ্টচিত্তে বিকারী রোগীর বিষম উৎপাতে স্থির থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন এবং নির্ব্বিকার ভাবে বিষ্ঠা মূত্র বমি দুই হাতে পরিষ্কার করিতেছেন দেখিয়া, গুরুভ্রাতারা সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ঠাকুর সর্ব্বদাই পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে থাকিয়া, শান্তিসুধার সমস্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আজ প্রসঙ্গক্রমে, ছোট দাদার সেবা-পারিপাট্য বিষয়ে কথা তুলিয়া, কান্দিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—"**যথার্থ মায়ের মত দরদ্ ক'রে, রোগীর প্রাণে যা চায় সেটি বুঝে, সেবা শুশ্রূষা কর্‌তে সারদাই পারেন। ওঁর স্পর্শে প্রাণ শীতল হ'য়ে যায়; এক ঘটী জল যে সারদা দেন, তাতেও যেন সমস্তটি প্রাণ ঢেলে দেন। সেবা অনেকেই করেন বটে, কিন্তু এমনটি আর দেখা যায় না।**"

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে, গদগদ ভাবে, ছোট দাদার সেবাকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন শুনিয়া, আমার নিজ জীবনে ধিক্কার আসিল। ভাবিলাম, হায়, কবে এমন দিন আসিবে যে, ঠাকুর আমার সেবা দেখিয়াও এই প্রকার আনন্দ করিবেন! এত কাল এত সাধন ভজন করিয়া এবং ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁর যে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না, দুই পাঁচ দিন একটা রোগীর একটু সেবা করিয়া, অনায়াসে ছোট দাদা ঠাকুরের সেই প্রসন্নতা লাভ করিলেন। সকলই অদৃষ্টে করে!

এই সময় ঠাকুর নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন—"**স্বার্থ ও অভিমান নিয়ে যে সেবা সে এক প্রকার। দরদের সেবাই প্রকৃত সেবা। সেটি কি আর চেষ্টায় হয়, না যার তার হয়?**"

শান্তিসুধার সেবাকালে, ঠাকুরের কৃপা বিষয়ে ছোট দাদা তাঁর ডায়েরীতে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

" দু' হাতে বমি কাচাইতে কাচাইতে (পরিষ্কার করিতে করিতে), ওয়াক দিতে দিতে, গুরুজীর সাহায্য চাহিলাম, গুরুজীর কৃপায়—তাঁরই নামের গুণে, কিঞ্চিৎ হইল। হায়! হায়! নিজের কিছুই ক্ষমতা নাই। একটু সামান্য সেবা করিতে হইলেও গুরুজীর সাহায্য দরকার * * *। গুরুজীর অতিসুন্দর উজ্জ্বল মূর্ত্তি হৃদিমধ্যে প্রকাশিত হইল, * * * * * *। গুরুজী আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। নিমেষ-শূন্য নয়নে। * * আমি উহা এড়াইতে প্রয়াস পাইলাম।"

ঠাকুরের বিরক্তি।

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

ছোট দাদা ও কুঞ্জ বাবু রাত্রিতে ঠাকুরের পদসেবা করিয়া থাকেন। একদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, উঁহারা ঠাকুরের পদসেবায় যাইতে উদ্যোগ করিতেছেন, মহেন্দ্র বাবু উঁহাদের বলিলেন, " আমার মাথাটা টিপে দেও। " উঁহারা ভিতরে ভিতরে একটু বিরক্ত হইয়া, ব্যস্ততার সহিত, তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র বাবুর মাথা টিপিয়া দিয়া, উঠিলেন। মহেন্দ্র বাবু তৃপ্তিলাভ করিলেন না। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া, উঁহারা যেমন ঠাকুরের পদসেবার উদ্যোগ করিলেন, ঠাকুর খুব বিরক্তির সহিত ধমক দিয়া বলিলেন—" যাও, যাও, পা আর টিপ্‌তে হবে না, শুয়ে থাক গিয়ে। স'রে যাও। "

উঁহারা মহেন্দ্র বাবুর নিকট ত্রুটির এই ফল বুঝিয়া, লজ্জায় ও ভয়ে নির্ব্বাক্ হইয়া সরিয়া পড়িলেন।

কারও ক্লেশে উদাসীন থাকিয়া বা কারও প্রয়োজন অগ্রাহ্য করিয়া, ঠাকুরের সেবায় গেলে, প্রায় সর্ব্বদাই আমরা ঠাকুরের এ প্রকার বিরক্তি ভাব দেখি।

ভিতরে ত্রিভঙ্গ।

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

ঠাকুর, দিবারাত্রি ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া নিয়মপূর্ব্বক থাকাতে, আমাদেরও দৈনিক কার্য্য-গুলি নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে। সমস্তটি দিন কি প্রকারে যে চলিয়া যায়, বুঝিতে পারি না। সারাদিনে ঠাকুরের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া একটা কথা বলিবারও কেহ অবসর পায় না। রাত্রিতে আহারের পর, ঠাকুর কিছুকালের জন্য, শিষ্যবর্গের সঙ্গে, তাহাদেরই মত হইয়া গিয়া, হাসি গল্পে রাত্রি প্রায় বারটা পর্য্যন্ত অতি-বাহিত করেন। আর আর দিনের মত আজও, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ মহাশয় ও ছোট

দাদা ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর নানা কথা তুলিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। তখন অবসর বুঝিয়া ছোট দাদা ঠাকুরকে বলিলেন, "একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, দশভুজা ভগবতী আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, একেবারে মিলাইয়া গেলেন। তখন একটা অসীম শক্তি অনুভব করিলাম—ইহা কি সত্য ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ওহে বাপু, এসব স্বপ্ন কি আর স্বপ্ন ! এক ত্রিভঙ্গ আমার ভিতরে প্রবেশ ক'রে আমাকে ত্রিভুবন ঘুরাচ্ছেন। বাঁ'র হ'তে চেষ্টা ক'রে, তিনিও আর পার্‌ছেন না, (হাত দিয়া উভয় পার্শ্ব দেখাইয়া) এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে ঠেকে যাচ্ছেন। আর তোমার ভিতরে দশভঙ্গ, ক্রমে টের পাবে।"

ঠাকুর অন্য এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"আমার নামের অর্থ ঘুরে বেড়ান।"

কৃষ্ণের বিজয় অর্থাৎ কৃষ্ণের ঘুরে বেড়ান। ঠাকুরের কথার তাৎপর্য্য ইহাই কি না, জানি না।

স্বপ্ন-বিষয়ে কথা। ঠাকুরের রোগীর জন্য সহানুভূতি ও চিকিৎসা।

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখা বিষয়ে প্রশ্ন করায়, ঠাকুর বলিলেন—"অনেক সময় স্বপ্নেই মানুষের চরিত্রের পরীক্ষা হয়। স্বপ্নে যখন দেখ্‌বে নানাপ্রকার প্রলোভনে প'ড়েও চিত্ত স্থির আছে, কোনও দিকে বিচলিত হচ্ছে না, তখনই ঠিক। আর স্বপ্নে মানসিক একটু চঞ্চলতা হ'লেই বুঝ্‌বে, ভিতরের দুর্ব্বলতা যায় নাই। গুরুসম্পর্কে অথবা দেবতাসম্পর্কে যে সব স্বপ্ন দেখা যায়, তা সত্য ব'লে জান্‌বে। ওর ভিতরে অসংলগ্ন যা কিছু মনে হয়, তারও একটা তাৎপর্য্য থাকে। ভাল স্বপ্ন দেখা, একটা মহা সৌভাগ্যের বিষয়। বহুকাল সাধন ভজন ক'রে যে সব অবস্থা আয়ত্ত করা কঠিন হয়, এক মিনিটের স্বপ্নে, তা অনায়াসে লাভ হ'ল দেখা গিয়াছে। আমি যখন ডাক্তারী কর্‌তাম্, শক্ত রোগীদের জন্য চিন্তা হ'লে, প্রায়ই পরলোকগত দুর্গাচরণ ডাক্তার স্বপ্নে আমাকে ঔষধের কথা ব'লে যেতেন। রোগীদের তাতে অব্যর্থ উপকার হ'তে দেখেছি।"

এই বলিয়া ঠাকুর যে ভাবে রোগীদের সেবা ও চিকিৎসা করিতেন, বলিতে লাগিলেন; শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। একবার শান্তিপুরে বিষম মড়ক লাগিয়াছিল, তিন চারিবার দাস্ত বমি হইয়াই লোক মরিতে লাগিল, শান্তিপুরে ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল, সহরের লোক চারিদিকে পলাইতে লাগিল, ঠাকুর, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, দিবারাত্রি ঔষধের বাক্স হাতে লইয়া, রোগীদের বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারই কোন উপকার হইল না। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া একদিন রাত্রে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কাতরভাবে ঔষধের জন্য প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে পরলোকগত দুর্গাচরণ ডাক্তার মহাশয়, ঠাকুরকে আসিয়া বলিলেন, "অ্যাণ্টোনিনের সহিত এই কয়টি ঔষধ মিলাইয়া দাও, খাইলেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।" রাত্রি ৩টার সময় এই ব্যবস্থা পাইয়া ঠাকুর অমনি উঠিয়া বসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রোগীদের ঘরে ঘরে যাইয়া ঐ ঔষধ দিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ ঔষধ সেবনের পর আর একটি রোগীরও মৃত্যু হইল না।

ঠাকুরের শান্তিপুরে অবস্থান কালে, একদিন তিনি গঙ্গার অপর পারে একটি মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার্থে আহূত হন। রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ও তাহার সংসারের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রোগীকে ঔষধ দিয়া পরদিন সকালে আবার ঔষধ আনিতে তাহার বাড়ীর লোকদিগকে বলিয়া আসিলেন। কিন্তু ঐ দিন বিষম দুর্যোগ উপস্থিত হইল। সকালবেলা হইতেই খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঠাকুর, রোগীর বাড়ীহইতে কেহ ঔষধ লইতে আসিবে মনে করিয়া, উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইল, এদিকে ঝড় বৃষ্টি আরও ভীষণাকার ধারণ করিয়া, সহরটিকে লণ্ড ভণ্ড করিতে লাগিল। তখন তিনি রোগীর ক্লেশের অবস্থা মনে করিয়া, অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ঔষধের শিশিটি হাতে লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে, পার হইবার নৌকা নাই দেখিয়া, তিনি পরিধেয় বস্ত্রে ঔষধের শিশিটি জড়াইয়া মাথায় বাঁধিয়া লইলেন ও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সেই সময়ের প্রশস্ত ও ভয়ঙ্কর প্রবল গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, সাঁতার কাটিতে কাটিতে, অপর পারের কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উঠিলেন এবং তথাহইতে দুর্গম অজ্ঞাত পথে ঘুরিতে ঘুরিতে, রোগীর বাড়ীতে গিয়া পঁহুছিলেন। বাড়ীর সকলে ঐ অবস্থায় ঐ সময়ে ঠাকুরকে দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দুর্য্যোগে ঘর হ'তে বাহির হওয়া দুষ্কর, আপনি এই রাত্রিতে, এতদূর কি প্রকারে আসিলেন?" ঠাকুর, তখন রাস্তার সমস্ত বিবরণ তাঁহাদিগকে বলিয়া,

রোগীকে ঔষধ প্রদান করিলেন এবং সেই রাত্রি তথায়ই অবস্থান করিয়া, রোগীর অবস্থা একটু ভাল হইলে, পরদিন প্রাতে চলিয়া আসিলেন।

নবীন* বাবুর সেবা-কার্য্য।

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নবীন বাবুর স্ত্রী, বহুকালযাবৎ উন্মাদগ্রস্তা। তাহার উপর নানাপ্রকার রোগের পীড়নে, বিষম শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছেন। অনেক সময়েই তাঁহাকে বান্ধিয়া রাখিতে হয়। নবীন বাবু নিজেই, প্রতিদিন অত্যন্ত যত্নের সহিত তাঁহাকে বাহ্য, প্রস্রাব, স্নান ও আহারাদি করাইয়া থাকেন। একটি দিনের জন্যও ঝি বা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করেন না। ঠাকুর, উঁহার আন্তরিক দরদ ও অক্লান্ত সেবা বিষয়ে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"আজকাল এ ভাবের সেবা প্রায় দেখা যায় না।"

প্রত্যহ প্রাতে ও মধ্যাহ্নে নবীন বাবুর বাড়ীতে গুরুভ্রাতাদের সমাগম হইতেছে। যে ভাবে তিনি স্ত্রীর আবদার রক্ষা করিয়া এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গুরুভ্রাতাদিগকে আদর যত্ন করিতেছেন, তাহার আর তুলনা নাই। আড়ম্বরশূন্য সদনুষ্ঠানে তাঁহার আগ্রহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া অবাক্ হইতেছি।

নিয়মিত আহ্নিক সমাপনান্তে, নির্জ্জন ও অবসর বুঝিয়া, ফুল চন্দন তুলসী লইয়া, প্রতিদিন তিনি ঠাকুরকে পূজা করিতে আসেন। ঠাকুরের সম্মুখে একটু সময় বসিয়াই, অশ্রুকম্প-পুলকাদিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং ঠাকুরের চরণে তুলসী চন্দনাদি পূজো-পহার অর্পণ করিবার উদ্যোগমাত্রই—ঠাকুর "তুলসী পায়ে দিতে নাই, উহা আমার মাথায় দিন" বলিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে আমরা আসনহইতে উঠাইতে পারি না।

* শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ—ইনি এক সময়ে ভারপ্রাপ্ত সিভিল মেডিকেল অফিসার ছিলেন। চাকরি করিতে হইলে আপন ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুকূলে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করা বড়ই দুষ্কর বুঝিয়া, ইনি চাকরিটি পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ইনি একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। তৎকালে ইঁহার সুযশ ব্রাহ্ম-সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর, ক্রমে ক্রমে নবীন বাবুর মতের ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই সময়হইতে ইনি যথার্থ বৈষ্ণব আচারে থাকিয়া, একটানা সাধন ভজনে দিন রাত অতিবাহিত করিতেছেন। জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বাগুণ্ডি গ্রামে ইঁহার নিবাস।

গুরুভ্রাতা বৃন্দাবন বাবু, একদিন সকালে, রাত্রিবাস কাপড়ে, কিছু খাবার আনিয়া, ঠাকুরকে দিতে উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে নবীন বাবু বলিলেন—'ও কি! নোংরা কাপড়ে খাবার আনিয়া ঠাকুরকে দিতে যাচ্ছেন!' বৃন্দাবন বাবু একটু লজ্জিত হইয়া থামিয়া গেলেন। পরে কথা-প্রসঙ্গে বৃন্দাবন বাবু ঐ বিষয় ঠাকুরকে বলাতে, ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—**"ডাক্তার বাবু তাঁর ভাব মত ত ঠিকই বলেছেন; কিন্তু তুমি তোমার ভাব মত কাজ করলে না কেন? তিনি ত তোমাকে ঠকিয়ে দিয়েছেন।"**

বৃন্দাবন বাবু বলিলেন—"কি জানি মশায়! আপনি যদি না খান!"

ঠাকুর বলিলেন—**"আমি না খেলেও, তুমি ছাড়্‌বে কেন? আমার গাল টিপে খাইয়ে দিবে।"**

ভক্তের সেবা-সাহসে ঠাকুরের দুঃখ।

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

বিদেশহইতে সপরিবারে গুরুভ্রাতারা আসিয়া, আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দীক্ষাপ্রার্থী বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ দূরদেশহইতে আসিয়াছেন। পঞ্চাশ, ষাটি জন লোক সর্ব্বদাই আশ্রমে রহিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় নবীন বাবু এবং চন্দ্রমণি দিদি অকাতরে গোপনে খরচ চালাইয়া যাইতেছিলেন। ঠাকুর মগ্নাবস্থায় থাকিয়া একদিন হঠাৎ কান্দিয়া উঠিয়া বলিলেন—**"ওরা আমাকে তাড়ালে, এখানে আর থাক্‌তে দিলে না।"** কিছুক্ষণ পরে গুরুভ্রাতারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কারা আপনাকে তাড়ালে?"

ঠাকুর বলিলেন—**"নবীন বাবু আর নেড়া।"**

ইহা শুনিয়া চন্দ্রমণি দিদি কান্দিয়া বলিলেন—"বাবা! আমরা কিসে আপনাকে তাড়ালাম?"

ঠাকুর বলিলেন—**"তাড়ালে না ত কি! তোমরা যে রকম কর্‌ছ, আর কিছু দিন আমি এখানে থাক্‌লে, তোমরা যে একেবারে রাস্তায় দাঁড়াবে।"**

উঁহারা বলিলেন—"আমাদের কি বাবা! আপনার টাকা, আপনারই প্রয়োজনে লাগিতেছে। আমরা মাত্র উহা হাতে ক'রে দিয়ে ধন্য হ'য়ে যাচ্ছি। এতেও আপনি বাধা দিবেন?" অতিরিক্ত সাহসে চন্দ্রমণি দিদি ও নবীন বাবুর ঋণগ্রস্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া, ঠাকুর এই ভাবে তাঁহাদের চেষ্টায় বাধা দিলেন।

ভক্তের ভাবে ঠাকুরের আগ্রহ ও সমাদর।

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

একদিন একটি খুব গরীব গুরুভ্রাতা, ঠাকুরকে কিছু খাওয়াইবার আকাঙ্ক্ষায়, মাত্র দুই তিন আনা পয়সা লইয়া, প্রাতে সাতটাহইতে বেলা প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত কলিকাতা সহর ঘুরিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার পছন্দ মত খাবার, দুই তিন পয়সার এক এক স্থানে খরিদ করিয়া, বেলা দু'টার সময় অনাহারে শ্রান্ত শরীরে শ্যামবাজারের বাসায় পঁহুছিলেন। কিন্তু ঠাকুর উহা গ্রহণ করিবেন কি না সংশয়ে ও ত্রাসে, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। তিনি নীচে (রাস্তায়) সিঁড়ির নিকট পঁহুছিবামাত্রই, ঠাকুর অকস্মাৎ আসনহইতে উঠিয়া, ছলছল চক্ষে ছুটিয়া, উপরে সিঁড়ির দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কাঁদকাঁদ স্বরে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া, গুরুভ্রাতাটিকে বলিলেন—"ওহে! তুমি ও কি এনেছ? আন, শীঘ্র আন, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।" ঠাকুরের সস্নেহ আহ্বান শুনিয়া, গুরুভ্রাতাটি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরের হাতে খাবার দিয়াই পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। ঠাকুরও ছলছল চক্ষে, অতি আগ্রহের সহিত তাহা প্রায় সমস্তই খাইয়া, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে, উহা গুরুভ্রাতাটির হাতে দিয়া, খাদ্যের প্রশংসা করিতে করিতে এবং চোখ মুছিতে মুছিতে আসনে যাইয়া বসিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত ঠাকুর কিছু আহার করেন না। অসময়ে কিছু খাবার আসিলে, ঠাকুর কিঞ্চিৎ মাত্র গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত আমাদের বিলাইয়া দেন। কিন্তু এই গুরুভ্রাতাটির অসাধারণ আগ্রহ ও অনুরাগ বুঝিয়াই, বোধ হয়, ঠাকুর নিয়ম ভুলিয়া গিয়া অসময়ে প্রায় সমস্ত খাদ্য নিজেই খাইলেন।

ডাক্তার হরকান্ত * বাবুর দীক্ষা।

২৮শে অগ্রহায়ণ।

কিছুদিন দীক্ষার খুব হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে। কাহারও দীক্ষা হইলেই, বড় দাদার কথা আমার মনে পড়ে। এ পর্য্যন্ত তাঁহার দীক্ষা না হওয়ায়, বড়ই মনোকষ্টে আছি। এবার দাদা আসিলেই ঠাকুরের দয়া হইবে ভাবিয়া, দাদাকে পুনঃ-

* ডাক্তার ৺হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদর। খ্যাতনামা মিঃ কে, জি, গুপ্ত, ডাক্তার পি, কে, রায় প্রভৃতি ইঁহার সমপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। প্রথম বয়সে, কেশব বাবুর প্রথম উদ্যমের সময়, ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত আস্থাবান ছিলেন; গোঁসাইয়ের সহিত ঐ সময় হইতেই আলাপ। বহুকাল পশ্চিমা-

পুনঃ জেদ্ করিয়া আসিতে লিখিলাম ; ঠাকুরের কৃপার উপর ভরসা থাকায়, অনুমতিরও অপেক্ষা করিলাম না। দাদা ফয়জাবাদহইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর, দাদাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

২৮ শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ত্রয়োদশী তিথিতে, দাদার আকাঙ্ক্ষা মত, নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া, ঠাকুর তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন।

দীক্ষাকালে বিশেষ কিছু অনুভব হইল কি না জিজ্ঞাসা করাতে, দাদা বলিলেন—"আমি প্রাণায়াম করিতে পারিলাম না। কয়েকবার নাম স্মরণ করিতেই, কেমন যেন হইয়া গেলাম। মহাদেব আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। 'বেটারি' হইতে তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায়, অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গে আমার আনন্দ ছড়াইয়া পড়িল। গোঁসাই দুই হাতে আমার দুই বাহু ধরিয়া ফেলিলেন। গোঁসাইকে 'মহাদেব' রূপে দেখিলাম, ঐ সময়ে আমার যেন তন্দ্রাবেশ হইল ; আর কিছুই জানি না।" দাদার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সাধন গ্রহণের পর দাদা, ঠাকুরের নিকটে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—

রূপে ফয়জাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, কাশী প্রভৃতি স্থানে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত সরকারী এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন ও সিভিল মেডিকেল অফিসার স্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহার চাকুরির সময়ে, নানা তীর্থে, অনেক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাদের কৃপায় ইঁহার সনাতন ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তৎপরে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। 'পেনসন' গ্রহণের পর, জীবনের শেষভাগে, বিষয়ের সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, সাধন ভজন লইয়া, ৺পুরীধামে নিজ গুরুর সমাধিস্থানে বাস করিতেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, ঠাকুরের কৃপা, বিশেষভাবে ইনি প্রত্যক্ষ করেন। পুরীধামে সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া, ইনি বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বপারের মনোরম দৃশ্য সকল দর্শন করিতেন। বহুদূরে থাকিয়াও গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, অনেক অলৌকিক ঘটনা ইঁহার প্রত্যক্ষ হইত। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে, ইনি, মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহ্বান করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর সময় নির্দ্দেশপূর্ব্বক, শব বহন করিবার জন্য বিমান প্রস্তুত করাইলেন। দেহত্যাগের দিন প্রাতঃকালে, সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ ঠাকুর আমাকে বলিলেন "তোমার কর্ম্ম শেষ হ'য়ে গেছে, তবে ইচ্ছা করলে আরও কিছুকাল তুমি থাকতে পার অথবা যদি ইচ্ছা হয় এখনই আমার নিকটে আসতে পার।" এতকাল ত আমি সাধ্যমত তোমাদেরই সেবা শুশ্রূষা করিয়াছি, এখন ঠাকুর আমাকে দয়া ক'রে ডাকছেন, আমি আর থাকতে পারি না। তোমরা সকলে আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।" এই বলিয়া তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তিতে, তুলসী চন্দন দিয়া, একটু বালি নিবেদন করিয়া দিলেন। পরে নমস্কার করিয়া, ঐ প্রসাদ পাইয়া, নিজ বিছানায় শয়ন করিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সজ্ঞানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলেন।

"দীক্ষা ত দিলেন—কোন্ প্রকার আসনে বসিয়া জপ করিতে হইবে, তাহা ত ঠাকুর বলিলেন না!" ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন, দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া, ক্রমে ক্রমে তিন প্রকার আসন করিয়া দেখাইয়া, পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। দাদা মনে মনে খুব আনন্দিত হইলেন। (দাদার নিজ লেখা হইতে উদ্ধৃত)।

হরকান্ত বাবুর স্বপ্ন।

মধ্যাহ্নে, আহারান্তে, ঠাকুর, দাদার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন। দাদার স্বপ্নবৃত্তান্ত বড়ই অদ্ভুত! ঠাকুর এবং গুরুভ্রাতারা অনেকে দু' একটি স্বপ্ন শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঠাকুরও, দাদাকে বলিতে উৎসাহ দিলেন। দাদাও তাঁহার লেখা দুই তিনটি স্বপ্ন বলিতে লাগিলেন—

২৯শে অগ্রহায়ণ।

(১) "একদিন দেখিলাম—ভয়ঙ্কর তরঙ্গযুক্ত, কাল জল পরিপূর্ণ, খরস্রোতা একটি প্রকাণ্ড নদীর মধ্যস্থলে, আপনি দাঁড়াইয়া আছেন; অনেক চেষ্টায় হাবুডুবু খাইয়া, দলে দলে লোক আপনার নিকট যেমনই যাইয়া পঁহুছিতেছে, আপনি তাহাদের প্রত্যেককে দু'হাতে ধরিয়া নদীতে ডুবাইয়া, ছাড়িয়া দিতেছেন। তাহাদের শরীর অমনই সাদা কাঁচের মত পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা সকলে একই আকৃতি লাভ করিয়া, অনায়াসে নদী পার হইয়া চলিয়া যাইতেছে।

(২) দাদা আবার বলিলেন—"আর একদিন দেখিলাম—একটি মেম ডিস্ হাতে খাবার লইয়া, আমার নারায়ণকে ভোগ দিতে, ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। এই প্রকার দেখিলাম কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"**লক্ষ্মী এখন সাহেবদেরই ঘরে। তাই ওরূপ দেখেছেন। যেখানে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা নাই—লক্ষ্মী সেখানে থাকেন না। এ দেশে দ্রৌপদীর উপর যে অত্যাচারও অপমান হয়েছিল, আজ পর্য্যন্ত তার ষোলআনা প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই।**"

মাধোদাস বাবাজীর সমাধিতে অন্তর্দ্ধান ও ঠাকুরের কথা।

২৯শে অগ্রহায়ণ।

অযোধ্যার নানকসাহী সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা মাধোদাস বাবাজীর, কি অবস্থায় দেহত্যাগ হইল, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করায়, দাদা বলিলেন—"বাবাজী প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ভজন-কুটীরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিতেন, এবং সারারাত্রি, আসনে সমাধিস্থ থাকিতেন। যে রাত্রিতে তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই রাত্রিতে, শিষ্যদিগকে বাহির দিকহইতে দরজা বন্ধ করিতে বলিলেন। ঐ দিন মধ্যাহ্নে, বাবাজী, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। একটু অবসর মত যাইব ভাবিয়া, ঐ দিন আমি গেলাম না। শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম—বাবাজীর দেহটি সোণার হইয়া গিয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়া, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"বাবা, তোহারা ভালা হোগা, আনন্দ কর্। আবি হাম্ চলে যাতে।" এই বলিয়া অঙ্গচ্ছটায় চারিদিক আলোকিত করিয়া, শূন্যমার্গে, অনন্ত আকাশে অদৃশ্য হইলেন। স্বপ্ন দেখিয়াই আমি জাগিয়া উঠিলাম; বুক আমার দুরদুর্ করিতে লাগিল; বাবাজীর ঐ রূপটি, পুনঃপুনঃ মনে জাগিয়া, আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আমি, একটু ফরসা হইতেই, বাবাজীর খবর জানিতে লোক পাঠাইলাম; কিছুক্ষণ পরেই লোক আসিয়া বলিল, প্রত্যূষে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, বাবাজী আসন ত্যাগ না করায়, শিষ্যদের মনে সন্দেহ জন্মিল। পরে সকলে জানিলেন—ঐ রাত্রিতেই বাবাজী নিজ আসনে, সমাধির অবস্থায়, দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে, বাবাজী তাঁর প্রিয়শিষ্য নারায়ণদাসকে, রান্‌পালীতে উপস্থিত হইতে সংবাদ দিয়াছিলেন। এখন ঐ নারায়ণদাসই, বাবাজীর গদিতে আছেন। নারায়ণদাসেরও খুব সুখ্যাতি শুনিতে পাই।"

মাধোদাস বাবাজীর কথা প্রসঙ্গে, এক সময়ে ঠাকুর বলিলেন—"বাবাজী বড়ই দয়াল ছিলেন। আমাকে বড়ই কৃপা কর্‌তেন। আমাকে নিয়ে একই পাত্রে, তিনি আহার করেছিলেন। 'গ্রন্থসাহেব' তিনিই আমাকে পাঠ কর্‌তে বলেন। তাঁরই কথামত প্রতিদিন আমি তাহা পাঠ কর্‌ছি। নারায়ণদাস ঐ গদিতে থাকায় ভালই হইয়াছে। নারায়ণদাসের প্রতি বাবাজীর অসাধারণ কৃপা ছিল।"

সাধু নারায়ণদাসের অদ্ভুত জন্ম-বৃত্তান্ত।

মাধোদাস বাবাজীর কৃপায়, নারায়ণদাসের অলৌকিক জন্ম সংঘটিত হয়, তদ্‌বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।—বাবাজীর আশ্রম যখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, প্রত্যহ একটি বিধবা স্ত্রীলোক আসিয়া, দু'বেলা ঝাড়ু দিয়া যাইত। স্ত্রীলোকটির সংসারে আর কেহই ছিল না, বড়ই গরীব ছিল। ঝড়ে, বৃষ্টিতে, শীতে, গ্রীষ্মে, অবাধে তাহার সেবা দেখিয়া, বাবাজী বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা শীঘ্রই তোমার গর্ভ হইবে এবং একটি সাধু সুপুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন।" স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "বাবা! আমি যে বিধবা! এবং অতিশয় দরিদ্র! পুত্র হইলে আমার দশা কি হইবে?"

২৯শে অগ্রহায়ণ।

বাবাজী শুনিয়া বলিলেন—"সবই গুরুজীর ইচ্ছা! আমি প্রসন্ন হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা ত আর অন্যথা হইবার যো নাই। তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। ভালই হইবে। ছেলেটি পাঁচ বৎসরের হইলে, আমাকে দিও, আমি চেলা করিয়া রাখিব।" বাবাজীর কথামত বিধবাটির পুত্র হইলে, পাঁচ বৎসর পরে, ঐ ছেলেটিকে আনিয়া, মা, বাবাজীর চরণে অর্পণ করিলেন। ছেলেটির তের চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, বাবাজী উঁহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন। পরে সমস্ত তীর্থ-পর্য্যটনে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময়হইতে নারায়ণদাস, গুরুজীর অন্য আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত, এতকাল তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বাবাজীর সহিত আর দেখা হয় নাই।

যখন আমি ফয়জাবাদে ছিলাম, অবসর পাইলেই দাদার সঙ্গে রাণুপালীতে বাবাজীকে দর্শন করিতে যাইতাম। আশ্রমটি ঠিক যেন মুনি ঋষিদের তপোবন। ওখানে পঁহুছিবা-মাত্রই চিত্তটি প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ভজনের একটা আশ্চর্য্য শক্তি ও গাম্ভীর্য্য, আশ্রমে উপস্থিত হওয়ামাত্রই অনুভূত হয়। শুনিয়াছি, বাবাজীর অসাধারণ ঐশ্বর্য্য প্রভাবেই, আশ্রমের ভিতর দিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত সত্বেও, রেলপথ করা বন্ধ হইয়াছিল। বাবাজীকে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকেই, অসাধারণ সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সম্মান করিতেন। অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও, তিনি দীনহীন কাঙ্গাল ছিলেন। ধীর, শান্ত, আনন্দময় বাবাজীর পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণে চিত্ত প্রফুল্ল হয়।

পৌষ।

ঠাকুরের পূজা ও আরতি—মহাভাব

১লা পৌষ।

আজ গুরুভ্রাতা রামদয়াল বাবু ফুল, চন্দন, মালা, ধুনুচি, পঞ্চপ্রদীপাদি পূজোপকরণ ও আরতির সামগ্রী সকল লইয়া, বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে, আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ঐ সময়ে স্থির ভাবে আসনে বসিয়াছিলেন, রামদয়াল বাবুর অভিপ্রায় বুঝিয়াই, বোধ হয় চোখ বুজিলেন এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। রামদয়াল বাবু সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিলেন এবং করজোড়ে ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিলেন। দরদর ধারে অশ্রুজল বসনে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গদগদ ভাবে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া, ঠাকুরের চরণ যুগলে অর্পণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ তুলসী চন্দনে সাজাইয়া, গলায় ও মস্তকে মালা পরাইয়া দিলেন।

ভাগ্যবান গুরুভ্রাতারাও ঐ সময়ে চতুর্দ্দিকহইতে উল্লসিত প্রাণে, জয় ধ্বনি করিতে করিতে, অঞ্জলি ভরিয়া পুষ্প ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রামদয়াল বাবু, পঞ্চ প্রদীপাদি দ্বারা যথারীতি ঠাকুরের আরতি আরম্ভ করিলেন। পুনঃপুনঃ শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। খোল, করতাল, কাঁসর তালে তালে বাজিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকেরা মুহুর্ম্মুহুঃ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন।

গুরুভ্রাতারা সকলে ভাব-বিহ্বল অন্তরে, নির্নিমেষ নয়নে, ক্ষণকাল ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়াই অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়ে কেহ 'জয় নৃসিংহ', 'জয় নৃসিংহ' বলিতে বলিতে, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কেহ বা 'জয় রাম', 'জয় রাম' বলিতে বলিতে ঠাকুরের সম্মুখে মল্লবেশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, সজোরে বাহু আস্ফোটন করিতে লাগিলেন। কেহ 'ঐ কিরে', 'ঐ কিরে' বলিতে বলিতে, কম্পিত কলেবরে, ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, দাঁড়ান অবস্থায়ই, সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিলেন; আবার কেহ কেহ বা হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া 'ঐ গ্যাখ্', 'ঐ গ্যাখ্' বলিয়া, উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের দিকে ক্ষণমাত্র দৃষ্টি করিয়াই, এক এক জনের এক এক প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইল।

ঠাকুরকে এক এক জনে, এক এক প্রকার দেখিয়া, কেহ কম্পিত ও কেহ বা স্তম্ভিত হইলেন, আবার কেহ কেহ হুঙ্কার গর্জ্জন ও ভয়ঙ্কর আস্ফালন করিতে করিতে, মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। সঞ্চারীভাবের মহাতরঙ্গে আজ প্রায় সকলেই চৈতন্যহারা হইলেন। ধন্য গুরুদেব! ধন্য গুরুদেব!!

এক ঘণ্টাকাল এই ভাবে থাকিয়া, ধীরে ধীরে সকলেই নিদ্রোত্থিতের ন্যায়, উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুরের বাম পাশে, নিজ আসনে দাঁড়াইয়া, গুরুভ্রাতাদের বিচিত্র ভাবের অদ্ভুত বিকাশ দেখিয়া, পুলকিত ও বিস্মিত হইতে লাগিলাম। আজই ঠাকুরের প্রথম পূজা ও আরতি হইল। ধন্য গুরুপ্রাণ গুরুভ্রাতৃগণ! তোমাদের এই অসাধারণ গুরুপ্রেমের নিদর্শন, চিরকাল স্মৃতিতে রাখিয়া, আমার অবশিষ্ট জীবনও যেন ধন্য হইয়া যায়, এই আশীর্ব্বাদ করিও। মধ্যাহ্নে নানা প্রকার সুখাদ্য দ্রব্যে শতাধিক লোকের ভোজন হইল। সারাদিন আজ অনেকে ভাবাবেশেই রহিলেন। সন্ধ্যাকীর্ত্তনে, আবার ভাবের প্রবল তরঙ্গে, মহা ঢলাঢলি ব্যাপার হইল। অধিক রাত্রিতে, আহারান্তে সকলে বিশ্রাম করিলেন।

"আসন নেড় না, ফোঁস কর্‌বে।"

২রা পৌষ।

গত কল্য, ঠাকুরের পূজা ও আরতিকালে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে যে সকল পত্র, পুষ্প, দূর্ব্বা, চন্দনাদির বর্ষণ হইয়াছিল, অনবসর হেতু, সে সকল, আসনহইতে তুলিয়া লইতে সুবিধা পাই নাই। মধ্যাহ্নে, শৌচে যাইবার সময়, কোন কোন দিন, ঠাকুর নিজ হইতেই, তাঁহার আসন রৌদ্রে দিয়া, পাতিয়া রাখিতে বলিয়া যান, আমিও সেইরূপ করি। আজ শৌচে যাইবার সময়ে, আসন অপরিষ্কার থাকিল, অথচ উহা তুলিতে বা ঝাড়িয়া রাখিতে বলিলেন না দেখিয়া, ভাবিলাম, বুঝি ঠাকুর বলিতে ভুলিয়া গেলেন। তাই আসনটি রৌদ্রে দিতে মনস্থ করিয়া, যেমন উহা গুটাইতে, একটু সম্মুখের দিকে টানিলাম, অমনই মনে হইল, যেন সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের শরীরেও টান পড়িল, কারণ তিনি তন্মুহূর্ত্তেই পাইখানাহইতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ওহে? আসন নেড় না, থেমে যাও, থেমে যাও! ফোঁস কর্‌বে!"

আমি শুনিয়াই একেবারে চমকিয়া গেলাম। আসনের উপরের অংশ ঝাড়িয়া, সরিয়া পড়িলাম। ঠাকুর যখন শ্রীবৃন্দাবনে দাউজীর মন্দিরে ছিলেন, তখন ঠাকুরের আসনঘরে নিয়ত সাপ থাকিত জানি, গেণ্ডারিয়াতেও ঠাকুরের সাধন-কুটীরে, আসনের ধারে, সর্ব্বদা একটি জাত সাপ অবস্থান করে; জানি না ইহার ভিতরে কি রহস্য আছে। দু'টি পাকা দেওয়ালের অন্তরালে, পাইখানার ভিতরে থাকিয়া, আসনটি টানার সঙ্গে সঙ্গে,*ঠাকুর তৎক্ষণাৎ

আমাকে বাধা দিলেন—ইহাতেও চমকিয়া গেলাম। ঠাকুর আসিলে পর, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কলিকাতা সহরে, তেতালার উপরে, আসনের নীচে সাপ কোথা হইতে আসিল ?"

ঠাকুর বলিলেন—"**বাস্তুসাপ প্রায় সকল পুরাণ বাড়ীতেই ত আছে, কলিকাতাই কি, আর অন্যত্রই বা কি ? কিছুকালের জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন ক'রে বস্‌লেই, নিকটবর্ত্তী বাস্তুসাপ আসনের নীচে এসে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে।**"

আমি বলিলাম—"আসনের নীচে কি সর্ব্বদাই সাপ থাকে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"**এ সব স্থানে সর্ব্বদা থাক্‌বার সুবিধা পাবে কেন ? আসনের নীচে থাকার সুযোগ না ঘট্‌লে, ঐ ঘরে অন্য যে কোনও স্থানে থাক্‌তে পারে। নিকটে নিকটে থাক্‌বারই ওদের চেষ্টা।**"

আমি—"আসন ত প্রায়ই রৌদ্রে দিতে হয়। কখন কি বিপদ ঘটে ভয় হয় ?"

ঠাকুর—"**বিপদের আশঙ্কা কিছুই নাই। বিশেষ উপদ্রব না হ'লে, ওরা কোন অনিষ্টই করে না। তবে অকস্মাৎ আঘাত পেলে, ফোঁস্ কর্‌তে পারে।**"

আমি—"কখন আসনের নীচে সাপ থাক্‌বে তাহা কিরূপে বুঝ্‌ব ?"

ঠাকুর—"**আসন কখনও নাড়া চাড়া কর্‌তে নাই। আমি যখন বল্‌ব, তখনই তুলে রৌদ্রে দিও—না হ'লে, শুধু উপর উপর পরিষ্কার ক'রে রেখো।**"

যোগজীবনের পত্নীর গর্ভস্থ পুত্রের মৃত্যু-বিবরণ এবং তদীয় জননীর ভবিষ্যৎ।

শান্তিসুধার রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইতেই, গেণ্ডারিয়াহইতে খবর আসিল, যোগজীবনের স্ত্রী কিছুদিন হয়, গর্ভনাশের ফলে, দারুণ জ্বর-বিকারে ভুগিতেছেন। গুরুভ্রাতা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, খুব যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু রোগীর অবস্থা বড়ই আশঙ্কাজনক। গেণ্ডারিয়াস্থ গুরুভ্রাতাভগিনীরা সকলেই উঁহাকে নিয়া ব্যতিব্যস্ত। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই, যোগজীবনকে ঢাকা যাইতে বলিলেন।

ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া, যোগজীবন কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর তখন যোগজীবনকে ধীরভাবে বুঝাইয়া বলিলেন—"স্ত্রীর প্রতি যা একটুকু কর্ত্তব্য আছে, এ সময়ে যেয়ে শেষ ক'রে নে। আর তোকে স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে হবে না। খুব শীঘ্রই বউমা দেহ রাখ্‌বেন। এবার তাঁর আর নিষ্কৃতি নাই। তা হ'লেও, যে ক'টা দিন আছেন, সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার কোন প্রকার ক্রটি না হয়। চিকিৎসাতে দৈহিক ভোগের প্রায়শ্চিত্ত হয়। অবিলম্বে ঢাকা যেয়ে এ সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত কর্। আমিও শীঘ্রই যাচ্ছি।"

আজন্ম উদাস প্রকৃতি যোগজীবন, স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে হইবে না শুনিয়া, আনন্দে যেন লাফাইয়া উঠিলেন এবং অদ্যই রাত্রির গাড়ীতে গেণ্ডারিয়া রওয়ানা হইতে প্রস্তুত হইলেন। অবসর মত, গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যোগজীবনের স্ত্রীর পুত্র, গর্ভেই নষ্ট হইল কেন? রোগ কি মারাত্মক?"

ঠাকুর বলিলেন—"একজন উন্নত অবস্থার যোগী, কর্ম্মবিপাকে প'ড়ে, একটি গুরুতর অপরাধ ক'রে ফেলেন। তাতে অভিশাপ হ'ল, সাতবার গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাই জীবিত অবস্থায় কখনও ইনি ভূমিষ্ঠ হন্ না। আরও তিনবার ওঁকে গর্ভবাস ক'রে, পূর্ব্বাবস্থা লাভ করতে হবে, যে সে ক্ষেত্রে ইনি প্রবেশ করেন না। প্রসূতিও, ইঁহার ভূমিষ্ঠ হবার পরই, দেহত্যাগ করেন।"

যোগজীবনের স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, বড়ই দুঃখ হইল। আহা! প্রথম গর্ভের উপসর্গে ও অবসন্নতায় নিতান্ত রুগ্নদেহ লইয়া, প্রতিকূল আচরণে, উপযুক্ত দয়া এবং সদ্ব্যবহারের অভাবেও, ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, যে ভাবে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্তে, অম্লান বদনে, সহিষ্ণুতা সহকারে, তিনি আশ্রমস্থ ও পরিবারস্থ সকলের সেবা-কার্য্য চালাইয়াছেন, তাহা বড় সহজ নয় এবং সাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয় নয়। এবার গেণ্ডারিয়াতে যাইয়া, আবার কি তাঁর সেই দীনভাবাপন্না, সরলতা মাখা মূর্ত্তি দেখিতে পাইব? ঠাকুরের কথায় মনে হইল, খুব শীঘ্রই তাঁহার দেহ-ত্যাগ হইবে এবং দেহত্যাগের পূর্ব্বে ঠাকুরেরও তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। আমরা সকলেই যোগজীবনের স্ত্রীর কখন কি সংবাদ আসে, এই উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতে লাগি-লাম। ঠাকুর, কখন গেণ্ডারিয়া চলিয়া যান, নিশ্চয় নাই।

আহার বিষয়ে অনুশাসন—জাতিবিচার।

অপরাহ্ণে, তিনটার পর উনুন ধরাইয়া, রান্না এবং আহার শেষ করিতে, প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়ে; সুতরাং ঐ সময়ে ঠাকুরের অনেক কথা শুনিতে পাই না। এজন্য আজ সহজে আহারের ব্যাপার চুকাইব মনে করিয়া, সরকারী পাকের পরেই, সেই জলন্ত উনুনে ভাতে-সিদ্ধ-ভাত রান্না করিলাম। পরে ঐ ঘরের এক কোণে উহা রাখিয়া, নিশ্চিন্ত ভাবে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। "নির্দ্দিষ্ট সময়ে, পবিত্র ভাবে, স্বপাক আহার করিতে হইবে," আমার আহার বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশের ইহাই সার মর্ম্ম। মতলবে ঠেকিয়া, মনকে এই প্রকার বুঝাইয়া, সাড়ে তিনটার পরই আহার করিতে গেলাম। আহার করিতে প্রস্তুত হইয়া, সম্মুখে অন্ন নিয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে একটি কায়স্থ গুরুভগ্নী, পীড়িতা শান্তিসুধার পথ্য প্রস্তুত করিতে, রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়াই আমার মাথা গরম হইয়া গেল। তাঁহাকে খুব ধমক দিয়া বলিলাম—"আমি নির্জ্জনে আহার করি, তুমি তা জান না? তুমি ঘরে প্রবেশ করিলে! আজ আমার অন্ন নষ্ট হইল। আজ আমি আর আহার করিব না।" এই বলিয়া আসনহইতে উঠিয়া পড়িলাম। গুরুভগ্নীটি নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া, ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ঠাকুর, ঠিক সেই সময়েই খুব উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইতেই, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

৩ পৌষ।

আমি বলিলাম—"আমি আহার করিতে বসিয়াছি, শূদ্রা একটি গুরুভগিনী সেই সময়ে ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"আচ্ছা, যাও, সেই অন্নই যেয়ে খেয়ে নেও।"

ঐ সময়ে ঠাকুর, আমাকে আর কিছুই বলিলেন না। আহারান্তে, ঠাকুরের নিকট যাইয়া বসামাত্রেই, ঠাকুর আমাকে বলিতে লাগিলেন—"মেজাজটি একটু ঠাণ্ডা রেখে চল্‌তে চেষ্টা ক'রো। মেজাজ উত্তপ্ত হ'লে, সাধন ভজনের সমস্ত ফল নষ্ট হ'য়ে যায়। আহারের সময়ে, কায়স্থ ঘরে প্রবেশ করলেই, সমস্ত খাবার নষ্ট হ'য়ে যাবে, এ তোমাকে কে বলেছে? আর কায়স্থ ব্রাহ্মণ বুঝাও বড় সহজ নয়। শূদ্র কায়স্থের মধ্যেও অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। যাঁরা সত্ত্বগুণী তাঁরাই ব্রাহ্মণ। রজস্তমোগুণীদের স্পর্শেই আহার্য্য দূষিত হয়। সত্ত্বগুণী কায়স্থদের প্রতি, তোমাদের যদি ঐ প্রকার ভাব হয়, তা হ'লে ঠিক হবে না। নিতান্ত

সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়্‌বে। গুণ দ্বারাই জাতি বিচার, এসব বিচার ক'রে না চল্‌লে, মানুষ বড়ই ভ্রমে প'ড়ে যায়।"

"অন্যের পাক করা অন্ন খাবে না, এই তোমার নিয়ম। সকলের আহার শেষ হ'য়ে গেলে, নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ে রান্না হ'লেই, নিবেদন ক'রে খেয়ে নিবে। পাক ক'রে রেখে দিয়ে, কিছুক্ষণ পরে আহার করা, ঠিক নয়। ঢেলে রাখ্‌লে মানুষের দৃষ্টি হ'তে রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু পক্ক অন্নে শুধু মানুষের দৃষ্টিই ত পড়ে না। ভূত প্রেত অপদেবতাদির দৃষ্টি এবং কুকুর বিড়ালাদির স্পর্শও ত যখন তখনই হ'তে পারে। সুতরাং পাক্‌টি যেমনই হবে, অমনই নিবেদন ক'রে আহার করবে। সর্ব্বদা বিচার ক'রে না চল্‌লে, অনেক সময়ে গোলে পড়্‌তে হয়। অপরাধী হ'তে হয়।"

অবিচারে ভালমন্দ বুঝার সঙ্কেত।

প্রশ্ন—প্রতি কার্য্যে বিচার করতে গেলে, কাজ কি আর করা যায়? বিচারের ত অন্ত নাই! এমন অবস্থা কি হয় না, যে বিচার না করলেও ভাল মন্দ বুঝতে পারা যায়?

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, খুব হয়। আমাদের অন্তরে প্রতিমুহূর্ত্তেই, প্রতিকার্য্য সম্বন্ধে, এটি ভাল এটি মন্দ, এই প্রকার শব্দ আপনা আপনি উঠ্‌ছে। যাঁরা নিয়ম মত, সর্ব্বদা প্রতি শ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য রেখে নাম করেন, দমে দমে কুম্ভক করেন, তাঁদের দেহ শুদ্ধ হ'য়ে যায়, তাঁরাই ঐ ধ্বনি শুন্‌তে পান। এরূপ অবস্থা লাভ হ'লে, তাঁদের আর বিচার কখনও করতে হয় না। তাঁদের আর কোন ভয় বা সংশয়ও থাকে না। কিন্তু যাঁদের সেরূপ অবস্থা নয়, তাঁদের প্রতি কার্য্যে বিচার না করলে চল্‌বে কেন? এই সকল বলিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন।"

বীর্য্যধারণাদি শারীরিক তপস্যার প্রয়োজনীয়তা।

আমি একটু পরেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"আহার-শুদ্ধি, দেহ-শুদ্ধি এবং বীর্য্যধারণ এ সমস্তই ত শারীরিক তপস্যা?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা বটে! কিন্তু এসব ঠিক না হ'লে ত সহজে ধর্ম্মলাভ হয় না। ধর্ম্মলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়ই শরীর। সর্ব্বাগ্রে এই শরীরটিকে রক্ষা করতে হয়। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ইত্যাদি আহারে যে দেহের পুষ্টি, সে নিতান্তই অসার। বীর্য্যধারণেই যথার্থ দেহ রক্ষা হয়। আহারটি খুব পবিত্র ভাবে না হ'লে, বীর্য্যধারণ হয় না। শরীর সুস্থ ও পবিত্র না হ'লে, সাধন করবে কি নিয়ে?"

আমি ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"পবিত্র আহার, পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি, বাক্য সংযমাদি ও বীর্য্যধারণের যে সকল নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন, প্রাণপণে করিয়া যাইতেছি; কিন্তু বীর্য্যধারণ ত কিছুতেই হইতেছে না! কি করিলে স্বপ্নদোষের হাত হ'তে রক্ষা পাই, বলিয়া দিন।"

ঠাকুর বলিলেন—"দু'টি ঘণ্টা খুব স্থির হ'য়ে ব'সে নাম ক'রো দেখি, কেমন স্বপ্নদোষ হয়।"

নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"যে সব নিয়ম দিয়াছেন, সে ভাবে চলিলে কতকালে সিদ্ধ হইব?"

ঠাকুর বলিলেন—"সিদ্ধি কি? কতকগুলি শক্তি লাভ করাই কি সিদ্ধি মনে কর? ষড়ৈশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ বিষয়। কখনও ওতে আসক্তি রেখো না। যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত সাধন ভজন ও চেষ্টা করছ, ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য ঐ রূপটি করলে, একটি বছরেই ঢের ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত করতে পার। মাত্র একটি বৎসর বীর্য্য ধারণ ক'রে, যদি সত্য-বাক্য, সত্য-চিন্তা ও সত্য-ব্যবহার করতে পার, অনেক ঐশ্বর্য্য শক্তি লাভ হবে। কিন্তু তাকে সিদ্ধি বলে না। যখন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি প্রতিক্ষণে আপনা আপনি ভগবানের নাম করবে, তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ হয়েছে জানবে। কোন একটি বিষয়ে লোভ বা আসক্তি থাকতে, সে অবস্থা কখনও লাভ হয় না। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লোভ ও অনাসক্ত হ'লেই হয়। এই অবস্থা হ'লেই প্রকৃত পক্ষে নামে রুচি জন্মে। নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার চমক্ লাগিল, আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"অসৎ বিষয়ে লোভই ত ক্ষতিকর ?"

লোভ সর্ব্বত্রই সমান ক্ষতিকর।

ঠাকুর বলিলেন—"**বিষয় সমস্তই অসৎ। লোভ যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, অনিষ্টকর জান্‌বে। রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক দেখে, তাঁর প্রতি লোভ করাতে যে ক্ষতি, বাজারে মিঠায়ের দোকানে একটি রসগোল্লা দেখে, তাতে লোভ করায়ও, ধর্ম্মলাভ বিষয়ে ঠিক সেইরূপ ক্ষতি। সামাজিক ইষ্টানিষ্টের কথা স্বতন্ত্র।**"

এই সময়ে মণি বাবু, অচিন্ত্য বাবু, মহেন্দ্র বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা রহস্য করিয়া, হাসিতে হাসিতে ঠাকুরকে বলিলেন—"মশায়! ওসব আমাদের দ্বারা হবে না। ধর্ম্মলাভ হউক আর নাই হউক, পৈত্রিক সম্পত্তি (গুরুকৃপা) কিছু ত পাবই।"

ঠাকুর বলিলেন—"**ধর্ম্মলাভ সকলেরই হবে, বঞ্চিত কেহই হবেন না। তবে দু'দিন আগে আর পরে। সকলেই যে, সকল নিয়ম প্রতিপালন ক'রে চল্‌তে পার্‌বে, তা নয়। অন্ততঃ নিয়মগুলি প্রতিপালনের একটু ইচ্ছা যদি থাকে, তা হ'লেও যথেষ্ট।**"

একথা বলামাত্রেই, সকলে একেবারে হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল, "এযে বজ্র-আঁটুনির ফস্কা গেরো।"

গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে কতিপয় প্রশ্নোত্তর।

শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যা ব'লে দিয়েছেন, সেই মত যারা চলে, আর যারা সেই মত চলে না, এই দু'য়ের মধ্যে তফাৎ কি ?"

ঠাকুর উত্তরে বলিলেন—"**উপদেশ মত যাঁরা চলেন, তাঁদের সঙ্গে যে একটা যোগ রয়েছে, এ তাঁরা পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারেন, আর যাঁরা উপদেশ মত চলেন না, তাঁদের মাঝে কিছুদিন, ইহা চাপা প'ড়ে যায়।**"

দেবেন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাধনের সময়ে যাকে যা ব'লে দিয়েছেন, সেই

রকম সে চল্‌তে না পার্‌লে, অথবা তার বিপরীত আচরণ কর্‌লে, তার কি হবে? আর এসব কারণে কাকেও ত্যাগ করা হয় কি না?"

ঠাকুর বলিলেন—"**কাহাকেও একেবারে ত্যাগ করা হয় না; এই জিনিস যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের ইহা কখনও নষ্ট হয় না। সময়ে সকলেরই সব ঠিক হ'য়ে যায়।**"

দেবেন্দ্র বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাঁহারা সাধন লইয়া গিয়াছেন, জীবনে আর কখনও দেখা হয় নাই, তাঁহাদিগের সকলকে আপনি চিনেন কি না?"

ঠাকুর বলিলেন—"**সকলের সঙ্গেই অন্তরের একটা যোগ রয়েছে।**"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন—"অন্তরের যোগের কথা বল্‌ছি না, বাহিক তাঁদের চিনেন কি না?"

ঠাকুর বলিলেন—"**হাঁ, চিনি।**"

তখন দেবেন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে, আপনি নূতন কেউ এলে, 'ইনি কোথা থেকে এলেন, ইনি কে,' ইত্যাদি বলেন কেন?"

ইহাতে ঠাকুর কোন উত্তর না দিয়া, কেবল একটু হাসিলেন। দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহাদের প্রত্যেকের খোঁজ রাখেন কি না?'

ঠাকুর—"হাঁ।"

দেবেন্দ্র বাবু—"তাঁহাদিগের বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে আপনার জান্‌তে হয় কি?" (অর্থাৎ পূর্ব্বে ঋষি মুনিরা, যেমন কোন বিষয় জান্‌তে হ'লে, ধ্যানস্থ হ'য়ে জান্‌তেন, সেইরূপ কি না?)

ঠাকুর—"**মনোযোগ দিয়ে জান্‌তে হয় না। প্রত্যেকের জীবনের ভাল মন্দ, যাহা কিছু বর্ত্তমানে ঘট্‌ছে, তাহা চোখে পড়ে।**"

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঠাকুর সাহেব-বাড়ীর দোকানের আয়নার কথা বলিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়, ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন—"গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে না পারিলে কিরূপ হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"**গুরুর আজ্ঞা কি কেহ প্রতিপালন করতে পারে।**"

মনোরঞ্জন বাবু—"সামান্য সামান্য আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারে ত—যেমন মাংস না খাওয়া ইত্যাদি।"

ঠাকুর বলিলেন—"**তাও পারে না।**" পরে একটু থামিয়া—"**যিনি গুরুর আজ্ঞা পালন করেন, তিনি ত করেনই, যাঁর প্রতিপালন করবার ইচ্ছা আছে, দুর্ব্বলতা**

বশতঃ পারেন না, তিনিও গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করেন। এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা যদি গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন নাও করেন, এমন কি বিরুদ্ধেও চলেন, সময়ে তাঁরাও ফল পাবেন ; ইহা নিশ্চয়।”

লোভে হতাশ—উপদেশ।

৩রা পৌষ।

সকাল বেলা, সাধন করিতে করিতে, বিষম একটা জ্বালা প্রাণে আসিয়া পড়িল—মনে হইল, আজ ছয় বৎসর হইল দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, এ সময়টা যথাসাধ্য নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া, সাধন ভজনও করিয়া আসিতেছি, কিন্তু জীবনের উন্নতি কিছুই ত দেখিতেছি না। ছেলেবেলাহইতে যে সকল কু-অভ্যাস স্বভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার একটিও ত এতকালে বিন্দুমাত্র শিথিল হইল না? এ সকলহইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্থির হইব কবে? আর ভগবদুপাসনাই বা করিব কবে? দিন ত এ সকল উৎপাত শান্তির নিমিত্ত লড়াই করিতে করিতেই শেষ হ'য়ে গেল। ঠাকুরের অপরিসীম কৃপাগুণে, দুরন্ত কাম রিপুর উত্তেজনার প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু লোভের ভয়ঙ্কর উদ্দীপনায় দিনরাত জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছি। ঠাকুরের আদেশ অনুসারে, দিবসান্তে একবেলা স্বপাক ভাতে-সিদ্ধ-ভাত মাত্র আহার করিতেছি, তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতেছে বটে, কিন্তু নানা প্রকার সুখাদ্য মিষ্টান্ন, ঘৃতান্ন প্রভৃতি প্রতিদিন ঠাকুর আবার আমাকেই পরিবেশন করিতে আদেশ করায়, বিষম লোভাগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিতেছি। সে সকল সুস্বাদ সামগ্রী প্রত্যহ নাড়া চাড়া করিতেছি, এখন ভজন সাধনে জলাঞ্জলি দিয়া, তাহারই রসাস্বাদন কল্পনায়, সারাদিন জিহ্বা চুষিয়া কাটাইতেছি। সকলের অজ্ঞাতসারে, চুরি করিয়া, ঐ সকল বস্তু খাইতে, সময়ে সময়ে প্রবল ইচ্ছা পর্য্যন্ত হইতেছে ; কখনও কখনও আবার এমনই জ্বালা হইতে থাকে যে, ঠাকুরের সঙ্গও ভাল লাগে না, মনে হয়, ঠাকুরের সঙ্গে থাকিলে, যদি এ সকল লোভের বস্তু সর্ব্বদা নাড়া চাড়া করিয়া, জ্বলিয়া পুড়িয়াই মরিতে হয়, এমন সঙ্গে আর লাভ কি? ক্ষতিই ত হইতেছে, বরং তফাৎ হইয়া যাই। হায়! হায়!! ভগবানের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব প্রত্যাশায়, বাড়ী ঘর, আত্মীয় স্বজন, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম, শেষ কালে আমার এই দশা! এখন লোভের বশীভূত হইয়া চুরির প্রবৃত্তি!! দুর্ল্লভ ঠাকুরের সঙ্গলাভেও বিরক্তি!!!

প্রাণের জ্বালা অসহ্য বোধ হওয়াতে, ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—“আমি আর সহ্য করিতে

পারি না, চেষ্টা করিতে আমি কোন ক্রটি করিতেছি কি না, তাহা ত আপনি দেখিতেছেন; এখন আর কি করিব?"

ঠাকুর বলিলেন—"ওর জন্য তুমি এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? একেবারেই কি সব হয়! ক্রমে ক্রমে সবই হবে। পুনঃপুনঃ চেষ্টা ক'রে, অকৃতকার্য্য হ'লে, তাঁর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে, ব'সে ব'সে তাঁরই নাম ক'রো। ধীরে ধীরে সমস্ত উৎপাতই কেটে যাবে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই বুঝ্‌লে, তাঁর উপর নির্ভর না ক'রে আর উপায় কি? মনটিকে খোলসা ক'রে ফেলে, নিজের দুরবস্থা পরিষ্কার বুঝে, সরল ভাবে একবার তাঁর দিকে তাকায়ে যদি বল্‌তে পার, 'প্রভো! আমি আর পার্‌লাম না, আমাকে রক্ষা কর,' তিনি রক্ষা কর্‌বেন। এ ভিন্ন আর উপায় নাই।"

মনে মনে ভাবিলাম—"নিজের চেষ্টায় কখনও পারিব না ইহা যথার্থ বুঝিলে, আর অনুতাপ হইবে কেন? এখন ত বুঝি আমিই সমস্ত করিব, তবে সাহায্যও চাই।"

দীক্ষাস্থলে বিচিত্র ভাব।

৪ঠা পৌষ।

ঠাকুরের শ্যামবাজারের বাসায় আসিবার পর বরিশাল, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্ত্রীপুরুষ এবং কলিকাতা নিবাসী অনেক ভদ্র মহিলারা আসিয়া ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। দু' পাঁচ দিন অন্তরই লোকের দীক্ষা হইতেছে। এই দীক্ষা সময়ে, যে সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখিতেছি, তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই। একই সময়ে বহুলোকের দীক্ষাকালেও, এক এক জনের ভিতরে এক এক প্রকার দর্শন ও অনুভূতি, তাহাতে এক এক প্রকার ভাব ও উচ্ছ্বাস, আনন্দ ও আবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। মহাপুরুষ ও পরলোকগত আত্মাদের, একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আবির্ভাব হেতু, কেহ জ্ঞাত, কেহ বা অজ্ঞাত, বিবিধ প্রকার ভাষায়, আনন্দ উল্লাস পূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা আত্ম-পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, ক্লেশসূচক বিলাপ করিতে করিতে, কাতর ভাবে দীক্ষা প্রার্থনা জানাইতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছি। ঠাকুর এই সকল পরলোকগত জীবদের কাহাকেও স্তবস্তুতি বা নমস্কার দ্বারা, কাহাকেও বা ভং'সনা ও তাড়না দ্বারা বিদায় দিয়া থাকেন। এই সাধনে, প্রকৃতিভেদে কেহ কেহ উপদেশ ও দীক্ষা মাত্র, নাম শ্রবণান্তে প্রাণায়াম করিয়া সহজ

অবস্থায়ই অবস্থান করেন, দীক্ষাকালে বিশেষ কিছুই অনুভব করেন না। কেহ কেহ মন্ত্রলাভ করিয়া, দুই চারিবার প্রাণায়াম করিয়াই, ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়েন। আবার কেহ কেহ বা নামটি কাণে প্রবেশ করা মাত্রই, একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। দুই তিন ঘণ্টা কাল বাহ্যজ্ঞানও থাকে না। অজ্ঞাতসারে প্রাণায়ামাদি আপনা আপনি চলিতে থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে মহা সাত্ত্বিক ভাবের বিকার প্রকাশিত হইয়া পড়ে। একই সময়ে দীক্ষা-স্থলে বহুলোকের ভিতরে বিচিত্র ভাবের ও অবস্থার সমাবেশ দেখিয়া, দিন দিন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি, কিসে যে কি হয়, কিছুই বুঝিতেছি না!

এই দীক্ষা গ্রহণই ত্রিবেণী-স্নান।

৫ই—১৮ই পৌষ।

৪ঠা পৌষ, শুক্রবার বেলা দশটার সময়ে বরিশাল, বানরীপাড়া ও ঢাকা জেলার কতকগুলি লোকের দীক্ষা হয়। কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের মাতা, ভগ্নী এবং স্ত্রী প্রভৃতির দীক্ষাও এই তারিখে হইল। একটি প্রেতাত্মা, কুঞ্জ বাবুর শালী শ্রীমতী বসন্তকুমারীর, কলিকাতা আসিবার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, দীক্ষা গ্রহণ মানসে, তথায়ই উহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। দীক্ষাকালে এই প্রেতের কান্নাকাটি, চীৎকার ও কাতরোক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কুঞ্জ বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ মাত্র, চৈতন্যশূন্যা হইলেন, সারাদিন তিনি নেশাখোরের মত ভাবে ঢুলুঢুলু অবস্থায় রহিলেন। কুঞ্জ বাবুর মা, দীক্ষান্তে, অবসর মত, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি যে আপনার নিকট হইতে মন্ত্র নিলাম, ইহা ত দেশে যাইয়া বলিতে পারিব না; কি বলিব?" সকলে ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "গোঁসাই কি আপনাকে মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়া দিবেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"**তোমরা এঁদের অবস্থা জান না। এঁদের খুব বড় সমাজ, সমাজে সম্মানও এঁদের খুব, এ সব কথা সেখানে ইনি বল্‌তে পার্‌বেন না।**"

তার পর, কুঞ্জ বাবুর মাকে বলিতে লাগিলেন—"**আপনি বল্‌বেন যে, ত্রিবেণীতে স্নান ক'রে এসেছি, শাস্ত্রে ইহাকে ত্রিবেণী-স্নান বলেছেন। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নাই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, ইহাদের মিলন স্থান কুণ্ডলিনীকে ত্রিবেণী বলে। কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগানই ত্রিবেণী-স্নান।**"

ঠাকুরের এই কথার পরই, কুঞ্জ বাবুর মাকে, ঘটনাতে পড়িয়া, ত্রিবেণীতে যাইয়া স্নান করিয়া আসিতে হইল। কুঞ্জ বাবুর মা, ঠাকুরকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি পূর্ব্বে কুলগুরুর নিকটে যে পূজা নিয়াছিলাম, তাহা কি ছাড়িয়া দিব ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা কেন ? পূর্ব্বে যে পূজা নিয়েছিলেন, তাও কর্‌বেন।"

কুলগুরু প্রদত্ত সাধনও করিতে হইবে কি না, ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, অনেকেই অনেক দিন এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন।

ঠাকুর বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"কোনও প্রয়োজন নাই, এই সাধন কর্‌লেই হবে।"

কোন কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছেন—"ইচ্ছা হ'লে কর্‌বে।"

আবার এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন—"হাঁ, তাও কর্‌বে, ইচ্ছা ক'রে ওসব কিছু ছাড়্‌তে নাই।"

অবস্থাভেদে ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুসারে এ প্রকার ব্যবস্থা, না অন্য কোনও কারণে আদেশের এরূপ পরিবর্ত্তন, জানি না।

দীক্ষার বিনিময়ে দান ও তাহা গ্রহণে অপরাধ।

দীক্ষা গ্রহণের পরে, গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বাবু, ঠাকুরকে একখানা মলিদা দিলেন। ঠাকুর উহা একটি শীতবস্ত্রশূন্য কাঙ্গালকে দিয়া দিলেন। ইহাতে সকলেই, বিশেষতঃ পরেশ বাবু, অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। রাত্রিকালে গল্পচ্ছলে মণি বাবু, ঠাকুরকে বলিলেন—একখানা বস্ত্র যদি জামাইকে ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়, আর তাহা তিনি ব্যবহার না করিয়া অন্যকে দিয়া ফেলেন, তা হ'লে মনে বড় কষ্ট হয়!

ঠাকুর বলিলেন—"দান একেবারে কর্‌তে হয়। ওখানি যদি তাঁর নিজস্ব হ'ল, তবে তিনি দিবেন না কেন ? গুরুর মন্ত্রের বিনিময়ে, কোন দান প্রতিদান নাই, সে অমূল্য। তবে যদি কেহ অন্য সময়ে, বৃদ্ধ পিতা জ্ঞানে বা অন্য অভিভাবক জ্ঞানে, কিংবা পথের অন্ধকে দানের ন্যায় দয়া ক'রে দান করেন, তবে গুরু লইতে পারেন, নতুবা গুরু ও শিষ্য উভয়েই অপরাধী হন। অতএব অন্যভাবে গুরুকে কেহ কিছু দিও না।"

অন্য সময়ে, দীক্ষাকালে একটি গুরুভ্রাতা, ঠাকুরকে কয়েকটি টাকা দেওয়াতে, ঠাকুর তাহাকে বলেন—"আমি সামান্য জীব, আমাতে সব দোষই সম্ভব, আমার কোন ব্যবহারে যদি এমন কিছু প্রকাশ হ'য়ে থাকে যে, আমি যাচ্‌ঞা কর্‌ছি, তা হ'লে আমার ত্রুটি হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। অর্থের প্রত্যাশায় আমি দীক্ষা দেই না। দীক্ষার বিনিময়ে, টাকা যিনি দেন ও নেন উভয়েই নরকগ্রস্ত হন।"

দেব দেবীর অনুরোধ—পূজাটি লোপ না হয়।

৫—১৮ পৌষ।

এবার এখানে আসার পর, কিছুদিন হয়, দীক্ষাসময়ে ঠাকুর সকলকেই একটি নূতন উপদেশ দিতেছেন। দীক্ষার প্রারম্ভেই তিনি বলেন—"যার যেটি দেশগত, সমাজগত বা কুলক্রমাগত রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি রয়েছে, যথাসাধ্য তা বজায় রেখে, এই সাধন পথে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।"

এই উপদেশটি নূতন দেওয়া হইতেছে কেন, জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঠাকুর বলিলেন—"একদিন দেখ্‌লাম, হিমালয় পর্ব্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি, অগ্নিময় হ'য়ে গেছে। সেই অগ্নির ভিতর হ'তে কালী, দুর্গা, মহাদেব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেব-দেবীগণ বা'র হ'য়ে এসে বল্‌লেন, 'দেখ, আমাদের পূজা লোপ না হয় এই ক'রো!' আমি বল্‌লাম, 'কেন, আমার দ্বারা কি লোপ হ'চ্ছে ? তাঁরা বল্‌লেন—'তুমি যাদের সাধন দিচ্ছ, তারা যদি আমাদের অগ্রাহ্য করে, তা হ'লেই ক্রমে পূজাদি সব লোপ হ'য়ে আস্‌বে।' তদবধি দীক্ষার সময় ঐ উপদেশটি দেওয়া হ'চ্ছে।"

একটি গুরুভ্রাতা প্রশ্ন করিলেন—"বিষ্ণু, শিব, এঁদের আবার পূজা পাইতে এত আগ্রহ কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"এঁরাও ত ত্রিগুণেরই মধ্যে।"

প্রশ্ন—"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের পূজায় কি ভগবানের পূজা হয় না ?"

ঠাকুর—"হাঁ, খুব হয়। ভগবদ্‌বুদ্ধিতে কর্‌লেই হয়। ভগবান, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রূপে যেমন মায়িক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা হ'য়ে আছেন, সেইরূপ অপ্রাকৃত

বৈকুণ্ঠ, শিবলোকাদি ধামেও তাঁর ঐ প্রকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। ভগবানই এক এক রূপে ভক্তের নিকট লীলা কর্‌ছেন।"

মহাত্মা মণিবাবার দৃষ্টি শক্তি।

৫ই—১৮ই পৌষ।

ঠাকুর যখন ফয়জাবাদে দাদার নিকটে কয়েক দিন ছিলেন, সেই সময়ে একদিন মণিবাবার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মণিবাবা ঠাকুরকে খুব সমাদরে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপ্ কৃপা করকে হামারা আসন পর্ রহিয়ে, হাম আভি দেহ ছোড়্ দেতে।" ঠাকুর এই মহাত্মার সহিত দাদাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন। দাদা দু' দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া, চাকরি স্থলে চলিয়া গিয়াছেন এবং সম্প্রতি মণিবাবাকে দর্শন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন—"গোঁসাইয়ের আদেশ মত, মণিবাবার দর্শনে গিয়াছিলাম। পূর্ব্বেও কখন কখন মণিবাবার নিকটে আমি যাইতাম; তিনি আর দশটি লোকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমার প্রতিও প্রায় সেই রূপই করিতেন। কিন্তু এবার আমি বাবাজীর আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই, বাবাজী আমাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আসনহইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং খুব উল্লসিত ভাবে দুই হাত বিস্তার করিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'আহা হা! বহুত্ জনম্ জনম্ তপস্যা কর্‌কে, আভি সদ্‌গুরুকা কৃপা লাভ কিয়া হ্যায়। সব পূরণ হো গিয়া, ধন্য হো গিয়া! ধন্য হো গিয়া!! এই বলিয়া তিনি আমাকে খুব আদর করিয়া, নিজের আসনের সম্মুখে নিয়া বসাইলেন ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। গোঁসাইয়ের নিকট আমার দীক্ষা গ্রহণ বিবরণ, বাবাজীর জানিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। তাঁর এই দৃষ্টি শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। বাবাজীর আশীর্ব্বাদ পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল।"

চরণামৃত গ্রহণে প্রেতাত্মার উদ্ধার।

৫ই—১৮ই পৌষ।

অত্যন্ত দুষ্কার্য্যকারী ব্যক্তিদিগের আত্মা, পরলোকে অবস্থান কালে, দুঃসহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া, শান্তির জন্য কত প্রকার উপায়ই অবলম্বন করে, বলা যায় না। কেহ গয়াতে পিণ্ডলাভ আকাঙ্ক্ষায়, ব[illegible]রদিগের প্রতি নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করে, কেহ বা মহদাশ্রয় লাভ করিলে সমস্ত ক্লেশের উপশম হইবে মনে করিয়া, মহাপুরুষদিগের নিকট, সুবিধা পাইলেই ছুটাছুটি করে, আবার কোন কোন

আত্মা সদ্‌গুরুর কৃপার একটু ছিটা ফোঁটা লাভ হইলেই একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইবে নিশ্চয় করিয়া, তাহারই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইতেছি!

গভীর রাত্রিতে, কয়েকটি ভক্ত গুরুভ্রাতার নিকটে, প্রেতাত্মাদের কথা প্রসঙ্গে, ঠাকুর বলিলেন—"আজ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়েছিলাম। যমুনাতীরে কয়েকটি প্রেতাত্মা আমাকে খুব কাতর ভাবে বল্‌লে, 'শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় আমাদের ক্লেশ হ'চ্ছে, আমাদের এই ক্লেশ হ'তে, দীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করুন।' আমি বল্‌লাম, 'আমি কিছুই জানি না। আমার গুরুদেবের হুকুম বিনা কিছুই আমার কর্‌বার উপায় নাই।' তারা বল্‌লে, 'আপনি যমুনায় স্নান করুন।' পরে আমি যমুনায় স্নান ক'রে উঠ্‌লাম, ভিজা গায়ের জল, বেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। প্রেতেরা খুব আগ্রহ ক'রে উহা চেটে খেতে লাগ্‌ল, তখন দেখ্‌লাম তাদের শরীর জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে গেল, এবং দিব্যরথ এসে, তাদের নিয়ে গেল।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া, কয়েকটি গুরুভ্রাতা ভাবিলেন, চরণামৃত গ্রহণ করিয়া প্রেতাত্মারা যদি উদ্ধার হইল, তবে আমরাও একবার উহা খাইয়া রাখি না কেন? পরদিন সকালে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, ঠাকুরের শৌচান্তে, জোর করিয়া চরণামৃত নিয়া আসিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরিষ্কার কলের জলের চরণামৃত, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়, দেবেন্দ্র সামন্ত, মহেন্দ্র বাবু প্রভৃতি যাঁহারা পান করিলেন, সকলেই পবিত্র মনোমোহন এক প্রকার সদ্‌গন্ধ পাইয়া অবাক্ হইলেন। ঠাকুর গন্ধ বস্তু কিছু ব্যবহার করেন না, ইহা আমরা জানি!

পাগলা ঠাকুরমা ও ঠাকুর, ঠাকুরের জন্মবিবরণাদি শ্রবণ।

৫ই—১৮ই পৌষ।

শ্যামবাজারে আসিয়া অবধি, আশ্রমস্থ লোকের আহারাদির ব্যবস্থা, অতিথি অভ্যাগতের আদর অভ্যর্থনা এবং নবাগত দীক্ষাপ্রার্থী স্ত্রীপুরুষের থাকার বন্দোবস্ত, ধীর প্রকৃতি কার্য্যদক্ষ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপর বিশেষ ভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় এবং ডাক্তার নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও, এ সকল কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। চন্দ্রমণি দিদি, অনার মা, সারদা পিসী এবং আগন্তুক গুরুভগ্নীদের দ্বারা, এত কাল সুচারুরূপে, পাক কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া

আসিতেছিল। পরে পাগলী ঠাকুরমা আসা অবধি, সমস্ত উলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই, প্রথমে রান্না ঘরে ঢুকিলেন। গুরুভগ্নীদের রান্না কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া, বলিলেন—আরে, একি? তোরা এখানে কেন? গোঁসাই বাড়ীর রান্নাঘরে শূদ্র! তোরা ত এঁটো মুক্ত করবি, আর বাসন মল্‌বি। যতদিন বিজয়ের একটা বিয়ে না দিব, রান্না আমিই করব। তোরা এ ঘর থেকে বের হ।" ঠাকুরমা এই বলিয়া, উহাদের কুট্‌না, বাট্‌না সমস্ত ফেলিয়া দিলেন এবং নিজহাতে খোসা সহিতে তরকারি কুটিয়া, আধসিদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ডালও ঐ প্রকারে রাঁধিলেন, আধোয়া চাউল ফুটাইয়া পিণ্ড করিলেন। প্রথম দিন সকলেই ঠাকুরমার রান্না দেখিয়া, খুব আমোদ করিয়া খাইলেন। ঠাকুরমাও প্রত্যহই ঐ প্রকার রান্না করিতে লাগিলেন। একদিন চন্দ্রমণি দিদি, ডাল চাউল ধুইয়া রাখিতেই, ঠাকুরমা তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের ভোগের জিনিস শূদ্র হ'য়ে ছুঁলি, বড়ই আস্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি?"—ঠাকুরমার রান্না খেয়ে টেকা, সকলের শক্ত হইয়া উঠিল। একদিন সকলেরই পাতে ডাল, ভাত, তরকারি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, ঠাকুরমা ছুটিয়া ছেলের নিকট যাইয়া বলিলেন, 'ওরে বিজয়! বল্ দেখিনি, কেমন রেন্ধেছি?" ঠাকুর অমনি একমুখ হাসিয়া বলিলেন—**"কেন মা! তাকি আর জিজ্ঞাসা করতে হয়! ঠিক যেন জগন্নাথের ভোগ। ওঁরা সব কেমন খাচ্ছেন?"** ঠাকুরমা বলিলেন, 'ওরা খাবে কি! ওদের কি ভক্তি আছে! আমরা হ'লেম শান্তিপুরে গোঁসাই, আমাদের হাতে দেবতারা খান, বুঝ্‌লে! আমরা বাপু তেল ঘিও দিই না, আর বাট্‌না কুট্‌নারও ধার ধারি না—যা তা সাদা জলে সিদ্ধ ক'রে দি, দ্যাখ্ দেখিনি তারই কত স্বাদ?"

ঠাকুর—**"জগন্নাথের রান্না সাদা জলেই ত হয়।"**

গুরুভ্রাতারা তামাসা করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরমা! হেলায় শ্রদ্ধায় কোন প্রকারে এই প্রসাদ, এক গ্রাস তল করতে পারলেই যে হ'লো। একবারে নিশ্চিন্তি। সারাদিনে আর কিছু না খেলেও চলে।' ইহা শুনিয়া ঠাকুরমা খুব খুসি! সময় সময় কিন্তু ঠাকুরমার রান্না খুব সুস্বাদও হয়। কেন যে হয় বুঝি না!

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জিনিস পত্রও প্রচুর পরিমাণে আসিতেছে। কিন্তু ঠাকুরমা একদিনের জিনিস অন্যদিনের জন্য রাখেন না। প্রতিদিনই ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ফেলেন। প্রচুর পরিমাণে রান্না করিয়া, রাস্তাহইতে কাঙ্গাল দুঃখীদের ডাকিয়া আনিয়া, খাওয়াইতেছেন। অধিক রান্না করিতে নিষেধ করিলে, ঠাকুরমা ধমক দিয়া

বলেন, তোরা মানুষ না পশু ? মানুষকে না দিয়া কি কখন মানুষে খায় ; সে ত শিয়াল কুকুরেই করে ? ভগবান একমুঠো দয়া ক'রে দিলে, তা হ'তে একগ্রাসও অন্যকে দিতে হয়। ভগবানের দান, যার প্রয়োজন তারই জন্য, সকলেরই জন্য, পুঁজি করিবার জন্য নয়। এক বেলার কোন জিনিস অন্য বেলা থাকে না দেখিয়া, বৃন্দাবন বাবু একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ঠাকুরমাকে একটু হিসাব করিয়া চলিতে বলায়, ঠাকুরমা তাঁকে বলিলেন—"গিন্নি ! আমরা গোঁসাই বাড়ীর বউ, আজকের যা এলো তা হ'লো, কালকে গোবিন্দ আছেন।"

ঠাকুরের জন্য মাত্র এক সের দুধ রোজকরা আছে ; ঠাকুরমা ঐ দুধ আহারের সময় সকলকে একহাতা করিয়া বিলাইয়া দেন। ঠাকুরকেও ভাগ মত এক হাতাই দেন। সকলে এজন্য বিরক্ত, কিন্তু ঠাকুরমা কারও কথা গ্রাহ্য করেন না। একটি গুরুভগ্নী, এক সের দুধ গোপনে পৃথক রাখিয়া, ঠাকুরকে দিতেছেন।

একদিন ঝি, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া বাড়ী যাইতে ব্যস্ত। ঠাকুরমা তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত শীঘ্র যেতে ব্যস্ত হচ্ছিস্ যে ?" ঝি বলিল, "মা! আমার ছেলেটির অসুখ, আজ তাকে একটু দুধ মাত্র খেতে দেব। তারই জোগাড়ে যাব।"

ঠাকুরমা শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দাঁড়া।" এই বলিয়া, গুরুভগ্নীটির ঘরহইতে ঠাকুরের দুধ আনিয়া ঝিয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নিয়ে যা। ছেলে রোগা, কোথায় আবার তালাস করতে যাবি, যদি না পা'স্।" এই ব্যাপার লইয়া ঠাকুরমার সঙ্গে কোন কোন গুরুভ্রাতাভগিনীদের ঝগড়া হইল। সকলে ঠাকুরমাকে বলিলেন, "ঠাকুরমা! দুধ একটু না খেলে তোমার ছেলের যে অসুখ হয়, কষ্ট হয়, জান ?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "যাঃ, সব জানি। অসুখ হ'লে ঝিয়ের ছেলের কি কষ্ট হয় না ? বিজয়ের তোরা দশজন আছিস্, দরকার হ'লে দশ দিকে ছুটাছুটি করবি। ঝিয়ের ছেলের জন্য কে আর করতে যাবি !" ঠাকুরমা খুব গালাগালি দিয়াও সকলকে জব্দ করিতে না পারিয়া, ছুটিয়া ঠাকুরের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলেন, "বিজয়! তোর সঙ্গে সর্ব্বদা থেকেও এদের এরূপ বুদ্ধি হ'লো কেন?" ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল, তিনি ঠাকুরমাকে ঠাণ্ডা করিয়া সকলকে বলিলেন—"**মা'র প্রাণে যেরূপ দয়া, তার এক আনাও আমার নাই। ছেলেবেলা দেখেছি, ঝিয়ের ছেলেটিকে মা আমাদের সঙ্গে বসায়ে প্রত্যহ খাওয়াতেন। আমাদের মতন**
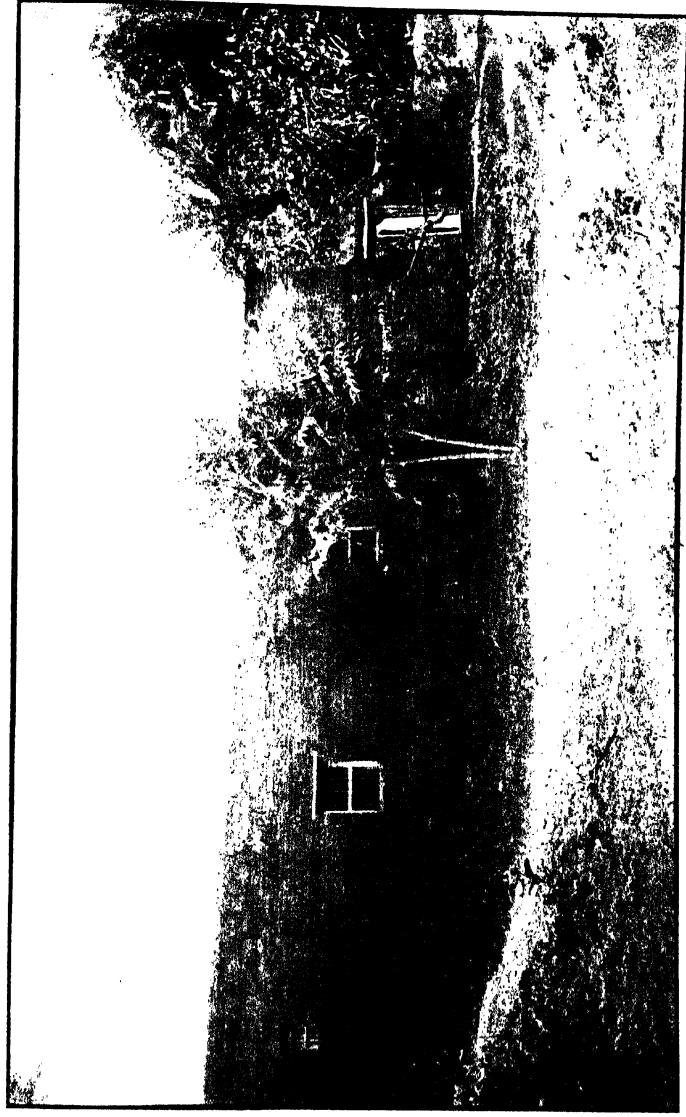
শীকারপুরে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর
মাতুলালয়।

আসন তারও ছিল। থালা, বাটি, গ্লাস, মা তাকে আমাদেরই মত কিনে দিয়েছিলেন। কোনও প্রকারে পৃথক মনে করতেন না। সে আমাদের সমবয়স্ক ছিল ব'লে ধুতি, চাদর, জামা, জুতা, মা যেমন আমাদের দিতেন, তাকেও দিতেন।"

আমাদের ভাণ্ডারঘরে, ঠাকুরের সেবা হয়। ঠাকুরের আহারান্তে, আমরা সকলে প্রসাদ বাটিয়া লই। ঝি পরে অবসরমত শূন্য বাসনগুলি লইয়া যায়। ঠাকুরমা এক দিন হঠাৎ ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া, বাসন পড়িয়া আছে দেখিয়া, একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন; ঠাকুরকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে বিজয়! একি অনাচার! এঁটো বাসন ভাঁড়ারে! ইন্দুর, বিড়াল, কত কি এ ঘরে আসে; এ ঘরের জিনিস কি ক'রে ঠাকুরের ভোগে লাগ্‌বে?" এই বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শুনিয়া অমনই ঠাকুরমার স্বরের উপর, আরও স্বর চড়াইয়া বলিলেন—"রাম! রাম! এক্ষণই ওসব ফেলে দাও। ওসব কি আর রাখ্‌তে আছে? রাম! রাম! এঁটোটা যদি সঙ্গে সঙ্গে কেহ তুলে নিতে না পার, তবে কা'ল থেকে আমিই নিব।" ঠাকুরমা অমনই সমস্ত জিনিস রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন, এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেন—"মা পঞ্চমে চড়্‌লে, আমাকেও সেই তালে সপ্তমে চড়্‌তে হয়, না হ'লে কি রক্ষা আছে? মাকে ঐ ভাবে ঠাণ্ডা না করলে, মা আজ একটা কাণ্ডই ক'রে ফেল্‌তেন। পাগলকে, অনেক সময়ে, তার বাগে চ'লে ঠাণ্ডা রাখ্‌তে হয়, না হ'লে তার অনিষ্ট করা হয়।"

ভোরকীর্ত্তন শেষ হইলেই, গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সময়ে, ঠাকুরমা একবার ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। ঠাকুর নিবিষ্ট ভাবে চোখ বুজিয়া থাকিলেও, ঠাকুরমা, ঠাকুরকে খুব স্নেহের সহিত ডাকিয়া বলেন, "ওরে বিজয়—নে পেরণাম কর্। এখন উঠ্ না; ভোর হয়েছে দেখচিস্ না?" ঠাকুর অমনই ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া, পদধূলি মাথায় নেন্ এবং কচি খোকাটির মত মা'র পানে একদৃষ্টে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন। এই সময়ে ঠাকুরের চাহনি আর একরকম হইয়া যায়। উহা দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইয়া বসিয়া থাকি। একদিন বৃন্দাবন বাবু, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়, আপনি ঠাকুরমার দিকে ওভাবে চেয়ে থাকেন কেন? আপনার ওরকম চাউনি দেখে, আমাদের ভিতরে যেন কেমন একটা হয়।"

ঠাকুর বলিলেন—“মা যখন এসে দাঁড়ান, মা'র প্রতিলোমকূপে ব্রহ্মজ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে আমি দেখ্‌তে পাই।”

ঠাকুরমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হইল—“ঠাকুরমা! আমাদের ঠাকুরের জন্মকথা কিছু বলুন না? লোকের মুখে ত কত রকমই শুনি।” ঠাকুরমা বলিলেন—‘লোকের মুখে আর কি শুনিস্? লোকে তা কি জানে? সাধারণ লোকের জন্ম যে ভাবে হয়, ওর জন্ম ত আর সে ভাবে হয় নাই! তা বল্‌লে বিশ্বাস করতে পারবি কেন? সে সময়ে ওর বাবা ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তেন; শান্তিপুর হ'তে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর্‌তে কর্‌তে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, কত ক'রে!—বুকেতে, হাতেতে, হাঁটুতে ছালা বেঁধে। ওরকম এখন কেউ করুক দেখিনি? তিনি জগন্নাথের দর্শন পেয়ে, যা প্রার্থনা কর্‌লেন, তাই হ'লো। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা ত ভগবান অপূর্ণ রাখেন না। বিজয় যখন আমার পেটে ছিল, উদয়াস্ত সূর্য্যের প্রতিরশ্মিতে, আমি রাধাকৃষ্ণের দর্শন পেতাম।’

ঠাকুরমা কখন কখন আমাদিগকে পরিহাস করিয়া বলেন—‘যা, তোরা ত কচুবুনোর শিষ্য।’ একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ঠাকুরমা, আপনি কি আর স্থান পেয়েছিলেন না? ছেলে হ'লো কচুবনে?’ ঠাকুরমা বলিলেন—“আরে! তখন যে শীকারপুরের বাড়ী বরকন্দাজ এসে ঘেরাও কর্‌লে, বাড়ী ছেড়ে সকলে পালাল; ঝড়, বৃষ্টি, তুফান, যাব কোথা? আমি গিয়ে বাড়ীর দ্বারে কচুবনে বস্‌লাম। কতক্ষণ পরে দেখি, বিজয় হয়েছে। প্রসব বেদনা ত হয় নাই, আগে বুঝ্‌ব কি ক'রে? তাই ত ওকে সকলে কচুবুনো বলে। আর ওর বাবাকে পাড়ার লোকে খড়িধোয়া গোঁসাই বল্‌ত।”

প্রশ্ন—‘কেন, তাঁকে খড়িধোয়া গোঁসাই বল্‌ত কেন?’ ঠাকুরমা বলিলেন—“আরে, তিনি যে ভারি আচারী ছিলেন, জানিস্? নিজে রান্না ক'রে হবিষ্যান্ন কর্‌তেন; রান্নার সময়ে প্রতিদিন প্রত্যেকখানা খড়ি জলে ধুয়ে নিতেন। এজন্য সকলে তাঁকে খড়িধোয়া গোঁসাই ব'লে ডাক্‌ত। ওরূপ লোক কি আর এখন হয়? কত ভক্ত ছিলেন! তিনি যখন ভাগবত পাঠ কর্‌তেন, তিন চার ঘণ্টা জ্ঞান থাক্‌ত না, গায়ের সাদা পাত্‌লা চাদরখানা, ঘামের মত রক্তে ভিজে যেত, লাল হ'য়ে যেত!”

ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—‘ঠাকুরমা, আপনি নাকি আঁতুড়ঘরে ঠাকুরকে বিষ খাওয়াইয়া ছিলেন?’ ঠাকুরমা বলিলেন—‘রাম, রাম! তোরা কি বল্ দেখিনি! তা কি আবার কেউ করে? ছেলের ঠাণ্ডা লেগেছিল। মুসব্বর যে লাগাতে হয়, তা ত

মাতুলালয় সংলগ্ন কচুবন।

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর জন্মস্থান।

আমি জানি না, আমি মুসব্বর ভেবে, দু' আনা আন্দাজ আফিং গুলে খাইয়েছিলাম; কালো হ'য়ে গিয়েছিল। তাতে আর ছেলের কি হ'ল? ভগবান্‌ই দয়া ক'রে রক্ষা কর্‌লেন।'

একদিন ঠাকুরমা, ঠাকুরকে বলিলেন—"বিজয়, তুই আর সব তীর্থে যাস্, শ্রীক্ষেত্রে যাস্ না।" ঠাকুরমার একথা বলার তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করায়, বলিলেন—'ও যে শ্রীক্ষেত্র হ'তেই এসেছে; শ্রীক্ষেত্রে একবার গেলে আর কি ওকে আন্‌তে পার্‌বি? ওর স্থানে একবার ও গেলে, আর ফিরে আস্‌বে না, সেইখানেই থেকে যাবে।'

ঠাকুরমা, ঠাকুরের সম্বন্ধে এই প্রকার অনেক কথা অনেক সময়ে বলেন, সে সকল কথার অর্থ কিছুই বুঝি না। মাথা গরম অবস্থায় ঠাকুরমা যা তা বলেন বলিয়াই মনে হয়। এ সকল কথা যথার্থ কি না, জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেছি, অবসর মত ঠাকুরকে এ সব বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা রহিল।

প্রসাদ কাকে বলে, কার্য্যাকার্য্য বুঝা শক্ত।

৫ই—১৮ই পৌষ।

প্রতিদিন প্রসাদ লইয়া আমাদের মধ্যে বিষম হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। ঝগড়াও সময়ে সময়ে হইয়া থাকে।

ঠাকুর ইহা জানিয়া বলিলেন—"ভুক্তাবশিষ্টকে প্রসাদ বলে না। উহা উচ্ছিষ্ট, এঁটো। প্রসন্ন ভাবই প্রসাদ। প্রসাদ ভাবেতে হয়। কৃপাই প্রসাদ, দয়াই প্রসাদ। গুরু যে সকল নিয়ম ক'রে দেন, তা ঠিক মত রক্ষা ক'রে চল্‌লেই, গুরুর যথার্থ প্রসাদ পাওয়া যায়।"

কোন ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া, গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে জ্ঞাত করায়, ঠাকুর বলিলেন—"যাঁরা অন্তর্দর্শী, তাঁরা বাইরের কার্য্যাকার্য্যের একটা মূল্যই দেন না। তাঁরা অন্তরের ভাবই দেখেন। কার কোন্ কার্য্যে উপকার হয়, তাও বুঝা বড় কঠিন। অনেক রোগী আছে, কুপথ্য ক'রে উৎকট রোগ হ'তে আরোগ্য লাভ করে। যে সমস্ত কার্য্যকে সংসারের লোকে নিতান্ত জঘন্য মনে করে, হয় ত তা অনুষ্ঠান ক'রে কারও জীবনের বিশেষ কল্যাণ হয়। কিসে কি হয়, তা বুঝা সহজ নয়। যিনি যা করুন না কেন, পরিণামে কল্যাণই হয়। নিজের কর্ত্তব্যে স্থির থেকে, অন্যের কার্য্য দেখে যেতে হয় মাত্র। তা হ'লেই রক্ষা। লোকের দোষ গুণের আলোচনাতে অনিষ্টই হয়।"

হইয়া যায়। তখন ঢাকা ও বানরীপাড়ার শশী বাবু প্রভৃতি খোলকরতাল সংযোগে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন—

"আমি গৌরপ্রেমে হয়েছি পাগল (ঔষধে আর মানে না)
চল্ সজনী যাইগো নদীয়ায়।
নগরেতে হেঁটে যেতে পাড়ার লোকে মন্দ কয়,
(আমি) পরের মন্দ পুষ্প চন্দন অলঙ্কার প'রেছি গায়।
সাপের বিষ ঝাড়িলে নামে, প্রেমের বিষ উজান ধায়,
(ওলো) গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হ'য়ে, দংশিয়াছে আমার গায়॥"

ভাববিহ্বল অন্তরে মহা-উৎসাহের সহিত উঁহারা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, অবশিষ্ট গুরুভ্রাতারা সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া আপন আপন আসনে নিস্পন্দ অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকেন। কখনও কখনও ঠাকুর ভাবাবেশে অধীর হইয়া বিস্তৃত ঘরের মেজেতে গড়াইতে গড়াইতে শিষ্যদের পদতলে যাইয়া লুটাইতে থাকেন, এবং শিষ্যদের চরণ মস্তকে বারংবার জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে—"**আমাকে দয়া করুন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন**" বলিতে বলিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন।

আহা! তখন ঠাকুরের জটাভারমণ্ডিত মস্তক, নগণ্য শিষ্যপদতলে লুঠিত দেখিয়া প্রাণে যে কি অবস্থা হয়, বলিতে পারি না। ধন্য দয়াল ঠাকুর! আমাদের মত অবাধ্য, কলহপ্রিয়, দুর্বিনীত, দাম্ভিকপ্রকৃতি নিজ আশ্রিত জনের চরণতলে কাতর হইয়া লুটাপুটি করে, এ জগতে এমন আর কে আছে?

পাপের মূল কিসে যায়? ধর্ম্ম কি?

৫ই—১৮ই পৌষ।

আজ একটু অবসর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"পাপের মূল কি চেষ্টাদ্বারা নষ্ট করা যায় না?"

ঠাকুর বলিলেন—"**পাপের মূলচ্ছেদ মানুষে সহজে করতে পারে না; এ বিষয়ে মানুষের শক্তি একেবারে নাই বল্‌লেও হয়। প্রায়শ্চিত্ত, ব্রতনিয়মাদি দ্বারা মানুষ পাপমুক্ত হয় বটে, কিন্তু তা সাময়িক, কুঞ্জরস্নানবৎ। অন্তরে সংস্কার অবস্থায় পাপ থেকে যায়, একটা তেমন কারণ পেলেই আবার প্রকাশ হ'য়ে পড়ে একমাত্র ভগবানের দর্শন লাভ হ'লে, তাঁরই কৃপায় পাপের মূল নষ্ট হ'য়ে যায়।**"

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

ইহা শুনিয়া বলিলাম—"তা হ'লে আর আমাদের করবার কি আছে? এম্‌নি পড়িয়া থাকি, তাঁর কৃপা যদি কখনও হয় ত হবে।"

ঠাকুর বলিলেন—"তা বল্‌লে চল্‌বে কেন? যতদিন পর্য্যন্ত চেষ্টা থাক্‌বে, কার্য্য না ক'রে কি নিস্তার আছে? কার্য্য করতেই হবে। নানাদিকে নানা প্রকার চেষ্টা ক'রেও, যখন মানুষ নিজেকে একেবারে অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য ব'লে বুঝ্‌তে পারে, তখনই সে ঠিক স্থানে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তা পরিষ্কার রূপে না বুঝা পর্য্যন্ত, সে মনে করে, চেষ্টা করলেই কৃতকার্য্য হ'তাম। সুতরাং ভগবানের শক্তির উপর যথার্থ নির্ভরটি হয় না। এজন্য পুনঃপুনঃ নিষ্ফল হ'লেও, অত্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চেষ্টা করতে হয়, না হ'লে হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ধর্ম্ম লাভ করতে হ'লে, প্রথমে কি কি বিষয় চেষ্টা করতে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"বলা ত যাচ্ছে কত, কিন্তু কর কই! ধর্ম্মার্থীদের প্রথমেই শৌচ, সত্য, ক্ষমা ও শান্তি এই চারিটি অভ্যাস করতে হয়?"

প্রশ্ন—"শৌচ কি শরীরটি শুদ্ধ রাখা?"

ঠাকুর—"হাঁ, তাই! গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে শারীরিক শৌচ, ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়া, আর গৃহীর পক্ষে শুধু ঋতুগামী হওয়া। আন্তরিক শৌচ 'সরলতা'। যথার্থ সরল হ'লেই অন্তর শুদ্ধ হয়।

'সত্য'—সত্য বাক্য, সত্য ব্যবহার ও সত্য চিন্তা। অসত্যের কোন প্রকার সংশ্রব না রাখা।

'ক্ষমা'—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা কারও হ'তেই উদ্বেগগ্রস্ত না হওয়া এবং কারও উদ্বেগের কারণ না হওয়া। এ বিষয়ে মনোযোগ রাখ্‌তে হয়।

'শান্তি'—চিত্তের অবস্থা সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট রাখা, এক প্রকার রাখা। কোন কিছুতে উপেক্ষা বা অপেক্ষা না রাখা। এ সব নিয়ম ধ'রে খুব চেষ্টা কর না।"

আমি এই সকল শুনিয়া ভাবিলাম, "মন্দ নয়! সিদ্ধ হইলে যে সকল অবস্থা লাভ হয় বলিয়া এতকাল মনে করিয়া আসিতেছি, ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে তাহাই প্রথম আরম্ভ, ইহাই ঠাকুর বলিলেন; সুতরাং ধর্ম্মলাভ, আমার পক্ষে হাতে চাঁদ ধরার মত কল্পনা মাত্র। যাহা কখনও হইবে না, তাহা লইয়া চেষ্টা করিতেছি মাত্র।"

ঠাকুরকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবে প্রকৃত ধর্ম্ম কি?"

ঠাকুর বলিলেন—"**ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম বস্তু। বাহিরের বেশ ভূষা, বাহিরের কাজ কর্ম্ম, এ সকল কিছুই ধর্ম্ম নয়। তবে এখন নিজে ভাল হওয়া এবং অন্যের ভাল করা, ইহাই ধর্ম্ম মনে কর্‌তে হবে। নির্জ্জন অন্ধকারে একাকী ব'সে, আত্মানুসন্ধান ক'রে দেখ্‌বে, নিজের ভিতরে কোন দোষ আছে কি না। নিজের কাছে নিজে ভাল হ'লেই ভাল। মিথ্যাকথা, কু-দৃষ্টিপাত, হিংসা, বিদ্বেষাদি যা যা দোষ ব'লে জান, তা আগে ত্যাগ কর। তার পরে, ত্রিতাপ অতীত হইলে, ধর্ম্ম কি বুঝ্‌বে। তাপমুক্ত না হ'লে, প্রকৃত ধর্ম্মের খোঁজই পাবার যো নাই। ভগবানই ধর্ম্ম।**"

মহাপ্রভুর পুরাণ চিত্রপট।

একদিন আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামদয়াল বাবু, একখানি চিত্রপট আনিয়া, ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ছোট দাদা (সারদা বাবু), কোন প্রয়োজনে ব্যস্ত হইয়া ঐ স্থান দিয়া চলায়, পাছে তাঁহার বস্ত্রাদি ঐ পটে লাগিয়া যায়, এই আশঙ্কায় খুব ত্রস্ত হইয়া, ঠাকুর চিত্রপটখানি হাতে তুলিয়া নিলেন এবং এক দৃষ্টে উঁহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, উহা মস্তকে ধরিয়া, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতে লাগিলেন। কিছুকালের জন্য ঠাকুর বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিলেন, পরে ভাব সংবরণ করিয়া চোখ মুখ পুঁছিয়া বলিলেন—"**মহাপ্রভুর ঐ সময়ের আকৃতি ঠিক এই প্রকারই ছিল। বিরহোন্মাদে জীর্ণশীর্ণ কলেবরের এবং ভাবাবেশে নৃত্যের এইরূপ অবিকল চিত্র আর দেখি নাই।**"

৫ই—১৮ই পৌষ।

চিত্রপটে মহাপ্রভুর চক্ষু দিয়া পিচকারীর মত বেগে অশ্রুজল পড়িতেছে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম—"একি আবার কখনও হয়!" ঠাকুর একটু তেজের সহিত বলিলেন—"**নিশ্চয়**

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুরাতন চিত্রপট।

হয়। চিত্রকর যেমন যেমনটি দেখেছিলেন, ঠিক তেমনটিই এঁকেছেন; তিন প্রভুরই আকৃতি ও নৃত্যের অবস্থা অবিকল দিয়েছেন। এক সময়ে যা সত্য সত্য ঘটে, অন্য সময়ে তা অসম্ভব মনে হয়। প্রার্থনাসময়ে কেশব বাবুর চোখ্ দিয়ে রক্তের ধারা কখনও কখনও পড়্ত। যারা দেখে নাই, কখনও কি বিশ্বাস করতে পেরেছে? এ ত সে দিনের কথা।" *

প্রশ্ন—"মহাপ্রভুর সময়ে ত ফটো তোলার প্রণালী ছিল না, অবিকল রূপ কি প্রকারে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"কেন, ধ্যানেতে ক'রে। তখনকার চিত্রকরদের এমন শক্তি ছিল, যা আঁক্‌বেন মনে কর্‌তেন, এমন একাগ্র হ'য়ে তা দেখ্‌তেন, যে ঐ চিত্র

* শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অন্তলীলার শেষ ভাগে, যখন তাঁহার শরীর অতিশয় শীর্ণ হইয়াছিল, তখন তদানীন্তন দিল্লীর বাদসাহ (সের্‌সাহ), তাঁহার বিবরণ লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিয়া, তাঁহার আলেখ্য তুলিবার জন্য কতিপয় সুনিপুণ শিল্পীকে পুরুষোত্তমে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় পঁহুছিয়াই দেখিলেন, মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন, পিচকারীর জলের মত তাঁহার অশ্রুধারা বেগে অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতেছে, আজানুলম্বিত ভুজ, সুবিশাল বক্ষঃ, চারি হস্ত দীর্ঘ সুন্দর কলেবর, একেবারে অস্থিসার হইয়া গিয়াছে। চিত্রকরেরা ঐ দৃশ্যটি অতি সতর্কতার সহিত অবিকল অঙ্কিত করিয়া বাদসাহকে আনিয়া দিলেন। সেই সময়হইতে দিল্লীর রাজধানীতে উহা অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছিল। পরে দিল্লী অবরোধের সময়ে উহা ভরতপুরের মহারাজার হস্তগত হয়। ভরতপুরের মহারাজা একবার শ্রীবৃন্দাবনে বাসকালে অনেক সময়ে লালা বাবুর কুঞ্জে শ্রীগুরুদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে যাইতেন। বাবাজী তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর লীলাকথা বলিতেন। ঐ সকল কথা শুনিয়া একদিন মহারাজা বলিলেন, 'প্রভো! আপনি যেরূপ বলেন, ঐ প্রকার একখানি চিত্রপট আমার রাজধানীতে আছে। বাবাজী উহা দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করাতে, মহারাজা উহা আনাইয়া বাবাজীকে দেন। পটের দিকে দৃষ্টি করিয়া বাবাজী কান্দিতে কান্দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে ঐ পট দেখিয়া, চিত্রকর দ্বারা অনুরূপ প্রতিকৃতি লওয়া হয়। সেই প্রতিকৃতিই এই চিত্রপট।

ঠাকুর এই চিত্রপটখানি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং এইটি যাহাতে লোপ না হয় সে জন্য ফটো রাখিতে বলিয়াছিলেন। এ কারণে পুরুষোত্তমধামে, ঠাকুরের (জটিয়া বাবার) সমাধিমন্দিরের সেবায়েত ছোট দাদা শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া, আমাদের ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ দেব ও রাধাকৃষ্ণের পটের সহিত, সমাধিমন্দিরে রাখিয়া নিয়মিত রূপে উহা পুজ করিতেছেন।

তাঁদের চক্ষে যেন ছাপ্ প'ড়ে যেত। কিছু দিন তাই তাঁরা ধ্যান কর্‌তেন এবং সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে, পরে সেই রূপ আঁক্‌তেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তাতে কি অবিকল রূপ হয়?”

ঠাকুর বলিলেন—“একেবারে ঠিক কি আর হয়? তবে প্রায় ঠিকই হয়। এখনও কৃষ্ণনগরের কুমারদের মধ্যে কারও কারও এ শক্তি অনেকটা আছে। যার ইচ্ছা হয়, যেয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে পার।”

ঠাকুর, এই চিত্রপটখানিকে অত্যন্ত জীর্ণ দেখিয়া, ইহার একখানা ফটো রাখিবার অভি-প্রায় জানাইলেন।

অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন—নাই যাই!

এখানে যতই দিন যাইতেছে, লোকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরের গুরুভ্রাতা ভগ্নীরা প্রতিদিনই দলে দলে আসিতেছেন। প্রত্যহই শতাধিক পাত পড়িতেছে। কেনারাম নামক এক প্রসিদ্ধ রসুয়ে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতি সপ্তাহেই দুই তিন দিন, দেড়শত দুইশত লোকের লুচি, মিষ্টান্ন, ঘৃতান্ন-প্রভৃতির বিপুল আয়োজন ও মহাঘটার সহিত ভোজনোৎসব হইতেছে। কোথা হইতে কোন্ দিন কি ভাবে এ সমস্ত সামগ্রী জুটিতেছে, অনেক অনুসন্ধানেও আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পরিচিত অপরিচিত বহুলোকের সমাগমে এবং সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবে আশ্রমটি দিনরাত যেন ঝম্ ঝম্ করিতেছে।

আশ্রমে সন্ধ্যাকীর্ত্তন যে কি অদ্ভুত ব্যাপার তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই। বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দ স্মরণ করিয়া দলে দলে শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, বণিক্ ও নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা প্রতিদিনই আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলেন। সন্ধ্যা হইলে ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া “হরিসে লাগি রহরে ভাই। তেরা বনাত বনাত বনি যাই” এবং “প্রভুজী য়্যায়সা নাম তুমহার। পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার,” কখন বা “গগনমে থালে রবি চন্দ্রদীপক বনি, তারকামণ্ডল চমকে মতি রে” এই সকল গান করিয়া আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। তৎপরে গুরুভ্রাতারা সকলে হরি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কোন কোন দিন প্রসিদ্ধ গায়ক মুকুন্দ ঘোষ বা রামতারণ ঘোষ অথবা বৈষ্ণবচরণ কুণ্ডু মহাশয় স্ব স্ব দলে মিলিত হইয়া মহা উৎসাহের সহিত মহাজন পদাবলী বা নাম গান করিয়া থাকেন। এই সঙ্কীর্ত্তনে নিত্যই ঠাকুরের নব নব অবস্থার

অদ্ভুত বিকাশ এবং ভক্তমণ্ডলীর চমৎকার ভাবোচ্ছ্বাসের মনোমোহন চিত্র প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। যে সকল ভাগ্যবান্ পুরুষ একদিনের জন্যও উহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন। এ জীবনে আর কখনও এ দৃশ্য ভুলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ!

গতকল্য সন্ধ্যার পর মহাসমারোহের কীর্ত্তনে তিন চারিটি খোল করতাল একতালে বাজিয়া উঠিলে, বহুলোকে যখন একতানে সমস্বরে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, ঠাকুর ক্ষণকাল আসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া দক্ষিণে বামে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী একবার ঠাকুরের পানে, আরবার ভক্তগণের দিকে, উল্লসিত প্রাণে তাকাইতে লাগিলেন। ঠাকুর, হস্তদ্বয় সম্মুখের দিকে উত্তোলন করিয়া, **"জয় শচীনন্দন" "জয় শচীনন্দন"** বলিতে বলিতে আসনহইতে উঠিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লোকই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ঠাকুর উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদান করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতৃগণ ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া বিবিধ প্রকার নৃত্য ও হরিধ্বনিতে আশ্রমটিকে কাঁপাইয়া তুলিলেন। জানি না কি দেখিলাম! ঠাকুরের প্রকাণ্ড শরীরটি ক্রমে ক্রমে খর্ব্বাকৃতি হইয়া গেল; "ঐরে ঐরে" বলিতে বলিতে তিনি বালকের মত মুষ্টিবদ্ধহস্তদ্বয় সম্মুখে ও পশ্চাতে ঘন ঘন আন্দোলিত করিয়া, বিস্তৃত হলঘরের এদিকে সেদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। মৃদঙ্গ ও করতালের তালি ঘন ঘন পড়িতে লাগিল; সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি, হুঙ্কার গর্জ্জনে মিলিত হইয়া, আশ্চর্য্য চমকে সকলকে দিশাহারা করিল। এ আবার কি অদ্ভুত দৃশ্য! ঠাকুর "ধর" "ধর" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বহু জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই অকস্মাৎ একস্থানে দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক নতশিরে বারংবার নমস্কার করিতে লাগিলেন। তৎপরে দক্ষিণ হস্ত পুনঃপুনঃ উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক, 'জয়রাধে' 'জয়রাধে' বলিতে বলিতে নিস্পন্দ নয়নে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন। শরীরটি স্থির, অথচ বাহু বক্ষঃস্থলাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুলকিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সম্মুখের ও উভয় পার্শ্বের লম্বিত জটাভার থরথর কম্পিত হইয়া মস্তকোপরি খাড়া হইয়া উঠিল এবং উহা সর্পফণার ন্যায় অগ্রভাগ বিস্তার করিয়া সর্‌সর্ কাঁপিতে লাগিল। ঐ সময়ে মস্তকহইতে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল ছটা এবং নেত্রদ্বয় হইতে জ্যোতির্ম্ময় স্ফুলিঙ্গরাশি বিদ্যুতের মত ছুটিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, অনেকে বিস্ময়সূচক চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর, ঊর্দ্ধদিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশপূর্ব্বক, "ঐ দেখ, আমাকে সকলে নিতে এসেছেন, আমি যাই, আমি যাই" বলিতে

বলিতে শ্রীঅঙ্গ হেলাইয়া দিলেন। 'ঠাকুর দেহ ছাড়িলেন,' 'ঠাকুর দেহ ছাড়িলেন,' বলিয়া চারিদিকে কান্নার শব্দ উঠিল। বহুলোকের উপর লম্ফ দিয়া আমরা চারি পাঁচজনে যাইয়া ঠাকুরকে জড়াইয়া ধরিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু, উন্মত্তের মত হইয়া, "দোহাই পরমহংসজী! দোহাই পরমহংসজী!! কখনই যেতে দিব না, কখনই যেতে দিব না" বলিতে বলিতে, মস্তক ও হস্তদ্বয় ঘন ঘন নাড়া দিয়া, ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। ভিতরে বাহিরে স্ত্রীলোক পুরুষের ভীষণ কান্নার রোল উঠিল। ঠাকুর অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর, 'জয়গুরু!' 'জয়গুরু!' বলিতে বলিতে উঠিয়া বসিলেন। চারি দিক্ নিস্তব্ধ! আগন্তুক ভদ্রলোক সকল ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁরা সব কে এসে আপনাকে টানাটানি কর্‌ছিলেন? আমাদের ত মনে হ'লো বুঝি এবার আপনি চ'লে গেলেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"গতিক তাই বটে! গৌর শিরোমণি মশায়, যোগজীবনের মা, শ্রীবৃন্দাবনের সখিগণ এবং আরও অনেকে এসেছিলেন। ঐ সময়ে পরমহংসজী * হঠাৎ উপস্থিত হ'য়ে বাধা দিলেন। গুরুজীর ইচ্ছা না হ'লে কারও চেষ্টাতে ত কিছু হবার যো নাই!"

প্রশ্ন—"গৌর শিরোমণি মহাশয় কি এ শক্তি লাভ করেছিলেন?"

ঠাকুর—"এ শক্তি লাভ না কর্‌লে রাসমণ্ডলে প্রবেশ কর্‌বেন কিরূপে?"

প্রশ্ন—"রাসমণ্ডলে প্রবেশকালে নাকি সখিদেহ লাভ হয়?"

ঠাকুর—"হাঁ, পুরুষের ওখানে প্রবেশাধিকার নাই।"

গতকল্যকার ভাবোন্মাদের মধ্যে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমার দৃষ্টি কিন্তু ঠাকুরের দিকেই ছিল। স্মৃতিতে যতটুকু জাগরূক আছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। সমস্ত অবস্থা ও ভাবের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রাখিতে পারিলাম কি না, জানি না!

সঙ্কীর্ত্তনে গুরুভ্রাতাদের নানাপ্রকার ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সাধন ভজন কোন গুরুভ্রাতাহইতে যে কম করিতেছি তা নয়, সকলেই ত বিষয় কার্য্যে

* মানসসরোবরবাসী ৺শ্রীশ্রী ব্রহ্মানন্দ স্বামী পরমহংস, যিনি গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে প্রভুজীকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নিদেশে তিনি ৺কাশীধামে শ্রীশ্রীহরিহরানন্দ স্বামী সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বা বাজে গল্পে দিন কাটাইতেছেন। আমি ত প্রায় সারা দিনই নাম করি। তবে আমার এরূপ শুষ্কতা কেন? এসব অবস্থা সাধনসাপেক্ষ হইলে, আমারই ত সকলের আগে হইবার কথা। আর কৃপাসাপেক্ষ হইলে, অযোগ্যে কৃপা হইল, যোগ্যে হইল না, ভগবানের এই অবিচারই বা কেন?

ঠাকুরসম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবুর কথা।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি খবর আসিল, যোগজীবনের স্ত্রী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কিছুকালযাবৎ অবিরাম জ্বরে ভুগিয়া এখন তিনি একরূপ মৃত্যুশয্যায় আছেন। গেণ্ডারিয়ার সকলেই তাঁহাকে লইয়া অস্থির। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই ঢাকা যাইতে ইচ্ছা জানাইলেন। আমরাও সকলে পৌষ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুরের সঙ্গে ঢাকা যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

ঢাকাযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু, ঠাকুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ নির্জ্জনে আলাপ করিলেন। কি বলিলেন, কিছুই তখন জানি না। পরে এক সময়ে ছোট দাদা ও কুঞ্জ গুহ মহাশয়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"গোঁসাই মনের কথা বলিতে পারেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিতাম না। গোঁসাইকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গোঁসাই! বলুন ত আমি কোন্ চক্রে।' গোঁসাই অমনি ষট্‌চক্রের মধ্যে ঠিক সেই চক্রের নাম লইয়া বলিলেন—'আপনি *** চক্রে ঘুরিতেছেন।' গোঁসাইয়ের নিকট আমার দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা জানাইলে তিনি বলিলেন—"আপনাকে আমি বন্ধুভাবে দেখি, আপনার আর প্রয়োজন নাই।"

নগেন্দ্র বাবু এই দুই জনকে এবং আরও কাহাকে কাহাকে ঠাকুরের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "গোঁসাই যে দিন কলিকাতা আসিলেন, সেই দিন শূন্যপথে তিনি আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাহাতেই আমি পরিষ্কার বুঝিয়াছিলাম, গোঁসাই আসিতেছেন। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। গোঁসাই ষ্টেশনহইতে সোজা আমার বাসায়ই ঐ দিন রাত্রে আসিয়া উঠিলেন।"

ঠাকুরের ঢাকাযাত্রা—গুরুভ্রাতাদের অবস্থা।

রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে ট্রেন ছাড়িবার কাল নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও ঠাকুরের তাড়াতে আমরা ছয়টার সময়েই বাসাহইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ঠাকুর ট্রেন-যোগে যখনই যে কোন স্থানে যান, দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে গিয়া বসিয়া থাকেন, ইহা ছেলেবেলাহইতে ঠাকুরের একটি অলঙ্ঘ্য নিয়ম। আমরা বহুপূর্ব্বে ষ্টেশনে যাইতে ঠাকুরের ব্যস্ততা দেখিয়া অনেক সময়ে বিরক্ত হইয়া পড়ি।

ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন—"অনর্থক বাসায় সময় কাটায়ে পরে অস্থির হ'য়ে ছুটাছুটি করার চেয়ে, বরং দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ব'সে থাকা ভাল। আমি কোথাও যেতে হ'লে ওরূপই করি। জীবনে আমি কখনও ট্রেন 'মিস্' করি নাই।"

সন্ধ্যার একটু পরেই গুরুভ্রাতারা সকলে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। আজ আনন্দের হাট ভাঙ্গিল। গুরুভ্রাতাদের কাহারও মনে শান্তি নাই। সকলেরই মুখ মলিন এবং চিত্ত স্ফূর্ত্তিহীন। ঠাকুর যত ক্ষণ ষ্টেশনে ছিলেন, সকলেই ঠাকুরকে ঘিরিয়া নির্ব্বাক্ অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। গাড়ি ছাড়িবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে, সকলে ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও ছল্ ছল্ চক্ষে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিয়া করজোড়ে মস্তক অবনত করিয়া প্রতিনমস্কার করিতে লাগিলেন। এ সময়ে গুরুভ্রাতারা আর কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহাদের কাতর প্রাণ আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেহ কেহ দাঁড়ান অবস্থায় থাকিয়া, কেহ কেহ বা অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন, আবার কেহ 'প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে' পড়িয়া গিয়া হাত পা আছড়াইতে লাগিলেন। উঁহাদের ঐ সকল অবস্থা দেখিয়া আমাদেরও প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। গাড়ির ভিতরে বাহিরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। এমন সময়ে গাড়িও ছাড়িয়া দিল। আহা! মাসাধিক কাল ঠাকুরের নিত্য-সঙ্গী নবীন বাবু, অচিন্ত্য বাবু, মণি বাবু, বৃন্দাবন বাবু, দেবেন্দ্র সামন্ত, কুঞ্জ গুহ, শ্রীচরণ বাবু, মহেন্দ্র বাবু, ছোট দাদা ও মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতির অনুরাগবিহ্বল বিষণ্ণ মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে দুঃখিত মনে আমরা গোয়ালন্দ চলিলাম। মনে হইতে লাগিল, 'হায় অদৃষ্ট! এ সকল গুরুভ্রাতার অনুরাগের কণিকামাত্র পাইয়া ঠাকুরকে স্মরণ

করিতে করিতে ক্ষণকালের জন্যও যদি আমি এইরূপ কান্দিতে পারিতাম, এ জীবন ধন্য হইয়া যাইত।'

পদ্মার জল হাওয়া; সাহেবের পরিহাস।

আমরা সমস্ত রাত্রি গাড়িতে থাকিয়া সকাল বেলা গোয়ালন্দ ষ্টীমারে উঠিলাম। একখানা বড় কম্বল বিছাইয়া সকলে ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে বসিয়া পড়িলাম। ঠাকুর পদ্মানদী দেখিয়া বড় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন— **"গঙ্গার প্রবল ধারাটিই এই পদ্মায় মিলে প্রবাহিত হ'চ্ছে। পদ্মার হাওয়াতে শরীরের জড়তা নষ্ট করে, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সতেজ ক'রে তুলে। জলের অসাধারণ গুণ। আধফুটা চাল বা কাঁচা চিড়ে আধ সের খেলেও, পদ্মার এক ঘটি জল খেলে তা অনায়াসে হজম হ'য়ে যায়। পদ্মাতীরবাসী মাঝিরা যেরূপ সবল এবং সুস্থ এরূপ প্রায় দেখা যায় না। পদ্মানদীর বিস্তৃতি দেখ্‌লে চিত্তটি যেন প্রশান্ত হ'য়ে পড়ে।"**

ঠাকুর পদ্মার জল হাওয়ার গুণ কিছুক্ষণ বলিয়া চুপ করিলেন। এ স্থলে সুন্দর একটি ঘটনা লিখিতেছি। মধ্যাহ্নকালে ঠাকুর শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন, ভাবের প্রগাঢ়তায় বারংবার ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন, আবার মাথা তুলিতেছেন; অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। গুরুভ্রাতারাও নির্ব্বাক, আপন আপন ইষ্ট নাম স্মরণে স্থির! দূরহইতে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী সাহেব, ঠাকুরকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া, মাতাল অনুমানে, ঠাকুরের সম্মুখীন হইয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, "ক্যা জী, দারু পিয়া? কেৎনা পিয়া? আরে তোম্ ক্যায়সা দারু পিয়া?" সাহেব দু' তিন বার ঐ প্রকার বলাতে ঠাকুর মাথা তুলিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন— **"হাঁ, দারু পিয়া, বহুত পিয়া। তুমহারা যীশুখ্রীষ্ট যো দারু পিতে থে, হাম্ তো আভি ওহি দারু পিয়া।"**

সাহেব শুনিয়া, একটু চমকিয়া, কয়েক সেকেণ্ড ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে, লজ্জিত ভাবে একটু হাসিয়া, মাথার টুপি তুলিয়া দু' হাতে ঠাকুরকে সেলাম দিতে দিতে স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

রাত্রিতে আমরা দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে পঁহুছিলাম। আশ্রম লোকে পরিপূর্ণ; ঠাকুরকে পাইয়া সকলেরই মহা আনন্দ।

শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামীর স্ত্রী বসন্তকুমারীর দেহত্যাগ।

২৫শে পৌষ, শুক্রবার।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়াছেন। আশ্রমস্থ এবং সহরনিবাসী গুরুভ্রাতা ভগিনী-দিগকে পাইয়া আমাদের যেমনই একটা আনন্দ ও উৎসাহ প্রাণে জাগিয়াছে, যোগজীবনের স্ত্রীর মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া তেমনই আবার একটা আতঙ্ক ও বিমর্ষভাব সকলের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দিবারাত্র বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসা করিয়াও একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে ঠাকুর আশ্রমে উপস্থিত হওয়াতে কাহারও কাহারও প্রাণে একটু ভরসা জন্মিয়াছিল, বুঝি এ যাত্রা বসন্তকুমারী রক্ষা পাইবেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে উঁহার অবস্থা ক্রমশঃ সাংঘাতিক হইয়া পড়াতে সকলেই একেবারে হতাশ হইলেন।

বসন্তকুমারীর সেবার বন্দোবস্ত করিবার জন্যই ঠাকুর যোগজীবনকে গেণ্ডারিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সেবাকার্য্যে নিতান্ত অপটু বলিয়াই হউক অথবা আজন্ম উদাসপ্রকৃতি বলিয়াই হউক, তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যথানিয়মে সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার যাতনা লাঘবের তেমন সহায়তা করিতে পারেন নাই; তথাপি তাঁহার আগমন ও উপস্থিতিই বসন্তকুমারীকে যে আনন্দ ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছে ইহাই পরমকারুণিক গুরুদেবের ব্যবস্থা ও আদেশেরই ফল মনে হয়।

২৩শে পৌষ বধূর বিকারের মত অবস্থা ও শ্বাসের ক্রিয়া চলিতে লাগিল, ঠাকুরকে উহা জ্ঞাত করায় ঠাকুর বলিলেন—"**দৈহিক সামান্য যাহা একটু ভোগ আছে, প্রাণায়ামে তাহাই পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছে।**"

২৫শে তারিখে বসন্তকুমারী ঠাকুরকে দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর, উঁহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বসন্তকুমারী কৃতাঞ্জলি হইয়া কান্দিতে কান্দিতে ঠাকুরকে বলিলেন, 'বাবা, আর কত দুঃখ দিবে বাবা?'

ঠাকুর অশ্রুসিক্ত নেত্রে বলিলেন—"**মা! তোমার ক্লেশের অবসান হ'ল ব'লে।**"

ঐ দিন ডাক্তার বাবু একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঠাকুরকে গিয়া বলিলেন—'তিন দিন

যাবৎ বসন্তকুমারীর ভয়ঙ্কর শ্বাস চলিয়াছে, এ অবস্থায় আর কত কাল থাকিবে ? এই অবস্থা ত আর দেখা যায় না।'

ঠাকুর বলিলেন—"আর বিলম্ব নাই, সময় প্রায় হ'য়ে এলো ; তবে সাংসারিক ব্যাপারে বুড়োঠাক্‌রুণ হ'তে সময়ে সময়ে গালিগালাজ খাওয়াতে, বুড়োঠাক্‌রুণের উপর এখনও উঁহার একটা বিরক্তিভাব আছে, সেটুকু গেলেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যায়।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—'তা আর হবে কিরূপে ?'

ঠাকুর বলিলেন—"বুড়োঠাক্‌রুণ যেয়ে ওকে একটু প্রসন্ন কর্‌লেই হয়। এজন্য আর ব্যস্ত হ'তে হবে না, এখনই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

ইহার পর রোগীর অবস্থা নিতান্তই খারাপ হইয়া পড়িল দেখিয়া, দিদিমা অস্থির হইয়া পড়িলেন। বউ এবার চলিলেন বুঝিয়া, দিদিমা কান্দিতে কান্দিতে বধূর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন, 'বউ! আমি যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকি, কষ্ট দিয়ে থাকি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' বসন্তকুমারী দিদিমার আকুল কান্না দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া, ছল্‌ছল্ চক্ষে বাহুদ্বারা দিদিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া খুব বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, 'দিদিমা! আপনি ত কোনও অপরাধই করেন নাই।' এই ঘটনার পরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, পুণ্যশীলা ভাগ্যবতী বসন্তকুমারী অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, জ্যেষ্ঠ সহোদর জগবন্ধু বাবুর সমক্ষে, আশ্রমস্থ সমস্ত গুরুভ্রাতাভগ্নীকে কান্দাইয়া, স্বামীর পদান্তিকে, গুরুর আশ্রমে দেহরক্ষা করিলেন।

মাঘ।

যোগজীবনের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক অবস্থা।

প্রশ্নোত্তর।

বসন্তকুমারীর অচিরে দেহত্যাগ ঘটিবে অনুমান করিয়াই, আমি ঠাকুরের নিকট হোমের ঘৃত ও আহারের চাউলের অভাব হইয়াছে জানাইয়া, অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বাড়ী গেলাম। সাত দিন পরে আবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম বহু গুরুভ্রাতা সমবেত হইয়া হরিধ্বনিসহকারে বসন্তকুমারীর পবিত্র কলেবর শ্যামপুর শ্মশানঘাটে নিয়াছিলেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে, যোগজীবনই উঁহার মুখাগ্নি করিয়াছিলেন। দেহে অগ্নিসংস্কার কালে অকস্মাৎ একটি গোলাকৃতি জ্যোতিঃপিণ্ড চিতাহইতে উত্থিত হইয়া নক্ষত্রবেগে উর্দ্ধদিকে অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গিয়াছিল। শ্মশানবন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিলেন।

৫ই মাঘ, সোমবার।

গেণ্ডারিয়া পঁহুছিবার পরদিনই, সকালে চা-সেবার পর, ঠাকুর আমাকে বলিলেন— **"তুমি যোগজীবনকে শ্রাদ্ধের মন্ত্রগুলি পড়াইতে পারিবে?"**

আমি বলিলাম—"শ্রাদ্ধমন্ত্র আমি জানি না।"

ঠাকুর বলিলেন—**"পুস্তক দেখে পড়াবে, ওতে আর জানা না জানা কি?"**

আমি—"শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়ার সময়ে ত কতপ্রকার প্রক্রিয়া করে দেখেছি, সে সব ত আমার কিছুই জানা নাই। আর সংস্কৃতও আমি ভাল জানি না। শ্রাদ্ধমন্ত্র আমাকে পড়াতে হ'লে, এখন থেকে পুস্তক দেখে অভ্যাস ক'রে রাখ্‌তে হয়; না হ'লে শুদ্ধমত পড়াতে পার্‌ব না।"

ঠাকুর আমাকে আর কিছুই বলিলেন না। একাদশ দিবসে, ঠাকুর নিজেই শ্রাদ্ধপদ্ধতি দেখিয়া যোগজীবনকে শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়াইলেন, এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মত শ্রাদ্ধকার্য্য করাই-লেন। শ্রাদ্ধের পর, ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন—**"বসন্ত শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত থেকে হাত পেতে পিণ্ড গ্রহণ কর্‌লেন; সূক্ষ্ম দেহটি পরিত্যাগ ক'রে, দুর্লভ কারণ-দেহ লাভ কর্‌লেন।"**

সময়মত জিজ্ঞাসা করিলাম—"জীবের কি প্রকার অবস্থাতে, দেহত্যাগের পরেই আবার দেহ আশ্রয় করতে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বিষয়েতে যাঁদের অতিশয় বাসনা রয়েছে, ভোগ-ইচ্ছা যাঁদের অত্যন্ত প্রবল, তাঁরাই দেহত্যাগমাত্রে অপর দেহ আশ্রয় করেন।"

প্রশ্ন—"পিতৃলোকে কাহারা যান ?"

ঠাকুর—"বিষয় উপস্থিত হ'লে যাঁরা ভোগ করেন, কিন্তু তা লাভের জন্য তেমন প্রবল স্পৃহা রাখেন না, সাধারণতঃ তাঁরাই পিতৃলোকে গমন করেন।"

প্রশ্ন—"বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মলোকে এবং তারও অতীত লোকে জীব কি অবস্থা হ'লে যায় ?"

ঠাকুর—"যাঁরা ধর্ম্মমাত্র লক্ষ্য রেখে, কোনও প্রকার সদনুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করেন, কর্ম্মানুসারে বাসনানুযায়ী এক এক প্রকার লোক তাঁদের লাভ হয়। আর সমস্ত বাসনার মূল পর্য্যন্ত যাঁদের নষ্ট হ'য়ে যায়, একমাত্র ভগবান্‌ই লক্ষ্য থাকেন, তাঁদেরই ব্রহ্মলোকের অতীত স্থানে গতি হয়। শুধু বাসনা-হেতু জীবের ভিন্ন ভিন্ন লোকে গতি হয়।"

ইহা ব্যতীত লোকান্তরপ্রাপ্তির অন্য কোনও হেতু আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব মনে করা মাত্র, ঠাকুর নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন—"এ সকল বিষয়ে আরও অনেক মীমাংসা আছে, কিন্তু সকলের কাছে সকল অবস্থার কথা বল্‌তে নাই। যে যে অবস্থার লোক, যার যে দিক্ দিয়ে বুঝ্‌বার অধিকার, তাকে সেইরূপই বল্‌তে হয়; নইলে সে তা ধরতে পারে না, বল্‌লে উপকার না হ'য়ে বরং অনিষ্টই হয়। এ সব শুনে কিছু লাভ নাই, কাজ ক'রে যেতে হয়।"

আশ্রমে অশান্তি।

৯ই মাঘ, শুক্রবার।

ঠাকুরের নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে পারিলে সহস্র অসুবিধাকেও অসুবিধা মনে করি না, এ প্রকার আস্ফালন আমরা অনেকেই যখন তখন পরস্পরের নিকটে করিয়া আসিতেছি। এবার গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসা অবধি, আমাদের সেই অভিমান, ভগবান্ পদে পদে চূর্ণ করিতেছেন। কয়েকদিনযাবৎ,

ঠাকুরের সন্নিধিসত্ত্বেও আশ্রমে বিষম অশান্তি চলিতেছে। গুরুভ্রাতারা সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন; কি করি, কোথায় যাই, সকলেরই ভিতরে এরূপ একটা উদ্বেগের আন্দোলন হইতেছে।

আশ্রমে একটিমাত্র চাকর, সে বাহিরের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত। রসুয়ে ব্রাহ্মণ, আশ্রমে কোনকালেই ছিল না, এখনও নাই। শান্তিসুধা রোগে অকর্ম্মণ্যা; একাকী দিদিমা, রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়াও, এই বৃদ্ধাবস্থায় আশ্রমস্থ সকলের এবং অতিথি অভ্যাগত লোকদের রান্না, পরিবেশন এবং বাসনমাজা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া একেবারে হয়রান হইয়া পড়িলেন। সুতরাং নিজের অসমর্থতা জানাইয়া, প্রতিদিনই তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে এ সকল কার্য্যভার লইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা এত কাল এ সকল সেবা গুরুপরিবারহইতে অবাধে স্বচ্ছন্দে ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, একারণেই এখন দিদিমার এ সকল আপত্তি বা গালাগালিতে কেহ কর্ণপাতই করিলেন না। এদিকে অর্থেরও অতিরিক্ত অনটন উপস্থিত হইল। শুধু ভাতের সঙ্গে ডাল বা তরকারি ব্যতীত আহারের আর কোন ব্যবস্থাই রহিল না। প্রতিদিন একই প্রকার, অতএব অধিকতর অরুচিকর খাদ্য খাইয়া এবং বিরক্তির সহিত প্রদত্ত আহারের সঙ্গে গালাগালি ভোগ করিয়া, গুরুভ্রাতারা অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। দিদিমার কোনও কার্য্যে কেহ কোনও প্রকার সাহায্য বা অর্থকৃচ্ছ্রতায় সহানুভূতি না করিয়া বরং তীব্রভাষায় তাঁহার অর্থলোভ, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বশতঃই এখানে এ সমস্ত অসুবিধা ভোগ হইতেছে, এই প্রকার আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই অশান্তির সহিত ঝগড়া বিবাদ ক্রমে ক্রমে এতই বৃদ্ধি হইল যে, অবশেষে গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইলেন, কেহ কেহ অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের বাড়ীতে আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন; আবার কেহ কেহ আশ্রম ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। দিদিমার দোষালোচনাই সকলের ভজন সাধন হইয়া উঠিল।

পবিত্র আশ্রমে, সামান্য আহার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহার লইয়া, পরস্পরের ভিতরে মনোবাদ ও সময়ে সময়ে তুমুল ঝগড়া বিবাদ চলিল দেখিয়া, ভাবিলাম—'এ আবার কি? ঠাকুরের পরম শান্তিপ্রদ সঙ্গলাভই যাঁহাদের এস্থানে থাকিবার একমাত্র উদ্দেশ্য, তুচ্ছ আহার ব্যবহার লইয়াও তাঁহাদের চিত্ত এত উত্তপ্ত হয়? ঠাকুর আমাকে স্বপাক আহারের আদেশ করিয়া বড়ই সুখে রাখিয়াছেন। আমি এই সকল গোলমালহইতে তফাৎ থাকিয়া, বেশ আনন্দে আছি।' গুরুভ্রাতাদের অবস্থা দেখিয়া, আমি দিন দিন গর্ব্বিত হইতে লাগিলাম।

এ সময়ে কিছুদিনের মধ্যেই, আশ্রমের গরম হাওয়াতে, আমাকেও ফাঁফর করিয়া তুলিল। আমিও পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলাম।

আমার চাউলের অভাব হইলেই, বাড়ীহইতে লইয়া আসি। দিবসান্তে একবার মাত্র ভাতে সিদ্ধ ভাত বা খিঁচুড়ী আহার করি। দক্ষিণের চৌচালা ঘরে বিকাল বেলা বহু লোকের আড্ডা হয় বলিয়া, ভাঁড়ার ঘরের বারেন্দায় রান্না করিতে লাগিলাম। ঠাকুরের আদেশমত পর্দ্দা খাটাইয়া, নির্জ্জনে আমাকে আহার করিতে হয়। ভাণ্ডার ঘরের বারেন্দায় আহারের ব্যবস্থা করাতে, ভাণ্ডারের তরিতরকারি, ডাল, লবণ প্রভৃতি চুরি করি বলিয়া, মিথ্যা অপবাদ আমার নামে রটনা হইল।

আহারের সময়ে কি আহার করি, আড়ে থাকিয়া কেহ কেহ তাহারও অনুসন্ধান নিতে লাগিলেন। আমি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া জ্বলিয়া যাইতে লাগিলাম। অবিলম্বে দক্ষিণের চৌচালার বারেন্দায় রান্না করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু তাহাতেও অপবাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। দু' মুঠো চাউল সিদ্ধ করিতে দুই তিনখানা কাষ্ঠই যথেষ্ট। এই কাষ্ঠ, আমি অবসরমত বৃক্ষের শুষ্ক ডাল ভাঙ্গিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখি। যদি কখনও আমার কাষ্ঠ না থাকে, আশ্রমহইতে প্রয়োজনমত উহা গ্রহণ করি। তাহা লইয়াও নানা কথা উঠিল। আমি, এ সকল উৎপাত দেখিয়া, আশ্রমের কোন বস্তুতেই হাত দিব না সঙ্কল্প করিলাম। সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া এত অশান্তি আশ্রমে ঘটিতেছে, অথচ ঠাকুর নির্ব্বাক্ ও উদাসীন রহিয়াছেন দেখিয়া, ঠাকুরের উপর বড়ই বিরক্তি ও রাগ হইল। জানি না কত কাল এ সকল স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন হিংসা, বিদ্বেষ, জ্বালা, যন্ত্রণা, আমাদের ভিতরে বর্ত্তমান থাকিবে। ঠাকুর, সকলকে নিজ প্রকৃতিমত চলিতে দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি?

সময়মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মায়িক বিষয়ের সম্বন্ধ হেতু, কত কাল জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"আরে বাপু! কত জ্ঞানী, কত যোগী, কত বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা, মায়ার চক্রে প'ড়ে, একেবারে অস্থির হ'য়ে যান। কোন্ সময়ে, কার ভিতরে, কোন্ ছিদ্র দিয়ে পাপ প্রবেশ করে বলা যায় না। এ জন্য সর্ব্বদা কেবল ভগবান্‌কে নিয়ে থাক্‌তে হয়। সৎসঙ্গে, সদালাপে, সদনুষ্ঠানে, সচ্চিন্তায় প্রাতঃকাল হ'তে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত, কাটায়ে দিতে হয়; আর মনে মনে সর্ব্বদা প্রার্থনা করতে হয়—'ঠাকুর! আমাকে তোমার ক'রে নেও।

তোমাকে ছেড়ে আর কিছুই যেন আমি না চাই।' দিবা রাত্রি এই ভাবে কাটায়ে দিতে পার্‌লে, ভগবানের দয়াতে মায়া মোহ হ'তে ক্রমে ক্রমে রক্ষা পাওয়া যায়। তাঁর কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হবার যো নাই, তাঁর বিন্দুমাত্র কৃপা হ'লে, মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্তই সম্ভব হয়।"

বসন্তকুমারীর দেহত্যাগের পর যোগজীবন ভাবিলেন, 'এবার সংসারবন্ধনহইতে মুক্ত হইলাম; এখন সর্ব্বদা নিরুদ্বেগে ঠাকুরের সঙ্গে পরমানন্দে থাকিতে পারিব।' যোগজীবনের স্ত্রীর জন্য সকলের বিষণ্ণভাব হইলেও যোগজীবনের বিন্দুমাত্র তাহা দেখিলাম না; গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায়, "আর সংসার করিতে হইবে না" বলিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিয়া, তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুর শৌচে যাইবার সময়ে, যোগজীবনকে সম্মুখে দেখিয়া হঠাৎ বলিলেন—"যোগজীবন নিশ্চয় জেনে রাখিস্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও, বড় জোর সাময়িক একটা আনন্দের ঢেউ প্রাণে তুলে দিতে পারেন, প্রারব্ধের ভোগ নষ্ট ক'রে দিতে পারেন না; সে শুধু একজনারই হাতে।"

দিদিমা কয়েক দিন পরেই যোগজীবনের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গুরুভ্রাতারাও কেহ কেহ ঠাকুরের নিকটে এ বিষয়ে কথা তুলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"আমি ওকে আর বিবাহ কর্‌তে বলি না, তবে ওর তেমন ইচ্ছা হ'লে কর্‌বে; বিবাহ আর করা ঠিক নয়।"

দিদিমা ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, গুরুভ্রাতা ভগ্নীরাও অনেকে "যোগজীবনের আর বিবাহ হইবে না, গুরুবংশ লোপ হইবে" ভাবিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু আশা কেহ একেবারে ছাড়িলেন না, মনে করিলেন, 'ঠাকুর এখন নিষেধ করিলেন, আবার হয় ত কখনও বা বিবাহের অনুমতি দিতেও পারেন।'

ঠাকুরের এ সময়ে দৈনন্দিন কার্য্য।

১১ই মাঘ, রবিবার।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আসিয়াছেন প্রচারিত হইলে, সহরহইতে দলে দলে লোক আশ্রমে আসিতে লাগিল। সকাল বেলা ঠাকুরের কথাবার্ত্তা বলিবার অবসর হয় না, সুতরাং বিকাল বেলাই লোকের ভিড় হইতেছে। ঠাকুর প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে আসন ত্যাগ করিয়া, কূয়াতলায় যান। শৌচান্তে, আসনে না যাইয়া

খড়ম পায়ে ও দণ্ড হাতে আশ্রমের দক্ষিণ দিকে পা-চালি করিতে থাকেন। বৃক্ষ লতার নিকটে নিকটে যাইয়া উহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। কোন কোনটিকে কতই যেন স্নেহভাবে স্পর্শ করেন। চারা গাছের বৃদ্ধি এবং দূর হইতে লতার বৃক্ষাবলম্বনের কৌশল ও চেষ্টা দেখিয়া, আনন্দ করিতে থাকেন। উহাদেরও আপন আপন প্রয়োজন মত চলিবার জন্য দৃষ্টিশক্তি আছে; সুখ দুঃখের অনুভব ও বিচারবুদ্ধি মনুষ্য অপেক্ষা কম নয়, তাহার প্রমাণ দেখাইতে থাকেন। সবুজ গাছে লাল ফুল, এক ফুলের নানা রং, শৃঙ্খলাবদ্ধ পাপ্‌ড়ি দেখিতে দেখিতে সময়ে সময়ে ভাবে ডুবিয়া যান। বেড়াইবার ছলে মাঠাকৃরুণের মন্দিরটিকে পরিক্রমা করিয়া, কুঞ্জ বাবুর বাড়ীর দক্ষিণ দিকে পুকুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ঘাসের উপরে যাইয়া দাঁড়ান; পুকুরের দক্ষিণপাড়ের ভয়ঙ্কর জঙ্গলের দিকে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে চাহিয়া থাকেন। ঐ সময়ে, মশার কামড়ে অস্থির হইয়াই যেন, ঠাকুর সজোরে পা তোলা ফেলা করিতে আরম্ভ করেন। পরে পাখীদের খাওয়ার কয়েক মুঠো চাউল দেওয়া হইলে, আপন আসনে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় নিজ বাড়ীহইতে চা প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসেন। এত কাল ঠাকুরকে নারিকেলের মালায় চা-সেবা করিতে দেখিয়াছি, এবার কুঞ্জ বাবু, ঠাকুরের চা-সেবার জন্য একটি এনামেলের বাটি লইয়া আসিয়াছেন। ঠাকুর তাহাতেই চা-সেবা করিতে-ছেন। চা-সেবার পর কুঞ্জ বাবু চরিতামৃত পাঠ করেন। পরে ঠাকুর নিজেই 'গ্রন্থসাহেব' পাঠ করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ দেখিতে আরম্ভ করেন। অনেক সময়েই গ্রন্থ হাতে থাকে মাত্র, ঠাকুর ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় বেলা এগারটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেন। এগারটার পর আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যান। মস্তকমাত্র বাদ দিয়া, সর্ব্বাঙ্গ জলে ধুইয়া ফেলেন। পরে আসনে আসিয়া, তিলক-সেবার পরে, ঔষধ সেবন করেন। আহার প্রায় বারটার সময়ে হয়। আহারান্তে, আসন আমতলায় লইয়া যাই। ঠাকুর ধুনি সম্মুখে রাখিয়া নির্নিমেষ নয়নে একটানা প্রায় তিন ঘণ্টা কাল পূর্ব্বমুখে কোনও বৃক্ষের দিকে চাহিয়া থাকেন। ঠাকুরের শরীর নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবেই থাকে; অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণে গাত্রের বস্ত্র ভিজিয়া যায়, চক্ষু দু'টি নক্ষত্রের মত জ্বলিতে থাকে। কখনও কখনও শরীরের বর্ণও অন্যপ্রকার হইয়া যায়। আমি ঐ সময়ে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল মহাভারত পাঠ করিয়া, নাম করিতে থাকি, এবং সময়ে সময়ে ঠাকুরের মগ্নাবস্থায়, শ্রীঅঙ্গের বিচিত্র রূপান্তর দেখিয়া, হৃষ্ট ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ি।

বিকালে, সহরের লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে, ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করেন, আমি আহারের চেষ্টায় চলিয়া যাই। সন্ধ্যার সময়ে প্রত্যহই খুব উল্লাসের

সহিত হরিসঙ্কীর্ত্তন হয়। সঙ্কীর্ত্তন পূবেরঘরেই হইয়া থাকে। রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে গুরু-ভ্রাতারা স্ব স্ব আবাসে চলিয়া যান। ঠাকুর জলযোগ করিয়া নিজ আসনে বসিয়া থাকেন।

ঠাকুরের হাসি ও ঝগড়ার শান্তি।

এবার গেণ্ডারিয়াতে ভয়ঙ্কর শীত। ঠাকুরের ঘরের বেড়া, স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগে। চারি পাঁচটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরের ঘরে রাত্রিতে থাকেন; তাঁহাদের ভাল শীতবস্ত্র নাই, ঠাকুর এজন্য রাত্রিতে ধুনি রাখিতে বলিয়াছেন। অর্থাভাববশতঃ আশ্রমে রান্নার কাষ্ঠই সব সময়ে থাকে না, ধুনির কাষ্ঠ আর কোথা হইতে জুটিবে? অধিক রাত্রিতে মহেন্দ্র বাবু, শ্রীধর প্রভৃতি গুরু-ভ্রাতারা ধুনির কাষ্ঠের অনুসন্ধানে আশ্রমসংলগ্ন গুরুভ্রাতাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে থাকেন। সকলে একটু নিস্তব্ধ হইলেই তাঁহারা অবিচারে কাহারও দরজার জন্য রক্ষিত চৌকাঠের কাঠ, কাহারও বা রান্নাঘরে লাগাইবার খুঁটি, কোন বাড়ীর মাচাং প্রস্তুত করিবার ভাল তক্তা আনিয়া ধুনিতে চাপাইতে থাকেন। সকাল বেলা গৃহস্থের লক্ষ্য পড়িলেই উহা লইয়া ঝগড়া আরম্ভ হয়। আমি অতিকষ্টে রান্নার জন্য কিছু কাষ্ঠ ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উঁহাদের ভয়ে রাধারমণ বাবুর গোয়ালঘরে তাহা রাখিয়া দেই। রাত্রিতে অন্ধকার গোয়ালঘরে প্রবেশ করিলে গরুর গুঁতা খাইয়া উঁহারা ভাগিয়া পড়িবেন, আমার ইহাই মতলব ছিল। কিন্তু জানি না, গুরুভ্রাতারা, তাহাও কিরূপে কখন কৌশলক্রমে আনিয়া, আমার এক মাসের জ্বালানী কাঠ এক রাত্রিতেই সাবাড় করিয়া ফেলিয়াছেন। ভোরবেলা উঠিয়া প্রত্যহই কাষ্ঠ আছে কি না, একবার অনুসন্ধান করি। আজ গোয়ালে ঢুকিয়া দেখি, কাঠ নাই; আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। অমনই উত্তেজিত অবস্থায় ঠাকুরের সম্মুখেই উপস্থিত হইয়া কাষ্ঠ সম্বন্ধে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহ কেহ বলিলেন, "ঠাকুরের ধুনিতে তোমার কাঠ লাগিয়াছে, ইহা ত তোমার সৌভাগ্য। এজন্য এত রাগ করছ কেন?" আমি বলিলাম, "ঠাকুরের ভাণ্ডার হ'তে রান্নার জন্য একটি দিন আমি একখানা কাঠ নিলে, দশ দিন আমাকে চোর বলিয়া প্রচার করা হয়, আর এ বেলা বুঝি চুরি হয় না?" ঠাকুর চুপ করিয়া স্থির ভাবে থাকিয়া আমাদের ঝগড়া শুনিতে লাগিলেন, পরে ঝগড়ার মাত্রা যখন খুব বৃদ্ধি হইয়া পড়িল, ক্রমে আরও অধিক গড়াইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা হইল, ঠাকুর তখন একবার আমাদের পানে তাকাইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আশ্চর্য্য দেখিলাম—হাসির সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেরই ভিতরে শান্তি আসিল, সকলেরই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, এবং আনন্দের একটা ঢেউ সকলেরই প্রাণে উঠিয়া পড়িল।

১২ই মাঘ।

শ্রীধরের বৈরাগ্যে বিষম উৎপাত ; ঠাকুরের উপদেশ।

১৩ই মাঘ, মঙ্গলবার।

আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আমার আসন, এই ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শ্রীধর থাকেন। ঘরের অবশিষ্ট স্থানে ঢালা বিছানা করিয়া অন্যান্য গুরুভ্রাতারা রাত্রে শয়ন করেন। শ্রীধরের ও আমার আসনের মধ্যস্থানে দরজা। বসন্তকুমারীর দেহত্যাগের পর, শ্রীধরের মহা বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, এক এক দিন উঁহার এক এক প্রকার বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের ধাক্কায় আমাদের প্রাণ অস্থির। একদিন শ্রীধর নিজ আসন গুটাইয়া সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ, সাড়ে তিন ফুট প্রস্থ ভূমিতে, ত্রস্ত হইয়া, কোদালি মারিতে লাগিলেন। প্রায় ১ ফুট গর্ত্ত করিয়া, ঘরের মেজেতে মাটি স্তূপাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীধরের এই অবস্থায় কারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই। কি জানি, যদি কোদালিই ঘাড়ে বসাইয়া দেন! দিদিমা খবর পাইয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীধরকে আসিয়া বলিলেন—"পাগল! এ কি কর্‌ছ? মেজেতে গর্ত্ত ক'রে ঘরটিকে শেষ কর্‌লে! এ পাগলামী কেন?" শ্রীধর বৃথা বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ না করিয়া খুব মনোযোগের সহিত ধমাধম্ ঘরের মেজেতে কোদাল্ মারিতে লাগিলেন; দিদিমার কথা কোনও গ্রাহ্যেই আনিলেন না। দিদিমাও খুব চীৎকার করিয়া ভৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীধর স্বর বিকৃত করিয়া দিদিমাকে বলিলেন, "যান যান, আপনি গিয়ে ভাণ্ডার দেখুন। ঘর শেষ কর্‌লে! ঘর শেষ কর্‌লে!! আমার যখন দফা শেষ হবে, তখন কি আপনি তার ব্যবস্থা কর্‌তে আস্‌বেন?" শ্রীধর এই বলিয়া, হাতের কোদাল বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং একটি কলসী লইয়া পুকুরের দিকে ছুটিলেন; পরে কলসী কলসী জল আনিয়া ঘরের মেজেতে মাটির উপর ঢালিতে লাগিলেন। জলে কাদায় সমস্তটি ঘর একাকার হইল। আমার আসনের ধারে জল আসিতেছে দেখিয়া, আমি আসনহইতে লাফাইয়া উঠিলাম এবং খুব ধমক্ দিয়া শ্রীধরকে বলিলাম, "শ্রীধর! সাবধান! এক ফোঁটা জল আমার হোমকুণ্ডে পড়্‌লে বা আসনে লাগ্‌লে, আজ তোমাকে খুনই কর্‌ব।" শ্রীধর তখন বেগতিক দেখিয়া অমনই খুব ব্যস্ততার সহিত জলের ধারা অন্য দিকে টানিয়া নিয়া নরম স্বরে বলিলেন, "ভাই! আর একটু থাম্ না! তার পর খুন কর্‌লে আর দুঃখ নাই।" আমি বিরক্ত হইয়া ঘরহইতে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং ঠাকুরের নিকটে গিয়া বসিয়া রহিলাম। অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেহ অত্যাচার কর্‌লে তাহাকে শাসন করা কি অন্যায়?"

ঠাকুর বলিলেন—"মানুষের সহিত ব্যবহার প্রকৃতি বুঝে কর্‌তে হয়। যদি কেহ নিজ প্রকৃতি মত চলাতে, কারও কিছু অনিষ্ট হ'য়ে পড়ে, কিন্তু অন্যের অনিষ্ট করা তার অভিপ্রায় না থাকে, তা হ'লে শান্তভাবে তাকে তা বুঝায়ে দিতে হয়। যতটা সম্ভব তার ভাবে মিশে, তার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা কর্‌তে হয়। আর যদি দেখা যায়, সত্য সত্যই কোন প্রকার দুরভিসন্ধিতে, মতলব ক'রে, কেহ একটা অত্যাচার কর্‌ছে, তা হ'লে তাকে শাসন করতে হয়। অনেক সময়ে সদভিপ্রায়ে মানুষ কাজ করে, অথচ তাতে কারও অনিষ্ট হ'য়ে পড়ে; কিন্তু তাতে তাকে দোষী বলা যায় না। ভুল ভ্রান্তি ত লোকের হ'য়েই থাকে। সময় হ'লে সে নিজেই তা আবার বুঝ্‌তে পারে। সমস্ত কার্য্যেই খুব ধৈর্য্য অবলম্বন কর্‌তে হয়। ধৈর্য্যের অভাবেই ত যত বিরোধ।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিলাম, 'বাঃ, এ মন্দ নয়! এক জনে কেবল অত্যাচার করুক, আর এক জনে কল্পনা করিয়া তার শুভ উদ্দেশ্য ভাবিয়া ঐ অত্যাচারে কেবল ধৈর্য্য ধ'রে থাকুক! এ উপদেশ মন্দ নয়! শ্রীধরের নাম উল্লেখ না করিলেও, ঠাকুর উহাকেই লক্ষ্য করিয়া এ সব উপদেশ আমাকে দিলেন বুঝিলাম; কিন্তু শ্রীধরের মাথা গরমের অবস্থায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য যে সকল উদ্বেগজনক কর্ম্মকে সকলেই পাগলামী ভিন্ন কিছুই বলে না, তাহাতে ঠাকুর উহার কি শুভ উদ্দেশ্য দেখিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীধর সমস্ত দিন জলকাদা ঘাঁটিয়া আসনপরিমিত গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে উচ্চ বেদি প্রস্তুত করিলেন। পরে কতকগুলি তুলসী গাছ আনিয়া, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া উহার উপর পুতিলেন। তৎপরে গর্ত্তের ভিতরে চাটাই বিছাইয়া, তাহার উপর কম্বল আসন পাতিলেন। অনন্তর একটি একতারা লইয়া, ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন—'শেষের সে দিন মন কররে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।' শ্রীধরের ভজন শেষ না হইতেই, সহরের গুরুভ্রাতারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় অর্দ্ধেক ঘর শ্রীধরের পাগলামীতে জোড়া দেখিয়া সকলে বলিলেন, "এ কি শ্রীধর, এসব কি করেছ?"

শ্রীধর খুব তেজের সহিত উত্তর করিলেন, "এ কি, দেখ্‌চো না, চোক্ নাই? তুলসীকানন।" গুরুভ্রাতারা বলিলেন, "পাগল, কানন কি তোমার ঘরের ভিতরে? বাইরে গিয়ে তুলসীকাননে ভজন কর না?" শ্রীধর বলিলেন, "এত শীতে পাছে বাইরে যেতে হয়, সেই জন্যই ত এত করা। আমার দেহ ত্যাগ হ'লে, এই তুলসীকাননেই হবে;

তোদের শীতে কোন কষ্টই হবে না; এই গর্ত্তে আমাকে রেখে এই সব মাটি দিয়েই কবর দিস্।" এই বলিয়া শ্রীধর হাতের একতারা রাখিয়া কম্বলমুড়া দিলেন এবং লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। শ্রীধর নীরব হইলে, গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ হরিধ্বনি দিয়া, 'শ্রীধর মরিয়াছে' বলিতে বলিতে চারিদিকের মাটি ঠেলিয়া উহার গায়ে ফেলিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তখন শ্রীধর ধড়্মড়াইয়া উঠিয়া পড়িলেন। সকলের সঙ্গে শ্রীধরেরও হাসি অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী চলিল। আমি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ঠাকুরের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিলাম এবং শ্রীধরের পাগলামীতেও শুভ উদ্দেশ্য থাকে জানিয়া, অবাক্ হইলাম।

শ্রীধর প্রকৃতিস্থ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, এ পাগলামী কর্ছিলে কেন?"

শ্রীধর বলিলেন—"ভাই, ঠাকুর বলেছিলেন আমার শরীরে সন্ন্যাসরোগের বীজ প্রবেশ করেছে, সুতরাং কোন্ মুহূর্ত্তে আমি কি অবস্থায় মর্ব, কিছুই ত নিশ্চয় নাই! এই জন্য তুলসীকানন করেছিলাম; তুলসীর নিকটে যদি মরি, তা হ'লেও ত একটা সদ্গতি হবে! তার পর এখন যে বিষম শীত! যদি সন্ধ্যার সময়ে মরি, তা হ'লে যাঁরা শ্মশানে নিয়ে যাবেন, তাঁদের কি কম কষ্ট? ইহা ভেবেই মাথায় খেল্‌লে, আমার দেহ নিয়ে পাছে কেহ উদ্বেগ ভোগ করে তাই সে ব্যবস্থা এখনই কর্তে হবে। অমনই অত পরিশ্রম ক'রে ঘরের ভিতরেই কবরের স্থান প্রস্তুত করেছিলাম।" শ্রীধরের মাথা ঠিক হইলে, নিজের পাগলামী নিজেই ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন।

স্বপ্নে ফকিরদর্শন।

১৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, গেণ্ডারিয়া-আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কঠোর সাধক তিনটি মুসলমান ফকির রহিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি দীর্ঘাকৃতি, শীর্ণকলেবর, গৌরবর্ণ অতি তেজস্বী বৃদ্ধ আমাকে বলিলেন—"দেখ, এই আমি বসিলাম; যে পর্য্যন্ত না সিদ্ধ হইব, এই আসনহইতে উঠিব না, অনাহারে এই আসনেই কলেবর ত্যাগ করিব।" ফকির সাহেব এই বলিয়া বামপদের গুল্‌ফোপরি সোজা হইয়া বসিয়া, দক্ষিণ পদ সম্মুখে বিস্তার পূর্ব্বক, দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা পদাঙ্গুষ্ঠ আকর্ষণ পূর্ব্বক, নাসাগ্রে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। অপর দুইটি ফকির অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক; চেহারা কিঞ্চিৎ স্থূল, স্বভাব ধীর, বর্ণ ঈষৎ গৌর; পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে নিবিড় অরণ্যের ভিতরে, মাটির নীচে, আসন করিয়া বসিলেন। কিছুদিন পরে, উঁহাদের খবর লইতে আসিয়া, পূর্ব্বোক্ত ফকির সাহেবকে দেখি, তাঁর আর সে আকৃতি নাই, সর্ব্বাঙ্গ

বাতে ফুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ফাটিয়া রস গড়াইতেছে, উরু ও কোমরের স্থানে স্থানে পচিয়া মাংস খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। ফকির সাহেব, অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়াও, আসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট আছেন। অপর দু'টি ফকিরের কি অবস্থা ঘটিল, জানিবার জন্য যেমন জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, পায়ে হোঁচট্ লাগিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। ফকিরদের তীব্র তপস্যার চিত্র ভাবিতে ভাবিতে অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত হইল।

প্রত্যুষে, ঠাকুর আর আর দিনের মত পায়চারি করিতে করিতে কুঞ্জ বাবুর বাড়ীর দক্ষিণে, ইক্ষুক্ষেতের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ঘাসের উপর যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিত্য যে স্থানে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎকাল দক্ষিণ মুখে জঙ্গলের দিকে চাহিয়া থাকেন, ঠিক সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া দু' চার বার পা তোলা ফেলা করিয়া নিজ আসনঘরে চলিয়া আসিলেন। স্বপ্ন-যোগে যে স্থানে ফকির সাহেবকে দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেই স্থানে ঠাকুর নিত্য যাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেন। তাই বিস্মিত হইয়া অবসরমত জিজ্ঞাসা করিলাম, "সকাল বেলা পুকুরের কোণে যে স্থানে আপনি যাইয়া দাঁড়ান, ঠিক সেইস্থানে একটি ফকিরের আসন রহিয়াছে স্বপ্নে দেখিলাম, স্বপ্নটি কি সত্য?"

ঠাকুর বলিলেন—"**স্বপ্নটি সমস্ত পরিষ্কার করিয়া বল না!**"

আমি স্বপ্নবৃত্তান্ত আগাগোড়া ঠাকুরকে বলিলাম।

ঠাকুর বলিলেন—"**স্বপ্নটি সত্য; ফকির সাহেবের যথার্থ অবস্থাই দেখেছ। ইনিই কৃষ্ণসর্পের দেহ আশ্রয় ক'রে আমার সাধনকুটীরে আসনের নীচে এসে রয়েছেন। আর পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে যাঁদের দেখেছ, তাঁদের মধ্যেও একজন সর্প হ'য়ে আছেন—তাঁর বর্ণ দুধের মত সাদা, চক্ষু রক্তবর্ণ, অত্যন্ত উজ্জ্বল; সময়ে সময়ে আমতলায় এসে থাকেন; লক্ষ্য রাখ্‌লে দেখ্‌তে পাবে।**"

এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিবার পর, আর একটি দিনও, ঠাকুরকে ঐ স্থানে যাইয়া দাঁড়াইয়া পা তোলা ফেলা করিতে দেখি নাই। ইহার ভিতরে যে কি রহস্য আছে জানি না! স্বপ্নটি শুনিয়া ঠাকুর আমাকে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। গেণ্ডারিয়া-আশ্রমটি এক সময়ে মুসলমান ফকিরদের নির্জ্জন ভজনভূমি ছিল। বহু সিদ্ধ ফকিরের কবর এই আশ্রমে এবং আশ্রমসংলগ্ন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের বাড়ীতে রহিয়াছে। বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে, প্রকাণ্ড আমগাছের গোড়ায়, একটি মুসলমান মহাত্মার

কবর আছে। দয়া করিয়া তিনি সময়ে সময়ে মনোহরা দিদিকে (সতীশবাবুর মাতাকে), দর্শন দেন। ফকির সাহেবের তৃপ্তির জন্য বা মর্য্যাদা রক্ষার্থে, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে ঐ বৃক্ষমূলে ধূপ, ধুনা, প্রদীপাদি দেওয়া হয়।

গুরুভ্রাতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা; ঠাকুরের উপদেশ।

১৯শে মাঘ।

আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতাদের ঝগড়া কোন্দল ও বহির্ম্মুখ ভাব দেখিয়া, আমি ভিতরে ভিতরে গর্ব্বিত হইতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—'বাড়ী ঘরে নানাপ্রকার উদ্বেগ অশান্তি ভুগিয়া যাঁহাদের দিনপাত করিতে হয়, তাঁহারাই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য এখানে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। যথার্থ সাধন ভজন বা ঠাকুরের সঙ্গলাভ করা ইঁহাদের এখানে থাকিবার উদ্দেশ্য নয়; তাই সামান্য সামান্য স্বার্থ লইয়া ইঁহারা ঝগড়া বিবাদে সময় কাটাইতেছেন। ঠাকুরের আকর্ষণে এবং ধর্ম্মলাভাকাঙ্ক্ষায় মাত্র আমিই এখানে রহিয়াছি। অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের অপেক্ষা ঠাকুরের আদেশ আমিই অধিক প্রতিপালন করিয়া চলিতেছি এবং ঠাকুরের সঙ্গও আমিই অধিক সময় করিতেছি।' এই সব কারণে, আর দশটি অপেক্ষা আমি বেশী আদরের হইয়াছি কি না বুঝিবার অভিপ্রায়ে, কৌশলক্রমে একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া, কেহ বা নিয়ম নিষ্ঠা পূর্ব্বক চলিতেছে; আবার কেহ বা উল্টা বাগে চলিতেছে। কাহারও সামান্য দোষে গুরুতর শাসন, আবার কারও বা গুরুতর অপরাধেও উপেক্ষা প্রদর্শন, এরূপ কেন?"

ঠাকুর বলিলেন "মানুষের প্রকৃতি দেখে, অবস্থা বুঝে, তাকে চল্‌তে দিতে হয় ও চালাতে হয়। সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা নয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, তিনটি লোক একই ঘরে জ্বরে পড়্‌লে, আরোগ্যের জন্য একমাত্র কুইনিন্ সকলের পক্ষে ব্যবস্থা কর্‌লে সব সময়ে চলে না। কারও কুইনিনে উপকার হ'তে পারে, আবার কারও বা মৃত্যুও হ'তে পারে। রোগ এক হ'লেও, রোগের হেতু এবং রোগীর শরীরের অবস্থাদি বুঝে, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা কর্‌তে হয়। একই অবস্থা লাভ বা একই দোষ ত্যাগ কর্‌তে হ'লে, এক এক জনের এক এক ভাবে চলা আবশ্যক হ'তে পারে। যার যেটি, সে সেইটি নিয়ে থাক্‌বে,

অন্যের কিসে কি হ'চ্ছে তা দেখ্‌বার প্রয়োজন কি? আর দেখেই বা কি বুঝ্‌বে? আমার মত না চল্‌লে কারও কিছু হবে না মনে করা, অত্যন্ত ভুল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিলেই কি সকলের একই অবস্থা লাভ হবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা হ'তেই হবে; কোন একটি ষ্টেশনের টিকেট ক'রে দশটি লোক গাড়ীতে চেপে বস্‌লে, জেগে থাক্‌ বা ঘুমিয়ে থাক্‌, ঝগড়াবিবাদ ক'রে, কি তাসপাশা খেলেই চলুক, সকলকে একই স্থানে যেয়ে পৌঁছাতে হবে।"

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তা হ'লে আর আদেশ বা নিয়মাদি প্রতিপালন করায় লাভ কি?"

ঠাকুর—"লাভ খুব আছে। যাবে সকলে একই স্থানে, তবে কেউ পাল্কিতে ব'সে, আবার কেউ বা পাল্কি ঘাড়ে নিয়ে, পথের পার্থক্য এই মাত্র।"

ঠাকুরের প্রথম দু'টি প্রশ্নোত্তরে মনে মনে একটু দুঃখিত হইয়াছিলাম, এবার মনে বেশ স্ফূর্ত্তি আসিল; পাছে শ্রীমুখ হইতে আবার অন্য প্রকার কিছু বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া, ধীরে ধীরে আসন গুটাইয়া সরিয়া পড়িলাম।

অভিমানে দুর্দ্দশা; ঠাকুরের অনুশাসন।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি, আমার রাশিতে বিষম কুগ্রহ চাপিল। সেই সময়হইতে গুরুভ্রাতাদের উপর তাচ্ছল্য ভাব এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপে দিন দিন দোষদৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থা ভাবিয়া অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠিলাম। নীলকণ্ঠবেশ, মালা, তিলক, একাহার, পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি, নিত্য হোম, পাঠ ও ঠাকুরের সঙ্গে অধিকক্ষণ বাস ইত্যাদি বাহিরের অনুষ্ঠানে আমার অতিরিক্ত নজর পড়িয়া গেল। সারা দিন আমি নাম করিয়া যে অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিতাম, এ সময়ে ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইল। আহারান্তে রাত্রি ১১।১২ টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাই, এই সময়ের মধ্যেও প্রায় দুই একদিন অন্তরই স্বপ্নদোষ হইতে লাগিল। নামে অরুচি ও মনে বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও নানাপ্রকার উপাধি উপস্থিত হইল। হস্ত, বাহু, মস্তকাদি যে সকল স্থানে রুদ্রাক্ষ আঁটিয়া ধারণ করি, সে সকল স্থানে জ্বালা অনুভূত হইতে লাগিল; ক্রমশঃ এই জ্বালা বৃদ্ধি পাওয়াতে লোম্‌ছা-ফোড়ার মত যন্ত্রণা সর্ব্বদা ভোগ করিতে লাগিলাম; এবং

২০শে—২৭শে মাঘ।

সেই সকল স্থানে ফোস্কার মত ছাল উঠিতে লাগিল। মাথাটি আগুণ হইয়া গেল। ভিতরের অশান্তি ও শরীরের ক্লেশ অসহ্য হওয়াতে ঠাকুরের নিকট যাইয়া বলিলাম, "কয়েকদিনযাবৎ, আমার সপ্তাহে তিন চার দিন করিয়া স্বপ্নদোষ হইতেছে, মনে সর্ব্বদা বিরক্তি, শরীরেও বিষম জ্বালা দিনরাত ভুগিতেছি, এরূপ দুর্দ্দশা আমার হইল কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"দুর্দ্দশা আর হয়েছে কি? এখন থেকে খুব সাবধান হ'য়ে না চল্‌লে, আরও কত দুর্দ্দশায় পড়্‌বে! ধর্ম্মটি তামাসার জিনিস নয়। সকলের পায়ের তলা দিয়ে ধর্ম্মের পথ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের পায়ের নীচ দিয়ে ধর্ম্মের সিঁড়িতে উঠ্‌তে হয়। মাথা উঁচু ক'রে কখনও ধর্ম্মলাভ হয় না। অভিমান বড়ই বিষম জিনিস। জটা, মালা, তিলকাদি ধর্ম্মের বেশভূষা ধারণ ক'রে, বিন্দুমাত্রও যদি প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে, তন্মুহূর্ত্তেই তাহা ত্যাগ কর্‌তে হয়। না হ'লে উহাই সর্প হ'য়ে দংশন করে। সর্ব্বদা এ সব বিচার ক'রে চল্‌তে হয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে যে বস্তু ধারণ করা হয় না, এবং যাতে শুধু একটা প্রতিষ্ঠার লোভই বৃদ্ধি পায়, তা যাই হোক্ না কেন, কাকবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ কর্‌বে। আর যেটি তাঁর উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হ'লেও তাতে ভ্রূক্ষেপ কর্‌বে না। এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত চল্‌তে হয়। ধর্ম্মাভিমান বড়ই ভয়ানক। এত অনিষ্ট আর কিছুতেই হয় না। মদ-খোর, বেশ্যাসক্ত, নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি নিজের দুরবস্থা বুঝে, নিজেকে নিতান্ত অপদার্থ জঘন্য মনে করে, সে একজন সদনুষ্ঠানী, চরিত্রবান্, ধর্ম্মাভি-মানী ব্যক্তি অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য অপরাধের পার কিনারা আছে, কিন্তু ধর্ম্মাভিমানীর পার সহজে নাই। সাধন, ভজন, তপস্যা, কথাবার্ত্তা, বেশ-ভূষা, যে কোনও বিষয়ে ধর্ম্মের অভিমান হয়, প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে, বিষম রোগ মনে ক'রে, তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ কর্‌বে। শরীর মন ঠাণ্ডা না হ'লে রুদ্রাক্ষ ধারণ সহ্য হবে না, গরম হ'য়ে যাবে। এখন যেয়ে রুদ্রাক্ষ মালা তুলে রাখ, শুধু তুলসীর মালা ধারণ কর।

আহারসম্বন্ধেও কোনপ্রকার অনিয়ম অত্যাচার কর্‌লে স্বপ্নদোষ হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না। অশুদ্ধ আহার একবার পেটে গিয়ে রক্তে পরিণত হ'লে,

ক্রমে ক্রমে শরীরের সমস্ত রক্তই দূষিত করে। ঐ রক্ত যত কাল দেহে থাকে, নানাপ্রকার বিকার জন্মায়। উহা একেবারে নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, নানা-প্রকার উৎপাত ভোগ করতে হয়। এক এক প্রকার রসে এক এক প্রকার বিকারের উৎপত্তি করে। রস ত্যাগ না করলে, শরীরটি সহজে নির্ম্মল হয় না। শরীর বিকারশূন্য না হ'লে, ভজন সাধনও হয় না। বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার দ্বারাই শরীর শুদ্ধ হয়। আগে শরীরটিকে ঠিক ক'রে নেও। শরীর নিয়াই সব। শরীর ঠিক না হ'লে, কি দিয়ে কি করবে ?"

ঠাকুরের অনুশাসনবাক্য শুনিয়া, আমি নিজ আসনে চলিয়া আসিলাম, এবং সমস্ত রুদ্রাক্ষের মালা খুলিয়া রাখিলাম। আহারের পবিত্রতা ও মাত্রা ঠিক রাখিবার জন্য, ঠাকুরের প্রসাদ মিলাইয়া, শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত খাইতে লাগিলাম।

প্রসাদের গুণ ও তাহাতে অবিশ্বাস।

২৮শে মাঘ, বুধবার।

গেণ্ডারিয়ানিবাসী, আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সি মহাশয়, প্রতিদিনই সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন ; ঠাকুরের নিকট কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া, বাড়ী যাওয়ার সময়ে আমার নিকট হইতে প্রসাদ লইয়া যান। ব্রাহ্মসমাজের লোক হইলেও, প্রসাদে বক্সি দাদার অচলা ভক্তি। দুইটি বা তিনটি অন্নপ্রসাদমাত্র তাঁহাকে গণিয়া দিয়া থাকি ; অধিক দিতে চাহিলেও তিনি নেন না। প্রসাদ হাতে পড়া মাত্রেই, তিনি থর্ থর্ কাঁপিতে থাকেন। আফিং-খোরের মত তাঁর চোখ দু'টি বুজিয়া আসে। তিনি ক্ষণমাত্রও না দাঁড়াইয়া, দ্রুতপদে বাড়ী চলিয়া যান। অবসরমত নিজ আসনে বসিয়া, ঐ প্রসাদ মুখে রাখিয়া একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন, তিন চার ঘণ্টাকাল সমাধিস্থ থাকেন। আমাদের জেদে পড়িয়া, কখনও তিনি দু' এক গ্রাস প্রসাদ পাইলে, দু' তিন দিনের জন্য তাঁহার পাইখানা বন্ধ হইয়া যায়। ঐ সময়ে তিনি নেশাখোরের মত ঢুলু ঢুলু অবস্থায় দিন রাত কাটান। কথায় কথায় আজ তিনি বলিলেন 'প্রসাদ পাইলে এমনই একটা নেশা হয় যে, অন্য কোন দিকে মন টানিয়া আনিবার ক্ষমতা থাকে না ; প্রসাদের গুণে মনটিকে নামেতেই নিবিষ্ট করিয়া রাখে, শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়ে।' বক্সি দাদার অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইতেছি। ভাবিলাম, এই প্রসাদ ত গ্রাসে গ্রাসে প্রত্যহই খাইতেছি। আমার এরূপ হয় না কেন ?

কিছু কাল হয়, রুদ্রাক্ষমালা ছাড়িয়া দিয়াছি; তাহাতে মনের উৎসাহ উদ্যম যেন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে; শরীরও পূর্ব্বের মত নাই, নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কিছুতেই ত এলোমেলো স্বপ্ন দেখা বন্ধ হইতেছে না! সকল প্রকার নিয়ম নিষ্ঠা করিয়াও যখন কোন ফল পাইলাম না, তখন বঙ্কি দাদার কথা মনে হইল। ভাবিলাম, শয়নের সময়ে মুখে প্রসাদ রাখিয়া নিদ্রা যাইব। জাগ্রত অবস্থায় শরীর স্বভাবতঃই অস্থির এবং মন চঞ্চল থাকে বলিয়া, প্রসাদের অসাধারণ গুণ অনুভব হয় না; কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় দেহ মন স্থির থাকে, সুতরাং আহারের বা সঙ্গের কোনও প্রকার দোষে, নিদ্রিতাবস্থায় যদি অকস্মাৎ বিকারের সম্ভাবনা হয়, মহাপ্রসাদ মুখে রাখিলে, তাহার গুণে অবশ্যই উহার শান্তি হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া, অদ্য একগ্রাস প্রসাদ মুখে রাখিয়া, নিদ্রিত হইলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—'ঠাকুর আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই ঠাকুরকে দেখিয়া আনন্দ উৎসাহ করিতে লাগিল। বহুবিধ উৎকৃষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, ঠাকুরের ভোগ রান্না হইল। ঠাকুর পরম পরিতোষে সেবা করিলেন। অন্যান্য দিনের মত, ভোজনের পাত্র হাতে লইয়া, আমি সকলকে প্রসাদ বাঁটিতে লাগিলাম। আমার একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া, ১৫।১৬ বৎসরের যুবতী, প্রসাদ পাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে, আমার হাতে প্রসাদ পাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া, নিজেই ঐ পাত্রহইতে প্রসাদ তুলিয়া লইয়া, খাইতে লাগিল। আমি, তাহার হাতখানা বাঁ হাতে আঁটিয়া ধরিয়া, অপর হাতে প্রসাদ তুলিয়া তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিলাম। মেয়েটি তখন হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিল।' তন্মুহূর্ত্তেই আমি জাগিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, স্বপ্নদোষ হইয়া গিয়াছে। মুখের সেই প্রসাদই খুব ব্যস্ততার সহিত চিবাইয়া খাইতেছি। অবশিষ্ট রাত্রি কান্দিয়া কাটাইলাম। ভাবিলাম—'হায়, এ কি হইল? বহুকাল যাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি, মহাপ্রসাদের গুণে আজ নিদ্রিতাবস্থায় তাহার স্মৃতি জাগাইয়া আমার এই সর্ব্বনাশ করিল! নির্জ্জিত দোষকে পুনর্জ্জীবিত করাই কি মহাপ্রসাদের গুণ? প্রসাদের গুণ, বোধ হয়, অন্ধভক্তদের কল্পনারই একটা পরিণাম মাত্র।'

মধ্যাহ্নে, মহাভারতপাঠান্তে অবসর পাইয়া, ঠাকুরকে বলিলাম—"স্বপ্নদোষ না হয় সেজন্য শয়নের সময়ে মুখে প্রসাদ রাখিয়াছিলাম। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে একটি মেয়ের সহিত প্রসাদ লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া খাওয়াতে, স্বপ্নদোষ হইল। মুখের প্রসাদ চিবাইতে চিবাইতে জাগিয়া পড়িলাম। ঐ মেয়েটিকে ত আমি একমত ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তবে এমন হ'ল কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা বল্‌লে কি হয়? প্রকৃতিতে যা কিছু দোষ লুকায়ে আছে, তা সমস্তই ত ফুটে বে'র হবে। উহার প্রতি আসক্তি, তোমার বহুকালই ত ছিল। কল্পনাতেও যখন কোন প্রকার কামভাব উহার প্রতি আন্‌তে না পারবে, তখনই বুঝবে, এই প্রবৃত্তি তোমার নষ্ট হ'য়ে গেছে। অষ্টপ্রকার মৈথুনই ত্যাগ কর্‌তে হবে। স্ত্রীলোকের স্পর্শেতে ক'রে যেমন উত্তেজনা হ'য়ে থাকে, উহাদের স্মরণে, দর্শনে এবং উহাদের সহিত আলাপাদি ক'রেও সেই রূপই হয়। সুতরাং বীর্য্যরক্ষা করতে হ'লে, ইহার একটিও অবহেলা করলে চল্‌বে না। একটা বিষয়ে চেষ্টা কর্‌তে হ'লে, ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা ক'রে লেগে যেতে হয়। না হ'লে কিছুই হবার যো নাই। মাটির দিকে মাথা হেট্ ক'রে রেখে, আড়ে আড়ে এদিক্ সেদিক্ তাকালে ব্রতরক্ষা হয় না; বরং চোরের মত কপট ব্যবহারই করা হয়। কোন প্রকার অসৎ কল্পনা মনে এলে, চীৎকার ক'রে গান ক'রো অথবা পাঠ ক'রো।"

আমি যে পাত্রে রান্না করি, সেই পাত্রেই আহার করিয়া থাকি; অনেক সময় কলাপাতা সংগ্রহ করিতে পারি না, এজন্য বড়ই অসুবিধা বোধ হয়। আজ একটি গুরুভ্রাতা, আমাকে একখানা এনামেলের ডিস্ আনিয়া দিয়া বলিলেন, 'ইহাতে তুমি আহার করিও, মাজিতে কোনও কষ্ট হইবে না।' আমি ঐখানা ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়া, ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিলাম, 'এই পাত্রে আমি আহার করিতে পারি?'

ঠাকুর দেখিয়া বলিলেন—"রাম! রাম!! ওতে কি খেতে আছে? ওসব স্পর্শও করতে নাই। আমি কয়দিন ওতে চা খেয়েছিলাম, এখন আবার আমার নারকেলের মালাতেই চা খাচ্চি। ঐ পাত্র শুদ্ধ নয়।"

আমি, ডিস্‌খানা লইয়া, যিনি দিয়াছিলেন, তাঁহাকেই দিয়া দিলাম।

ফাল্গুন।

গেণ্ডারিয়ার সিদ্ধ ফকিরদের আশ্চর্য্য কথা।

৩রা ফাল্গুন, রবিবার।

মাঘ মাসটি শেষ হইয়া গেল, কিন্তু গেণ্ডারিয়ায় শীত কিছুই কমিতেছে না। রাত্রিতে দু' এক ঘণ্টা আসনে বসিলেই শীতে যেন শরীর অবসন্ন করিয়া ফেলে; ধুনি না জ্বালিয়া স্থির থাকিতে পারি না। প্রত্যহই আমি ধুনির কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাখি। ফাল্গুন মাস পড়িতেই একদিন আমার ধুনির কাঠ সংগ্রহ ছিল না; নিদ্রাভঙ্গ হইতেই বাহিরে যাইয়া ধুনির কাঠ আনিবার সঙ্কল্প করিয়া, যেমনই আসনহইতে উঠিলাম, তন্মুহূর্ত্তেই ঠাকুর আমাকে পূবেরঘরে নিজ আসনে থাকিয়া, ডাকিয়া বলিলেন— **"ওহে, এখন বাইরে যেও না, একটু অপেক্ষা কর; বাঘে চ'ড়ে ফকির সাহেব আস্‌ছেন, এখনই চ'লে যাবেন।"**

আমি ঠাকুরের কথা শুনিয়া, অমনই আসনে বসিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, 'মানুষ কি কখনও বাঘে চ'ড়ে চল্‌তে পারে? পাছে ফকির সাহেব আমাকে দেখিয়া আশ্রমে না আসিয়াই চলিয়া যান, সেইজন্যই বুঝি ঠাকুর, আমাকে বাঘের কথা বলিয়া, এ সময়ে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলেন।' সকাল বেলা উঠিয়া দেখিলাম, আমতলায় ও আশ্রমের দক্ষিণ দিকের উঠানে, স্থানে স্থানে পরিষ্কার বাঘের পায়ের চিহ্ন রহিয়াছে। অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ফকিরের সঙ্গে বাঘ কেন?'

ঠাকুর বলিলেন—**"অনেক ফকির তান্ত্রিক সাধনের কোনও প্রণালী ধ'রে সাধন ভজন করেন। ইঁহারা শক্তির উপাসক। সাপ বাঘ সঙ্গে রাখা ইঁহাদের প্রয়োজন হয়।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"রাত্রিতে ফকির সাহেব আসেন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন——**"দেখা কর্‌তে।"**

আমি বলিলাম—"আপনি ত আসন ছেড়ে উঠেন না। দেখা হয় কি প্রকারে?"

ঠাকুর বলিলেন—**"তা হয়।"**

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"এসব ফকিরদের কি আমরা রাত্রিতে বাইরে থাক্‌লে দেখতে পারি?"

ঠাকুর বলিলেন—"তাঁরা দয়া ক'রে দর্শন দিলেই পার।"

আজ মহাভারতপাঠের পর, বেলা আড়াইটার সময়ে, একটি দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ মুসলমান ফকির, আমতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফকির সাহেব আসা মাত্রেই, ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। ফকির সাহেবকে দেখিয়া মনে হইল, বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে; কিন্তু তাঁহার কথায় বার্ত্তায় যাহা বুঝিলাম, তাহাতে অনুমান হয় অনেক বেশী। ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল, তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, গেণ্ডারিয়ার নিবিড় জঙ্গলে থাকিয়া, সাধন ভজন করিতেছেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে ঠারে ঠোরে সাঙ্কেতিক ভাষায় যে সব আলাপ করিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কথায় কথায় ফকির সাহেব বলিলেন—'বহু কাল আমি জাহাজে চাকরি করিয়াছিলাম। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করাই, আমাদের কাজ ছিল। একবার ভরতমহাসাগরের দক্ষিণ সমুদ্রে আমরা যাইতে যাইতে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারা একটি দেশ দেখিতে পাইলাম, দেশটি খুব বড় বলিয়াই মনে হইল। ক্রমশঃ আমরা সেই দিকে জাহাজ চালাইতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন দূরহইতে একখানা জাহাজ, আমাদের দেখিয়া বাঁশী বাজাইয়া, আর আগে যাইতে নিষেধ করিল। পরে ঐ জাহাজখানার সহিত মিলিয়া, আমরা আরও কিছু দূর, দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বহুস্থানব্যাপী বিস্তৃত ঘূর্ণীজলরাশি ভয়ঙ্কর স্রোতে সাঁ সাঁ শব্দে চলিয়া একটা কেন্দ্রস্থানে যাইয়া পড়িতেছে। ঐ স্রোতে একবার জাহাজ পড়িলে, কোনও উপায়েই উহা আর রক্ষা করা যাইবে না। ঐ জাহাজের লোকের মুখে শুনিলাম, ঐ স্রোতে পড়িয়া কয়েকখানা জাহাজ ডুবিয়াও গিয়াছে। বোধ হয় সমুদ্রের ভিতরে এমন কোনও বস্তু আছে, যাহাতে জাহাজ আকর্ষণ করিয়া ডুবাইয়া ফেলে, অথবা জলেরই এমন গুণ যে, তাহাতে কিছু ভাসিতে পারে না। ঐ পাকজলের বাহিরে থাকিয়া, কয়েক দিন আমরা ঘুরাঘুরি করিলাম। তিথি-বিশেষে ঐ আবর্ত্তজলের কেন্দ্রস্থানে সোণার মত রং, অতি উজ্জ্বল, খুব বড় একটা জালার মত, কি যেন দেখা যায়, আবার ডুবিয়া যায়। উহা যে কি, দূরবীক্ষণযন্ত্রদ্বারাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ঘূর্ণীজলের সীমা অতিক্রম করিয়া ঐ দেশে পঁহুছিবার কোন সুবিধাই আমরা পাইলাম না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাদের রামায়ণে যে লঙ্কার কথা আছে, এই দেশই কি সেই লঙ্কা?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা হ'তে পারে। এখন যাকে লঙ্কা বলে, সেই সিলোন,

লঙ্কা নয়। সমুদ্রপথে জাহাজাদিতে ক'রে লঙ্কায় যাওয়া অসম্ভব। শূন্যপথেও নাকি সহজে যাওয়া যায় না। জলে টেনে নেয়, এরূপ শুনা আছে। লঙ্কার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণী জলের বিবরণও পাওয়া যায়। লঙ্কা বহু দূরে।"

ফকির সাহেব বলিলেন—'এক বার আমরা উত্তরমহাসাগরে গিয়াছিলাম; সেখানেও আমরা উত্তর দিকে যাইতে যাইতে বহু বিস্তৃত এক দেশ দেখিতে পাইলাম। বরফ কাটিয়া আমাদের জাহাজ বেশী দূর যাইতে পারিল না। আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে কিছু খাবার লইয়া, একখানা দ্রুতগামী কলের গাড়িতে, ঐ দেশের দিকে বরফের উপর দিয়া চলিলাম। ক্রমে আমরা সেই দেশের দক্ষিণ প্রান্তে পঁহুছিলাম। দেখিলাম, সেখানেও মানুষ আছে; তাহাদের আকৃতি সমস্তই আমাদের মত, কিন্তু মুখটি ঠিক ঘোড়ার মত। তাহারা অতি সুন্দর গান করে। স্বর বড়ই মধুর। অন্তরে তাদের বড়ই দয়া—ব্যবহারে বুঝিলাম।'

ঠাকুর বলিলেন—"ঐ দেশকে কিম্পুরুষবর্ষ বলে। হয়মুখ নর,—অশ্বমুখ নর ঐ দেশে বাস করেন, পুরাণাদিতে এরূপ বর্ণনা আছে। তাঁহারা অসভ্য নন, খুব ভদ্র।"

রমণার বুড়োশিবের কৃপা। ঠাকুরের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির কথা।

৬ই ফাল্গুন, বুধবার।

ঢাকা সহরের উত্তর দিকে, পুরাণ রমণার অধিকাংশ স্থানই, ভয়ঙ্কর বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ঐ জঙ্গলে একাকী দিনের বেলায়ও, কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে সাহস পায় না। বহু কালের পুরাণ বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, উহার ভিতরে স্থানে স্থানে দেখা যায়। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া, একটি মন্দিরে পঁহুছিলাম। মন্দিরে দুই তিন জন নানকসাহী সন্ন্যাসী আছেন। শুনিলাম, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, গুরু নানক যখন ঢাকা আসিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁর এই পদচিহ্ন রহিয়াছে। সাধুরা ঐ নির্জ্জন অরণ্যে থাকিয়া, এই পদচিহ্নের সেবা পূজা করিতেছেন। আমাদিগকে তাঁহারা খুব আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন এবং 'কড়া প্রসাদ' দিলেন।

ঠাকুর ওখানহইতে বাহির হইয়া, রাস্তার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, বনের ভিতরে, বুড়োশিবের মন্দিরে আমাদিগকে লইয়া উপস্থিত হইলেন; বুড়োশিবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, মন্দিরের সম্মুখে বহু কালের প্রাচীন বটগাছের তলায় বসিয়াই, সমাধিস্থ হইয়া

পড়িলেন। গুরুভ্রাতারাও, সকলেই স্থির হইয়া বসিয়া, ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ দু' তিন সেকেণ্ডের ভিতরে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ভগবান্ মহেশ্বরের অপরিসীম কৃপার বিস্ময়জনক নিদর্শন, পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করিয়া, অনেকে একেবারে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ 'এ কি হইল' বলিয়া, ঊর্দ্ধদিকে চঞ্চলদৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন। আমরা, ঘটনাটি স্মরণ করিয়া, ভাবিতে ভাবিতে, বেলা অবসানে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—'যে স্থানে কোনও কালে যাই নাই, যাহা কখনও দেখি নাই, সেরূপ কোন কোন স্থানে যেয়েও মনে হয়, যেন পূর্ব্বে কখনও সেই স্থান দেখেছি। এরূপ হয় কেন?'

উত্তর—"**পূর্ব্বজন্মে যে সকল স্থানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকে, সেখানে উপস্থিত হ'লে, কারও কারও, উহা পরিচিত ব'লে মনে হয়।**"

এই বলিয়া ঠাকুর তাঁহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতির বিষয় বলিতে লাগিলেন—

ঠাকুর বলিলেন—"**গয়াতে যখন আমি ছিলাম, এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে, ফল্গুর অপর পারে রামগয়ায় উপস্থিত হ'লাম। সেখানে একটি মন্দিরে নৃসিংহদেব দর্শন ক'রে, তখনই আমার মনে পড়্‌ল, যেন পূর্ব্বে কখনও আমি এই মূর্ত্তি দেখেছি। তার পরেই আমার ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথা স্মরণ হ'তে লাগ্‌ল! ঐ স্থানে, ফল্গুর পারে, পুরাণ বান্ধান ঘাটের উপরে, একটি অশ্বত্থ গাছ আছে, সেই গাছের পশ্চিম দিকের একখানা ডালাতে ছুরি দিয়ে "ওঁ রামঃ" এই নামটি বড় ক'রে কেটে লিখে রেখেছিলাম। তাও আমার মনে হ'ল। অমনই আমি উঠে সেই গাছটির কাছে উপস্থিত হ'লাম, দেখ্‌লাম আমার সেই লেখা ঐ ডালাতে রয়েছে। তবে ডালার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরগুলি অনেকটা তফাৎ তফাৎ হ'য়ে পড়েছে। তার পরে রামগয়ার যে স্থানে থেকে, সাধন ভজন করেছিলাম এবং সে সময়ে আমার সঙ্গে যে দু'টি পরমহংস ছিলেন, সে সমস্তই আমার মনে হ'ল। ক্রমে অনেক কথাই মনে পড়্‌ল। আমি পাহাড়ের সর্ব্বত্র ঘুরে ঘুরে, সেই সমস্ত স্থান ও চিহ্ন দেখে অবাক্ হ'লাম। পূর্ব্বজন্মের সমস্ত স্মৃতিই আমার সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে জেগে উঠ্‌ল।**

বহুতীর্থ দর্শন ও বহুস্থান পর্য্যটন করতে করতে, কেহ পূর্ব্ব জন্মের সাধন

ভজনের বা বিশেষ সম্বন্ধের একটা স্থানে উপস্থিত হ'লে, অকস্মাৎ তাঁর পূর্ব্বভাব বা স্মৃতি, মুহূর্ত্তমধ্যে উদয় হ'তে পারে। বহু সাধন ভজনেও, এটি সহজে হয় না। কোন্ স্থানের সহিত, কোন্ তীর্থের সহিত, কোন্ বিগ্রহের সহিত, কার জীবনের কি সম্বন্ধ আছে, বলা যায় না। সমস্ত যোগাযোগ হ'লে, কারও কারও ভাগ্যে তাহা প্রকাশ হয়। সকলেরই যে হবে, এমনও নয়।"

প্রশ্ন—"নোংরা অপরিষ্কার একটা স্থানেতে উপস্থিত হ'লেও, অনেক সময়ে দেখা যায়, মন সেখানে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠে, চিত্ত যেন আপনা আপনি জমাট হ'য়ে পড়ে। আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বাগানবাড়ীতে গিয়াও, যেন মন বিরক্তিপূর্ণ হ'য়ে যায়, চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। এর কারণ কি?"

উত্তর—"বিশেষ বিশেষ ভাবে, যে যে স্থানে, যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে, সে সকলের একটা ভাব ঐ সকল স্থানে জমাট হ'য়ে থাকে; ওখানে উপস্থিত হ'লেই, সেই সকল ভাবে চিত্তকে স্পর্শ করে। চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, ততই এসকল অনুভবে আসে, নচেৎ হয় না। ভজন সাধন, তপস্যা, দেব দেবীর অধিষ্ঠান, মহাপুরুষদের বাস বা পরলোকগত পুণ্যাত্মাদের অবস্থান, যে সকল স্থানে হয়, সহস্র বৎসর পরেও সেখানে উপস্থিত হ'লে, সেই সকল ভাবে চিত্তকে অভিভূত করে। সে প্রকার, আবার যে সব স্থানে বিষম অত্যাচার, অনাচার, দুষ্কার্য্যাদির অনুষ্ঠান হয়, বহুকাল পরে সেখানে গেলেও, সে সকল ভাব চিত্তকে স্পর্শ করে। চিত্ত নির্ম্মল হ'লেই, স্থানের প্রভাব বুঝ্‌তে পারা যায়।"

আদেশপালনে অসমর্থতা; ঠাকুরের সহানুভূতি ও উপদেশ।

৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

স্বভাবে যে সকল দোষ বহুকালযাবৎ রহিয়াছে এবং যাহা নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়া, এত কাল একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম—'এসব দোষ ছাড়াইতে আর চেষ্টা করিতে হইবে কেন? ইচ্ছামাত্রই ত ত্যাগ করা যায়,' এখন তাহা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া, দেখিতেছি, একটিও ছাড়াইতে পারিতেছি না। মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখি, এ সকল দোষের শিকড় স্বভাবের এত নিভৃত স্তরে যাইয়া ঢুকিয়াছে যে, তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। স্বভাবের সেই বিন্দুমাত্র দোষকেই, এখন যেন অপার সিন্ধু মনে হইতেছে। নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া হতাশ হইয়া,

ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—' সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া স্বভাবের একটি দোষও ত ছাড়াইতে পারিলাম না। এখন কি করিব ?'

ঠাকুর খুব স্নেহভাবে সহানুভূতি করিয়া বলিলেন—"স্বভাবের দোষ কি কেহ ইচ্ছা-মাত্রেই ত্যাগ কর্‌তে পারে ? নিষেধ বর্জ্জন আর বিধির অনুষ্ঠান—ইহার মধ্যে নিষেধ বর্জ্জন অপেক্ষা বিধির অনুষ্ঠানই সহজ। বিধির অনুষ্ঠান কর্‌তে কর্‌তে নিষিদ্ধ বিষয়গুলি আপনা আপনি ধীরে ধীরে ত্যাগ হ'য়ে আসে। নিয়মগুলি প্রতিপালন ক'রে চল্‌তে চেষ্টা কর, দোষ সমস্ত আপনিই যাবে।"

আমি বলিলাম—' যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে বলিয়াছেন, তাহা ত ঠিকমত পারিতেছি না।'

ঠাকুর বলিলেন—"চেষ্টা ক'রে যাও। পার না পার, সে দিকে লক্ষ্য রেখো না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা কি সহজেই লোকে কর্‌তে পারে ? এজন্য বার বৎসর সময় দিয়েছেন। বার বৎসরের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আসে। দু' চার বারের চেষ্টায় ফল না পেলে, হাত পা ছেড়ে দিতে নাই ; যতদিনে ঠিক না হয়, ততদিনই চেষ্টা রাখ্‌তে হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—' যে সকল নিয়ম প্রতিপালন ও নিষেধ বর্জ্জন করিতে বলিয়া দিয়াছেন, তা না পার্‌লে কি আপনি অপরাধ গ্রহণ করেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—"কিছু না। আমি ত কতই বল্‌ব, সবই কি আর একেবারে ঠিক মত কর্‌তে পারবে ? তা হ'লে ত সিদ্ধই হ'লে। যতটা পার ক'রে যাও। চেষ্টা ক'রেও যদি না পার, কোন অপরাধই হবে না। ইচ্ছা ক'রে একটা অনিয়ম না কর্‌লেই হ'ল। হঠাৎ যা হ'য়ে পড়ে, তা নিজে কর্‌লে মনে কর কেন ? নিজে কর্‌লাম ভাবলেই ত অপরাধ। সমস্তই ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে হয়। তিনিই সব করছেন, তিনিই সমস্ত করায়ে নিচ্ছেন—এটি বুঝ্‌লেই শান্তি।"

আমি বলিলাম—' একটা দূষণীয় কার্য্য না করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও, যখন পরাস্ত হইয়া করিয়া ফেলি, তখনও ত অনুতাপ হয় ; মনে হয়, 'বুঝি আরও চেষ্টা কর্‌লে উহা না করিয়া পারিতাম।'

ঠাকুর বলিলেন—"যথার্থ পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, আমরা কিছুই ত বুঝি না !

ছোট বেলা হ'তে দেখে শুনে একটা ভাল মন্দের সংস্কার মাত্র দাঁড়ায়ে গেছে। বাস্তবিক তত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন। লোকের লজ্জায়, লোকের ভয়ে, আমরা কতকগুলি কার্য্য করি না; মনে করি—পাপ। যথার্থই উহা পাপ কি না, ঠিক বলা যায় না। পাপ পুণ্য সকলেরই একটা একটা স্বরূপ আছে, সেটি দর্শন হ'লেই পাপ কি, পুণ্য কি, লোকে ঠিক বুঝ্তে পারে। কোনও কার্য্যে পাপ বোধ হ'লে তাকি সে আবার কর্‌তে পারে? এখন যাহা পাপ পুণ্য মনে কর্‌ছ, সমস্তই একটা সংস্কার মাত্র।"

বারদি নিবাসী জমিদার ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বর্ত্তমান খ্যাতনামা প্রিন্সিপ্যাল আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় কোনও সময়ে নানা কথাপ্রসঙ্গে একদিন ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—"আমরা প্রত্যহ রাশি রাশি অপরাধ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে আরও একটি গুরুতর অপরাধের যোগ করিয়া যেন আপনি আমাদিগকে আরও বিপন্ন করিলেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"কেন?"

উত্তর—"আপনি যে সকল বিধি নিষেধ বিধান করিয়াছেন, তাহা পালন করা সুদুষ্কর। আমাদের অপর অপরাধের উপর, গুরুনিদেশলঙ্ঘন নামে আরও গুরুতর অপরাধের যোগ হইয়াছে।"

ঠাকুর খুব স্নেহের সহিত বলিলেন—"এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কিছু স্থির হয়েছে?"

কুঞ্জ বাবু বলিলেন—"আমি মনে মনে একটা সমন্বয় করিয়া লইয়াছি, তাহা ঠিক কি না, আপনি জানেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"কি সমন্বয়?"

উত্তর—"আপনার বিধি নিষেধ আপাততঃ সহজ বোধ হইলেও অতি কঠিন। একটি দিনও যদি তাহা পালন করিয়া উঠিতে পারি, তবে ত জীবন্মুক্ত হইয়া যাই। আপনি এরূপ আশা ও ইচ্ছা করেন না যে, একদিনে আমরা তাহা পালন করিতে সমর্থ হইব। কতকগুলি উচ্চলক্ষ্য আমাদের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। তাহার দিকে চাহিয়া সাবধান ও সচেষ্ট ভাবে চলিলে ক্রমে আমরা সেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ হইয়া ধন্য হইব, ইহাই আপনার অভিপ্রায়। তাহা না হইলে, আমাদের কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণের পথ প্রস্তুত হইয়াছে মনে করিতে হয়।"

ঠাকুর বলিলেন—"ঠিক, ঠিক, তাই ত ঠিক।"

সাধুর প্রতি অনাদরে ও উৎপীড়নে বিপত্তি।

১০ই ফাল্গুন, রবিবার। আজ অপরাহ্ণে, সহরহইতে অনেক লোক আসিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মবিষয়ে নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা হইতে লাগিল।

একটি ভদ্রলোক ঠাকুরকে বলিলেন—"ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী আছেন শুনিতে পাই, তাঁহারা বঙ্গদেশে আসেন না কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"এ সম্বন্ধে আমি কোন কোন জমাতের মহান্তদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁরা বল্‌লেন, 'বাঙ্গলা দেশে তাঁদের আদর যত্ন নাই, থাক্‌বারও স্থান নাই। এদিকে এলে আহার ও বাসের অসুবিধাতেই তাঁদের ভেগে পড়্‌তে হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই সাধুদের থাক্‌বার বড় বড় ধর্ম্মশালা, সত্রাদি আছে; যত কাল ইচ্ছা সাধুরা তাতে আরামে থাক্‌তে পারেন। স্থানীয় জমিদার, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি ধনী লোকেরা তাঁদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে সেবা করেন। বাঙ্গলা দেশে সে প্রকার স্থানও নাই, আর তাঁদের সেবা করে এমন লোকও নাই। বরং গুণ্ডা, চোর, বদ্‌মাইস মনে ক'রে, বাঙ্গালীরা তাঁদের অবজ্ঞাই করে।"

এক জন বলিলেন—পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলোকেরা খাবার না পাইলে, গায়ে ভস্ম মেখে, লেংটী প'রে, সাধু হয়। অনেক গুণ্ডা বদ্‌মাইসও সাধুর বেশে ঘুরে। সুবিধা পাইলে তারা সর্ব্বত্রই চুরি ডাকাতিও করে। ভাল সাধুরা একটু পরিচয় দিলেই ত পারেন।

উত্তর—"পরিচয় নিতে জান্‌লে তাঁরাও পরিচয় দেন। অনেকে সাধুদের পরখ্ কর্‌তে গিয়ে বিপন্নও হ'য়ে পড়েন।"

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুদিন পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। যথা—"একবার গঙ্গাসাগরের পথে একদল সাধু রামপুরহাটে কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। রাস্তার ধারে অনাবৃত মাঠে তাঁহারা ধুনি জ্বালিয়া দিনরাত থাকিতেন। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা অপরাহ্ণে তাঁহাদের দর্শন করিতে আসিতেন। একটি বাঙ্গালী বাবু—উকিল, প্রত্যহই আসিয়া সাধুদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সাধুদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। স্থূল শরীর দেখিলে, তিনি কোনও সাধুর পেটে লাঠি দিয়া

খোঁচা মারিয়া, বলিতেন, 'আরে তোম্ তো হালুয়া মালপোয়াকা সিধ্ হো, ক্যাত্‌না খাতা হ্যায়;' কোন সাধুর জটাটি ঝাঁক্‌রাইয়া বলিতেন, 'চোরাই মাল ক্যাত্‌না ইস্‌মে রাখা হ্যায়? রাত্‌মে চুরি কর্‌তা হ্যায়, আউর দিন মে সাধু বন্‌কে বৈঠা হ্যায়।' সাধুরা ঐ বাঙ্গালী বাবুকে দেখিলেই ভয়ে জড়সড় হইতেন। জমাতের ভিতরে একটি সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন, তিনি মহান্তকে বলিলেন, 'মহারাজ, বাঙ্গালী বাবু নিত্ আয়্‌কে বড়া অপরাধ কর্‌কে যাতা হ্যায়, উস্‌কো জেরা রুপা কীজিয়ে।' মহান্ত বলিলেন, 'বাঙ্গালী-লোক সাধুকো নেহি মান্‌তা হ্যায়।' একদিন ঐ বাবু আসিয়া মহান্তকে বলিলেন, 'এই সাধু! তোম্ গাঁজামে তো খুব দম্ মারতা হ্যায়, ইস্‌মে তো খুব কেরামৎ। আউর কুছ্ কেরামৎ দেখলানে সেক্‌তা হ্যায়?' এই সময়ে সেই সিদ্ধপুরুষটি উকিল বাবুকে ডাকিয়া খুব তেজের সহিত বলিলেন, 'আরে বাঙ্গালী বাবু, ক্যা বল্‌তা হ্যায়? সাধুকা আউর কুছ্ কেরামত দেখোগে? ভালা, লেড়্‌কা বালা লেকে ঘর কর্‌তা হ্যায় তো; আচ্ছা, চলা যাও ঘর, আব্ যায়্‌কে সাধুকা কেরামৎ দেখো।' সাধুর কথা শুনিয়া, উকিল বাবু চমকিয়া গেলেন, মুখ তাঁর শুকাইয়া গেল; তিনি দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিলেন; রাস্তায় দেখিলেন, তাঁর চাকরটি ছুটিয়া আসিতেছে। বাবুকে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, 'বাবু, আপনার ছেলেকে সাপে কাটিয়াছে।' বাবু বাড়ী যাইয়া, ছেলের মূর্চ্ছা অবস্থা দেখিয়া, একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন; তখনই ওঝা, বৈদ্য, ডাক্তারাদি আনাইয়া যত প্রকার চেষ্টা করিবার করিলেন, কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল। তখন সাধুর ইচ্ছাতেই এই প্রকার ঘটিয়াছে বুঝিয়া, সস্ত্রীক তিনি ঐ সাধুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনেক কান্নাকাটি করিয়া সাধুর পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন। সাধু বলিলেন— 'আব্ কাহে আয়া? সাধুকা কেরামৎ দেখো না? আউর তিন রোজ বাদ আয় যাও।' সাধুর কথায় আশ্বাস পাইয়া, উকিল বাবু, ছেলেটিকে একটি ঘরে রাখিয়া দিলেন, তাহার শরীর ফুলিয়া গেল; তিন দিন পরে তিনি সাধুর পায়ে পড়িয়া ঔষধ চাহিলে, সাধু ধুনি হইতে কিছু ভস্ম লইয়া বাবুটির হাতে দিয়া বলিলেন, 'আপ্‌না হাত্‌সে শও ঘয়লা পানি লেকে, লেড়্‌কা কা শিরপর ঢাল দেও, আউর এহি ভসম্ আচ্ছা কর্‌কে উস্‌কা শরীরমে মল্ দেও; আধা ঘণ্টা বাদ লেড়্‌কা আচ্ছা হো যায়েগা।' সাধু এই বলিয়া তখনই জমাত ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বাবুটি ঐ প্রকার করাতে ছেলেটি সুস্থ হইয়া উঠিল। সকলে অবাক্। বাবুটি পরে সাধুকে ঢের খুঁজিলেন, কিন্তু আর পাইলেন না।"

স্বপ্ন—কর্ম্মের উপদেশ

ঠাকুর, আমাকে কিছুকালযাবৎ, আশ্রমস্থ সকলের সেবা ও বাহিরের কাজ কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। সকাল বেলাহইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার নিয়মিত কার্য্য করিয়া প্রায় অবসর পাই না, সময়ে সময়ে নাম করিতে বিরক্তি বোধ হইলেও, বাহিরের কোন্ কাজ কর্ম্মে বা কাহারও সেবা করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি ঐ সময়ে কোন একটি প্রশ্ন তুলিয়া ঠাকুরেরই সঙ্গে গল্প করি। গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, একটি মহাত্মা আমাকে আসিয়া বলিলেন, 'গুরু যেমন বলেছেন, ঠিক সেই মত ক'রে যাও, ওতে কখনও নিরুৎসাহ হ'য়ো না। কর্ম্মটি ত্যাগ করতে নাই। যতকাল না বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ লাভ হয়, তত কালই কর্ম্ম করতে হবে; রজস্তমোগুণ যত কাল আছে, কর্ম্ম না ক'রে নিস্তার নাই। আলস্য ক'রে কর্ম্ম না করলে, পরে ভুগতে হবে। বৈধ কর্ম্ম দ্বারাই রজস্তমোগুণ নষ্ট হ'য়ে যায়।' স্বপ্নের কথা ঠাকুরকে বলাতে, ঠাকুর বলিলেন—"**সময় দীর্ঘ বোধ হ'লে বা নাম করতে বিরক্তি জন্মালে, ব'সে থাকতে নাই, বাহিরের কাজই করতে হয়। ঐ সময় জোর ক'রে নাম করতে গেলে, নামে আরও শুষ্কতা আসে। তাতে অনিষ্ট হয়।**"

১২ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আমি বলিলাম—আমার মনে হয়, বাহিরের কাজ কর্ম্ম করা অপেক্ষা, ঐ সময়ে জোর ক'রে নাম বা পাঠ করাতেই বেশী উপকার হয়।

ঠাকুর বলিলেন—"**সে কিছু নয়। বাহিরের কাজ কর্ম্ম করা আর নাম করা, আমি কিন্তু সমানই মনে করি। সমস্তই ত কর্ম্ম। লক্ষ্যটি স্থির থাকলেই হ'ল। কর্ম্ম করা নিয়ে কথা, কার কোন্ কর্ম্মে কি বস্তু লাভ হয়, তা কে বলতে পারে? লক্ষ্যটি স্থির রেখে কাঁথা সেলাই-ই কর আর নামই কর, একই কথা। জীবনের গতি কোন্ দিকে, তাহা একটা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত, এরূপই করতে হয়। তোমার এখনও একটা জীবনের দিক্ ঠিক হয় নাই। যখন তাহা ঠিক হ'য়ে যাবে, তখন একধারা কর্ম্ম করবে। জীবনের গতি ঠিক হ'তে, এখনও বহু বিলম্ব। এ জীবন কোন্ দিকে কোন্ পথ দিয়ে যাবে, বলা যায় না। সকলেরই এক পথ নয় ত। নানাপথে চ'লে, মানুষ**

লক্ষ্যবস্তু লাভ করে। ব'সে থাক্‌তে নাই; তা হ'লেই ক্রমে একটায় গিয়ে দাঁড়াবে।"

স্বপ্ন—প্রলয়ের দৃশ্য।

১৫ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

গত রাত্রে একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম—'বেলা অবসানপ্রায়, আমি রান্না করিতে বসিয়াছি, অকস্মাৎ ঘরখানা কাঁপিয়া উঠিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মুহুর্মুহুঃ ভূমিকম্প হইতে লাগিল। বসিয়াও আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। চারিদিকে ভীষণ শব্দ শুনিয়া, ঘরহইতে বাহির হইয়া পড়িলাম; দেখিলাম, বিষম ব্যাপার—

অনন্ত আকাশব্যাপী ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবায়ু গ্রহ-উপগ্রহ-সমেত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটিকে চক্রাকারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কোথায় যেন লইয়া যাইতেছে। ধূলিরাশিতে সমস্ত নভোমণ্ডল একেবারে ধুমাকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য কাক, চিল, বাজ প্রভৃতি পক্ষী সকল ঘূর্ণিবায়ুতে পড়িয়া, আবর্ত্তজলের তৃণের মত, ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর দিকে আসিয়া পড়িতেছে। চটাচট্ শব্দে চতুর্দ্দিকে রাশিকৃত শিলাবর্ষণ হইতেছে। মহা দুর্লক্ষণ দেখিয়া, আমি হঠাৎ পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম—ঝল্‌মল্ করিয়া ঐ দিকে একটি সূর্য্য উঠিল। বিস্মিত হইয়া অমনই আমি আকাশের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম। দেখিলাম—সকল দিকেই একটি একটি করিয়া সূর্য্য উদয় হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে দশ বারটি ভয়ঙ্কর প্রখরতেজোবিশিষ্ট সূর্য্যের এককালে প্রকাশ ও তাহাদের ঘন ঘন কম্পন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। সে সময়ে ঐ সকলের সহিত পৃথিবীটিও ভয়ঙ্কর সোঁ সোঁ শব্দে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া, নিম্নদিকে কোথায় যেন যাইতে লাগিল। আমি অমনই আসনে বসিয়া গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যানে রাখিয়া 'জয়গুরু,' 'জয়গুরু,' বলিতে বলিতে মগ্ন হইয়া পড়িলাম। একটু পরেই দেখি, সকল দিক্ শান্ত হইয়া গিয়াছে, সমস্ত নিস্তব্ধ!' অমনই জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুর স্বপ্নটি শুনিয়া বলিলেন—"ভবিষ্যৎ প্রলয়ের দৃশ্যটিই দেখেছ। প্রলয় অনেক প্রকার আছে। যা দেখেছ, তা এই সৌর জগতের প্রলয়, ওরূপ একটা সময় শীঘ্রই আস্‌ছে বটে।"

স্বপ্ন—ঠাকুরের দেহত্যাগের উদ্যোগ।

১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

তিন চার দিন হয়, স্বপ্নে ভয়ানক প্রলয়ের দৃশ্য দেখিয়াছি, গতকল্য আবার তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া, মন অতিশয় খারাপ হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম—আমরা বহুলোক ঠাকুরের সঙ্গে একটা স্থানে রহিয়াছি। ঠাকুর উত্তর দিকে আসন করিয়া বসিয়া বলিলেন, আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে; এখন আমি দেহ ত্যাগ করবো।' পরে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'শ্রীবৃন্দাবনে আমার কাঁথাখানা ফেলে এসেছিলাম, তাহা কেহ নিয়ে আসতে পার?' আমি অমনই শ্রীবৃন্দাবনে চলিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঁথাখানা আনিয়া দিলাম। ঐ সময়ে গুরুভ্রাতাভগিনীরা ঠাকুরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। আমি ঠাকুরের বামপার্শ্বে, একহাত অন্তরে রহিলাম। ঠাকুর সকলেরই প্রতি সস্নেহদৃষ্টি করিয়া, এক এক জনকে এক একটা কিছু দিতে লাগিলেন। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ঠাকুরের নিকটে থাকিলেও, ঠাকুর আমাকে কিছুই দিলেন না। পরে দেহত্যাগের সময়ে, সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কি, তোমাকে কিছু দিই নাই?' এই বলিয়া নিজ মস্তকের সম্মুখহইতে একটি জিনিস মুঠে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন 'আচ্ছা তুমি এটি নেও।' ওটি পাওয়া মাত্রে আমি মাথায় রাখিলাম। ভাবাবেশে উন্মত্তবৎ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। আর কান্দিতে কান্দিতে গাইতে লাগিলাম—'আমার জানি কি হ'লো গো, গৌরাঙ্গ বলিতে নয়ন ঝরে।' আমি ক্ষণকাল পরে ঐ জিনিসটি মাটিতে ফেলিয়া আসন করিয়া উহার উপরে বসিয়া, নাম করিতে লাগিলাম। আর অমনই জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুরকে স্বপ্নবৃত্তান্তটি বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি ত কখনও এ সব কল্পনাও করি না, তবে এরূপ দেখিলাম কেন?

ঠাকুর বলিলেন—"**কেন দেখ্‌লে, বলা যায় না। এ সব স্বপ্ন লিখে রাখ্‌তে হয়। সমস্ত স্বপ্নই অলীক নয়। একটি স্বপ্ন বিশ বৎসর পরে সত্য হয়েছে, দেখেছি।**"

আমি বলিলাম—যে বস্তু মাথায় একবার স্পর্শ করলে কৃতার্থ হওয়া যায়, তা মাটিতে ফেলে পেতে নিয়ে, আসন ক'রে বস্‌তে, আমার প্রবৃত্তি হ'লো কেন?

ঠাকুর বলিলেন—"**ওটি হ'চ্চে শক্তি। ভগবানের নাম করতে হ'লে, শক্তির উপরেই ত বস্‌তে হয়।**"

ইহার পর ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া, বলিলেন—"তোমাদের কয় ভাই-য়ের ভিতরেই বৈষ্ণব বীজ রয়েছে। এখন যে যে ভাবেই থাক, পরে সকলেরই বৈষ্ণব ভাব দাঁড়াবে।"

ঠাকুর দেহ ছাড়িবেন ভাবিয়া কোথায় দুঃখে অধীর হইব, তাহা না হইয়া, ঠাকুর এ জিনিস আমাকে দিবেন মনে করিয়া, গর্ব্ব হইতে লাগিল। হায় দশা! এই ত আমার অবস্থা!

কৃপণতায় অনুশাসন। ঘরখানা উইল করবে কার নামে?

২১শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার

আশ্রমের দক্ষিণের ঘরে, সকালে সন্ধ্যায়, অনেক গুরুভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হন। এই ঘরখানাই সকলের বসিবার ঘর। সুতরাং আসনে স্থির হইয়া এ ঘরে বসিবার যো নাই। ঠাকুরকে যাইয়া আজ বলিলাম, 'দক্ষিণের ঘরে সর্ব্বদাই লোকের গোলমাল। ওখানে সাধন করার বড়ই অসুবিধা। সকলেই এসে বাজে গল্প করে, অথচ তাহা বল্‌লে ঝগড়া হয়।'

ঠাকুর বলিলেন—"ওখানে অসুবিধা হ'লে অন্যত্রও ত যেতে পার? গাছ-তলায়, এদিকে সেদিকে, আশ্রমে স্থানের ত আর অভাব নাই। নাম করা নিয়ে কথা, তা ত যেখানে সেখানেই হ'তে পারে। দশটি লোক যেখানে মিলে মিশে একটা আনন্দ করে, সেখানে তাদের বাধা দিয়ে, নিজের সুবিধার চেষ্টা কর্‌তে নাই।"

আমি বলিলাম—'আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, পুকুরের পারে, আপনি যদি বলেন, একখানা ছোট ঘর করিয়া নিতে পারি। তা হ'লে আর কোনও অসুবিধা থাকে না।'

ঠাকুর বলিলেন—"তার পর? কোথাও চ'লে গেলে ঐ ঘরখানা উইল ক'রে যাবে কার নামে?"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর একথা আমাকে বলিলেন কেন?'

রাত্রিতে ঠাকুর আমার সম্বন্ধে মহেন্দ্র বাবুকে বলিলেন—"ওর সাধন ভজনেতে যা একটু হ'চ্ছে, এক কৃপণতা দোষে তা মাটি ক'রে দিচ্ছে। হাতে ওর এক শত টাকা আছে, অনেক চেষ্টায় জমায়েছে। তা কোন প্রকারে খরচ করায়ে

দিতে পারেন? কৃপণতাই সঙ্কীর্ণতা কি না। ধর্ম্মার্থীদের স্বভাবে একটি মাত্র দোষ থাক্‌লেও, তাতে ক'রে সাধন ভজনের সমস্ত ফল নষ্ট হ'য়ে যায়। এখন হ'তে এবিষয়ে সাবধান না হ'লে, ক্রমে ঘটনায় প'ড়ে, ধাক্কা খেয়ে খেয়ে, ঠিক হবে।"

ঠাকুর এ সময়ে ছোট দাদার উদারতার খুব প্রশংসা করিলেন। 'ঘরখানা উইল ক'রে যাবে কার নামে?' ঠাকুরের এই কথার তাৎপর্য্য এ সময় আমি বুঝিলাম। ঠাকুরের মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া, মাথা আমার বিষম গরম হইয়া গেল। ভাবিলাম, 'প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে যতকাল উদ্বেগ, অশান্তি ও ক্লেশ বোধ আছে, ততকাল বিনা আয়াসে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ঐ ক্লেশের ও অশান্তির উপশমের ব্যবস্থা রাখা দোষ হইল! নিয়ত অভাব ভোগ করিয়া মন যদি অশান্তিপূর্ণ ই রহিল, তা হ'লেই বা সাধন ভজন করিব কিরূপে? অর্থ সঞ্চয় ত সাধন ভজনেরই সুবিধার জন্য, বিলাসিতার জন্য ত নয়। ঠাকুর এত বুঝেন, আমার এই শুভ অভিপ্রায়টি বুঝিলেন না!'

আমার সঙ্কীর্ণতা। ঠাকুরের উপদেশ ও ভিক্ষার ব্যবস্থা।

২২শে ফাল্গুন, শুক্রবার।

গত কল্য ঠাকুরের মুখে আমার সঙ্কীর্ণতার বিষয় শুনিয়া অবধি, ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতেছি। প্রাণ যেন হু হু করিয়া জলিয়া যাইতেছে। অভাব বশতঃই আমার এই কৃপণতা অথবা স্বভাবেই আমার সঙ্কীর্ণতা, তাহা পরিষ্কার বুঝিতেছি না। ঠাকুর বলিয়াছেন যে, 'ক্রমে ধাক্কা খেয়ে, এ দোষ আমার দূর হবে।' কিন্তু ধাক্কাও ত কম খাইতেছি না! দোষ দূর হইতেছে কই? কয়দিন হয়, সরকারি ভাণ্ডারে 'ঘৃত বাড়ন্ত হইয়াছে' দিদিমা বলাতে, ঠাকুরের সেবায় আধ ছটাক পরিমাণ ঘৃত প্রত্যহ আমি দিয়া আসিতেছিলাম। পাঁচ ছয় দিন ঐ প্রকার দেওয়ার পর, একদিন আমার মনে হইল, 'ভাল! সরকারি ভাণ্ডারে ত ঘৃত আসিতেছে না, দিদিমাও বেশ সুবিধা বুঝিয়াছেন। ওরা যত কাল ঘৃত না আনিবে, তত কালই ত এই প্রকার ঠাকুর সেবায় আমাকে ঘৃত দিতে হইবে! এত কষ্টে আমি ঘৃত সংগ্রহ করি; এ ভাবে প্রতিদিন দিলে আমার এক মাসের হোমের ঘৃত ত দশ দিনেই শেষ হইয়া যাইবে।'

এই প্রকার বিচার ও আক্ষেপ আমার মনে আসার পরে, সেই দিনেই ঠাকুর, দিদিমাকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন—**"আহারের সময়ে ওর ঘি আমাকে দিবেন না। ঐ ঘি আমার হজম হবে না।"** ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলে মনে করিলেন, হোমের ঘৃত বহু

দিনের সংগ্রহ—নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; তাই ঠাকুর ঐ কথা বলিলেন।' আমি কিন্তু ঠাকুরের বলার তাৎপর্য্য, তখনই বুঝিয়া, কয়দিনযাবৎ জলিয়া পুড়িয়া যাইতেছি। আমার অভিপ্রায়-মতই ত ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তবে তাতেও এত জ্বালা কেন? ভিতরের ক্লেশ অসহ্য বোধ হওয়াতে, ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম, 'আমার সঙ্কীর্ণতা কিসে যাবে, বলিয়া দিন। হাতের টাকাগুলি আমি দান ক'রে ফেল্‌ব?'

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"টাকা যা রয়েছে, এখনই ব্যয় ক'রে দরকার নাই। এখন থাক্। সাময়িক একটা ভাবে বা উৎসাহে কোন কাজই কর্‌তে নাই। অনেক সময়ে, উৎসাহে দান ক'রে, পরে অনুতাপে লোক নরক ভোগ করে। সমস্ত কাজই স্বাভাবিক অবস্থায় ধীর ভাবে কর্‌তে হয়। এখন থেকে আর কিছু সঞ্চয় ক'রো না। দাদারা যাহা মাসে মাসে দেন, পাওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ ব্যয় ক'রে ফেলো। যে পথে চল্‌ছ, তাতে সঞ্চয় কর্‌তে নাই।"

আমি বলিলাম—'ব্যয় কি নিজের প্রয়োজনে কর্‌বো, না অন্যের জন্য?'

ঠাকুর বলিলেন—"তোমার আবার নিজের প্রয়োজন কি? আজ থেকে আহারের জন্য ভিক্ষা কর্‌বে। অর্থ কারও নিকট চাইবে না। ভিক্ষায়, দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত, গ্রহণ কর্‌বে না। কেহ বেশী দিয়ে গেলে, তা কাকেও দিয়ে দিবে। আহারের কোন বস্তুই সঞ্চয় কর্‌বে না। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত, রান্নাও কর্‌বে না। যে দিন ভিক্ষায় কিছু না জুটবে, ভাণ্ডার হ'তে নিবে। আশ্রমের ভাণ্ডারের সামগ্রী ত ভিক্ষুকদেরই জন্য। এই ভাবে চ'লে, যদি তেমন বৈরাগ্য জন্মে, তবেই ত সন্ন্যাস। না হ'লে, এখন থেকে যে দিকে জীবনের গতি হবে, সে দিকেই যেতে হবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই, সমস্ত অভ্যাস কর্‌তে হয়। ব্রহ্মচর্য্য ঠিক হ'লেই ত সব হ'লো। এ সকল অভ্যাস এখন না কর্‌লে, আর কর্‌বে কবে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ভিক্ষা কয় বাড়ী পর্য্যন্ত কর্‌তে পার্‌বো?'

ঠাকুর বলিলেন—"ভিক্ষা তিন বাড়ী পর্য্যন্ত কর্‌তে পার্‌বে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোন্ কোন্ জাতির বাড়ী ভিক্ষা করা যায়?'

ঠাকুর বলিলেন—"**চাল ভিক্ষা সকলের বাড়ীই করা যায়। শ্রদ্ধার ভিক্ষান্ন সর্ব্বত্রই পবিত্র। ব্রহ্মচারীদের, ভিক্ষাই ব্যবস্থা।**"

প্রথম ভিক্ষা ঠাকুরের হাতে ; এ কি চমৎকার !

ঠাকুর এ সকল কথা বলিয়া নীরব হইলেন, পরে আমি ভাবিতে লাগিলাম—'লোকে বলে, প্রথম দিনের ভিক্ষা যে ভাবে যাহা পাওয়া যায়, সারা জীবনে ভিক্ষা সে ভাবেই সেই প্রকারের বস্তু লাভ হইয়া থাকে। এজন্য নাকি উপনয়নের সময় ভিক্ষা মা'র হাতেই প্রথমে লইতে হয়। স্নেহভাবে দরদ করিয়া উৎকৃষ্ট পবিত্র বস্তু, ঠাকুর বিনা কে আর আমাকে দিবে?' এই মনে করিয়া, ঠাকুরকে বলিলাম, 'জীবনে প্রথম ভিক্ষা তা হ'লে আপনার নিকটই আজ কর্‌বো?'

ঠাকুর খুব স্নেহের সহিত আমার দিকে চাহিয়া একমুখ হাসিয়া বলিলেন—"**তা বেশ, আজ আমিই তোমাকে ভিক্ষা দিব, কাল থেকে অন্য বাড়ী যেও। এখন ভিক্ষা এ পাড়াতেই ক'রো।**"

সকাল বেলা, ঠাকুরের আদেশ ও উপদেশ পাইয়া, নিজ আসনে আসিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময়ে দেখি, আশ্রমে মহা ঘটা পড়িয়া গেল। একটি অবস্থাপন্ন ভক্ত গুরুভ্রাতা, আজ ঠাকুরের সেবার জন্য প্রচুর সামগ্রী লইয়া, আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পলাউ, ছানার ডাল্‌না প্রভৃতি বহু উপাদেয় খাদ্য, ঠাকুরের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইল। বেলা প্রায় একটার সময়ে, ঠাকুরের সেবা হইল। আহারান্তে ঠাকুর, নিজ হাতে ভুক্তাবশিষ্ট পলাউ এবং ডাল্‌না প্রভৃতি, একটি পাথরের বাটীতে তুলিয়া, আমাকে ডাকিয়া উহা দিয়া বলিলেন—"**এই নেও, আজ এই তোমার ভিক্ষা। এখন নিয়ে রেখে দেও, তোমার আহারের সময়েই খেয়ো।**"

আমি খুব আনন্দিত মনে উহা লইয়া আসিলাম এবং ঢাকিয়া রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম—'হায় ঠাকুর! পলাউ যদি দিলে, তা হ'লে গরম গরম এখনই খেতে বল্‌লে না কেন? চার পাঁচ ঘণ্টা পরে ইহা ত জুড়ায়ে একবারে জল হ'য়ে যাবে। প্রথম ভিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রসাদ হাতে ধ'রে দিলেও গরম থাক্‌তে তৃপ্তির সহিত খেতে দিলে না!'

ঠাকুরের সেবার পর, নিয়মিত রূপে মহাভারত পাঠ করিয়া, স্থির হইয়া আসনে বসিয়া রহিলাম। ঠাকুর, আর আর দিনের মত, ৫॥ টার সময়ে আমাকে বলিলেন—"**যাও, এখন**

তুমি আহার কর গিয়ে।" আমি আহার করিতে বসিয়া, প্রসাদের বাটীটি স্পর্শ করিয়াই, চমকিয়া উঠিলাম। 'দেখিলাম, তরকারি সহিত সমস্ত পলাউ চমৎকার গরম রহিয়াছে, ঠিক যেন উহা কেহ উননের উপরহইতে আনিয়া রাখিয়াছে।' পাথরের বাটীতে পলাউ-প্রসাদ, পাঁচ ঘণ্টা পরেও কি প্রকারে এত গরম রহিল, ভাবিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলাম। কতক্ষণ উহা লইয়া বসিয়া কান্দিলাম। প্রসাদ পাইতে আজ আমার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। প্রসাদ পাওয়ার পর গত রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম, 'সঙ্কল্প মাত্রে পাখীর মত শূন্যমার্গে অনন্ত আকাশে ঊর্দ্ধদিকে উড়িয়া যাইতেছি।'

অদ্য (২৩শে ফাল্গুন) জীবনে প্রথম, বাহিরে ভিক্ষা করিলাম। মনোহরা দিদি, খুব শ্রদ্ধার সহিত চাউল, বুটের ডাল, আলু, কাঁচকলা, বেগুণ, লঙ্কা, সৈন্ধব ও ঘৃত ভিক্ষা দিলেন। আমি নিজের পরিমাণ মত রাখিয়া, অবশিষ্ট পাখীদের ছড়াইয়া দিলাম। পকান্ন দ্বারা হোম করিয়া যোগজীবন, শ্রীধর ও পণ্ডিত মহাশয়কে এক এক গ্রাস দিয়া, প্রসাদ পাইলাম। ভিক্ষান্নে, আমার বড়ই তৃপ্তি বোধ হইল।

২৮শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

এই কয়দিনযাবৎ, ঠাকুরের কথা সর্ব্বদাই মনে হইতেছে। হাতের টাকাগুলি ব্যয় না করিয়া ফেলা পর্য্যন্ত, বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনে থাকার কালে মাঠাকুরুণ, ঠাকুরকে একখানা মহাভারত দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি, ঠাকুরকে তাহাই দিব স্থির করিয়া, টাকা আনিতে বাড়ী যাইব। ঠাকুরকে বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা জানাইলে, ঠাকুর বলিলেন, "**বাড়ী যেয়ে ভিক্ষা ক'রো না; মা'র মনে কষ্ট হবে। বাড়ীতে যখনই যাবে, মাঠাকুরুণের প্রসাদ পেও।**"

সমবয়স্ক গুরুভ্রাতা, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিত্রকে সঙ্গে লইয়া, বাড়ী চলিলাম। বাড়ী পঁহুছিতে নৌকায় ও স্থলপথে ৫।৬ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে বহুবার ১৫।২০ মিনিট করিয়া রাস্তায় ধূপ ধূনা চন্দন ও গুগ্‌গুলের পরিষ্কার সুগন্ধ পাইয়া, উভয়েই আশ্চর্য্য হইতে লাগিলাম। বিস্তৃত ময়দানে, চল্‌তি পথে, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার সদ্‌গন্ধ কোথা হইতে কি প্রকারে আসিতেছে, কিছুই বুঝিলাম না।

চৈত্র।

সেবা-ভক্তিতে বিগ্রহ জাগ্রত হন।

১০ই চৈত্র।

এবার বাড়ীতে মাতাঠাকুরাণী কথায় কথায় তাঁর গোপাল ঠাকুরের কথা বলিলেন, শুনিয়া অবাক্ হইলাম। মা'র দু'টি সুন্দর ছোট ছোট গোপাল ঠাকুর আছেন। তিনি প্রতিদিন তাঁহাদের খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সেবা পূজা করিয়া থাকেন। একদিন পাড়ার একটি দুষ্ট ছেলে, আমাদের বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়া, ঐ গোপাল ঠাকুর দু'টি দেখিতে পায়; খেলা সাঙ্গ হইলে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, সন্ধ্যার পরে, সে গোপাল দু'টি চুরি করিয়া লইয়া যায়। মা, তাহা কিছুই জানেন না। শেষ রাত্রিতে গোপাল ঠাকুর, স্বপ্নে মাকে বলিলেন—'ওগো! একবার আমাদের দ্যাখ্। ঐ দুষ্ট ছেলেটা আমাদের নিয়ে এই বাড়ীতে এনে উত্তরের ঘরে শিকার উপরে হাঁড়ির ভিতর নারিকেলের মালায় ক'রে রেখে দিয়েছে। সকাল হ'লেই, পুরুত পাঠায়ে, আমাদের নিয়ে যাস্।' মা, শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া, অমনই জাগিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্ততার সহিত ঠাকুরঘরে গিয়া, দেখিলেন—যথার্থই ঠাকুর সিংহাসনে নাই। তিনি অমনই পুরোহিতকে ডাকিয়া আনিয়া, স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। পুরোহিতঠাকুর, গ্রামের অপর প্রান্তে সেই বাড়ীতে যাইয়া, একবারে ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং শিকার উপর হাঁড়ির ভিতরে নারিকেলের মালায় গোপাল দুইটিকে পাইয়া, লইয়া আসিলেন।

ঠাকুরকে এই কথা বলায়, ঠাকুর বলিলেন—"শ্রদ্ধা ক'রে সেবা পূজা করলে, বিগ্রহ জীবন্ত হন। তখন তিনি সেবকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন; মানুষের মত খাবার চান; কোনও প্রকার অনাচার অত্যাচার হ'লে ব'লে দেন। এ সব কিছুই আশ্চর্য্য নয়। অনেক স্থলেই এ সব দেখা যায়। তোমার দাদার শালগ্রামটিও বড় চমৎকার; বেশ জাগ্রত। আমি যখন ফয়জাবাদে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম, একদিন অযোধ্যা থেকে ঠাকুর দর্শন ক'রে বাসায় এসে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই, তোমার দাদার ঠাকুর, আমাকে বললেন—'ওরে, আমাকে কিছু খাবার দে। ওরা আমার পূজা করে, কিন্তু

খাবার দেয় না।' আমি সঙ্গে কিছু খাবার এনেছিলাম, তাই ঐ বামনদেবকে দিলাম। সেই থেকেই তোমার দাদা, ঠাকুরের ভোগ দিচ্ছেন।"

এই বলিয়া ঠাকুর, দাদার শালগ্রামের আরও অনেক কথা বলিলেন। সে সকল বিষয়, গত বৎসর আমি যখন দাদার নিকটে ছিলাম, দাদার মুখে শুনিয়া, সেই সময়ের ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি, এজন্য এস্থলে আর লিখিলাম না। কোনও একটি বৈষ্ণব পরমহংস, অযাচিত ভাবে হঠাৎ একদিন আসিয়া, ঐ শালগ্রামটি, দাদাকে দিয়া যান। দাদা, তাঁকে বলিলেন—'আমি, এ সব মানি না, বিশ্বাস করি না।' পরমহংস বলিলেন —'ঘরে এমনই রেখে দিন। ঠাকুর আমার খুব জাগ্রত, ইনি নিজেই মানায়ে নিবেন।' দাদা, শালগ্রাম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিলেও, ঠাকুরের কৃপায়, শালগ্রামকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ঠাকুর, দাদার কথা তোলাতে, সুযোগ পাইয়া বলিলাম—'কয়দিন হয় দাদা, তাঁর ৫।৬ বৎসরের মেয়েটির জাগ্রত অবস্থায়ও যে সকল দর্শনাদি হয়, সে সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে লিখিয়াছেন।' এই বলিয়া আমি বিস্তারিত রূপে, দাদার পত্রের বিষয়, ঠাকুরকে জানাইলাম।

ঠাকুর বলিলেন—"তোমার দাদা ডাক্তার মানুষ। লিখে দাও, মাথা গরম হয়েছে বা কোন রোগ হয়েছে মনে ক'রে, ওকে ঔষধ পত্র না খাওয়ান। এ অবস্থায় ঔষধ খাওয়ালে অনিষ্ট হবে। সাধারণে চোখে যা দেখে না, কেহ তা দেখে বল্‌লেই গোল। লোকে মনে করে, মাথার কোন রোগ হয়েছে। এ অবস্থায় রোগ মনে ক'রে ঔষধাদি খাওয়ালে, অনেক সময়ে বিপদ্ ঘটে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'মাথার গোলমালে কি লোকে ওসব দেখে না?'

উত্তর—"তা দেখ্‌বে না কেন, খুব দেখে। এজন্যই শাস্ত্র পুরাণের বর্ণনার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলায়ে নিতে হয়। মাথার গোলমালে যা দেখে, তা গোলমালই দেখে, প্রমাণের সহিত তার মিল থাকে না।"

প্রশ্ন—'সাধনের সময়ে আসনে ব'সে, লোকে যে সব বিভীষিকা দেখে, তা কি সত্য?'

উত্তর—"আসনে স্থির থেকে সাধন কর্‌লেই, তা সত্য কি মিথ্যা ধরা পড়ে।"

কৌশলের দান; অনুতাপ।

১২ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

বাড়ী যাইয়া, এবার ৮।১০ দিন ছিলাম। পোষ্টাফিস হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া, মাতাঠাকুরাণীকে ২৫৲ টাকা দিয়া, গেণ্ডারিয়া আসিয়াছি। ঠাকুরকে একখানা মহাভারত কিনিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে, একটি গুরুভ্রাতাকে ৪০৲ টাকা দিলাম। নিজের প্রয়োজনে পুস্তক ক্রয় করিয়া, ৮।১০ টাকা ব্যয় করিলাম। অবশিষ্ট টাকা দু' দিন আমার হাতেই রাখিয়াছিলাম। কোন কোন গুরুভ্রাতা, তাহা জানিতে পারিয়া, অভাব ও প্রয়োজন জানাইয়া, আমার নিকট কিছু কিছু চাহিতে লাগিল। আমি বিষম ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। ভাবিলাম 'এ কি উৎপাত।' আমি তাড়াতাড়ি ঐ টাকাগুলি লইয়া গিয়া, দিদিমার হাতে দিয়া বলিলাম—'দিদিমা! এই টাকা আপনার ইচ্ছামত ব্যয় করিবেন; আশ্রমের ভাণ্ডারে ইহা আমি দিলাম।' জানি না, ঠাকুর কোন্ সূত্রে আমার দানের কৌশল বুঝিয়া, আমাকে বলিলেন—"**আশ্রমের ভাণ্ডারের জন্য বুড়োঠাক্‌রুণের হাতে অতগুলি টাকা দিয়েছ কেন?**"

ঠাকুরের ঈষৎ হাস্যমুখে, ঠাট্টার ভাবে, এই প্রশ্নটি শুনা মাত্র, আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল, আমি লজ্জায় মাথাটি হেট করিয়া, নীরবে বসিয়া রহিলাম, ভাবিলাম—'হয়েছে, এবার বুঝি সব গুমর ফাঁক!'

গত বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে, দামোদর পূজারিকে যে দান করিয়াছিলাম, তাহা আমার এ সময়ে মনে পড়িল, আর ভয়ানক অনুতাপে ও জ্বালায় অস্থির হইতে লাগিলাম। গত বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেই, ঠাকুর আমাকে যমুনায় স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। সঙ্গে আমার এগারটি টাকা ছিল। আল্‌গা স্থানে রাখিয়া গেলে, পাছে কেহ জানিতে পারে, এই আশঙ্কায়, উহা টেঁকে গুঁজিয়া স্নান করিতে গেলাম। পথ আমার অজ্ঞাত বলিয়া, কুঞ্জের মালীক দামোদর পূজারি সঙ্গে চলিলেন। স্নানের সময়ে টাকা সারিয়া রাখিতে, দামোদর উহা দেখিয়া ফেলিলেন। আমি মহা সঙ্কটে পড়িয়া গেলাম। ভাবিলাম, ঠাকুরের কোন কিছুর প্রয়োজন জানাইয়া এ বেটা যখন ইচ্ছা, টাকা কয়টা বাহির করিয়া লইবে। নজর যখন উহার পড়িয়াছে, এ টাকা যাওয়ারই মধ্যে। সুতরাং এখনই ভবিষ্যৎ উৎপাতহইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করা ভাল।' মনে মনে এই স্থির করিয়া, স্নানের পর দামোদরকে বলিলাম—"পূজারিজী! আপনিই ত আমাদের ঠাকুরের সেবার সমস্ত ভার লইয়া আছেন। এই কয়টা টাকা মাত্র আমার

আছে, আপনি ইহা ঠাকুরের সেবায় লাগাইয়া দিবেন। আর আমি যে দু' তিন মাস আপনার আশ্রয়ে থাকিব, দয়া করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ, দু' বেলা দু' মুঠো আমাকে দিবেন। তীর্থে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণকেই ত দান করিতে হয়, না হ'লে কিছুই ত সফল হয় না। তাই, আমার যাহা কিছু আছে, আপনাকেই দান করিলাম, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।' এই বলিয়া টাকা কয়টি দামোদরের হাতে দিয়া নমস্কার করিলাম। দামোদর হাতে টাকা পাইয়া, খুব খুসি হইয়া, অত্যন্ত আদরের সহিত আমার পিঠে দু'টি চাপড় মারিয়া বলিলেন—' ও তোহারা তো ভক্তি বড়া ভারি! ভালা! ভালা!! আরে সব দে দিয়া! রাম! রাম!!' আমিও মনে মনে বলিলাম—' হাঁ, দান ভক্তি আমার যা, তুমি পরে বুঝ্‌বে।'

এবারও, আশ্রমসেবার জন্য দানটি, আমার যে ভাবে হইয়াছে জানিতে পারিয়া, ঠাকুর বলিলেন—"যার প্রয়োজন, কোনও দিক্ না তাকায়ে, দান তাকেই কর্‌তে হয়। দান দরদ ক'রে কর্‌তে হয়। নিজের একটা অভাব হ'লে তা যেমন পূরণ কর্‌তে ইচ্ছা হয়, অন্যের প্রয়োজনও যদি সেই প্রকার মনে লাগে, তা হ'লেই যথার্থ দান হয়। শ্রদ্ধাশূন্য দান, দেখাদেখি দান বা উৎপাত শান্তির জন্য যে দান, তাকে দান বলে না। আর প্রতিষ্ঠার জন্য দান, একটা মতলব ক'রে দান বা অন্য কোন প্রকারে স্বার্থের গন্ধ রেখে যে দান, তা দানই নয়। উহা একটা কৌশল করা মাত্র। ওতে আত্মার কোন কল্যাণই হয় না, বরং অনিষ্ট হয়।"

দুর্দ্দিনে ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি।

১৩ই চৈত্র, শুক্রবার।

গতকল্য একাদশী তিথিতে, আর আর বারের মত, নিরম্বু উপবাস করিয়াছি। সন্ধ্যার পরে, ছয় সাত বৎসরের কয়েকটি বালিকা আসিয়া, আমার আসনের পাশে বসিল এবং গল্প বলিতে পুনঃপুনঃ জেদ করিতে লাগিল। আমি, দু' একটি গল্প শুনাইয়াই, তাহাদিগকে বিদায় করিলাম। রাত্রে স্বপ্নদোষ হইল। অবশিষ্ট রাত্রি, প্রায় বারটাহইতে ভোর বেলা পর্য্যন্ত, একবার বাহিরে একবার ঘরে, উঠাবসা করিয়া কাটাইলাম। বিষম আক্ষেপ আসিল। মনের ক্লেশে মাথাটি আগুন হইয়া গেল। ঠাকুরের উপরে, দারুণ অবিশ্বাস জন্মিল। ভাবিলাম—' সমস্তই বৃথা! অনর্থক শ্রম

করিতেছি।' সামান্য শরীরের একটা দুর্গতি, যে গুরুর ব্যবস্থামত, এত কাল কার্য্য করিয়াও ফিরিল না, তাঁর উপদেশ মত চলিলে, স্বভাবের দোষ, মনের বহির্ম্মুখ দুরবস্থা যে দূর হইবে, তারই বা প্রমাণ কি? ভগবান্‌কে লাভ করিব প্রত্যাশায়, যাঁহার কৃপাই একমাত্র ভরসা করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছি এবং যাঁহার উপদেশই একমাত্র কর্ত্তব্য জানিয়া, স্থির হইয়া বসিয়া আছি, সামান্য সামান্য বিষয়েই যদি তাঁর বাক্য মিথ্যা হইল, তাহা হইলে, প্রকৃত ধর্ম্মলাভের জন্য তিনি যে সকল উপায় বলিয়া দিতেছেন, তাহা যে সত্য, তারই বা বিশ্বাস কি? চিকিৎসকের ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবনে রোগের উপশম না হইলে, তাঁহার হাতযশে রোগীর নির্ভর করা, আর অদৃষ্টের দিকে চাহিয়া থাকা, একই কথা। আমি, তাহা কিছুতেই পারিব না। কল্যই আমি ঠাকুরকে শেষ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিব।' এই স্থির করিয়া, সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অরুণোদয়ে স্নান করিয়া, কোনও প্রকারে নিত্যকর্ম্ম সারিয়া নিলাম। নির্জ্জনে অবসর বুঝিয়া, ঠাকুরের চা-সেবার সময় সময় কালে, তাঁর পশ্চাদ্দিকে, ঘরের বাহিরে, উঠানে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। "হায়! ঠাকুরকে ছাড়িয়া চলিলাম", এ সময়ে মনে হইতেই, আমার কান্না আসিয়া পড়িল, আমি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। এই সময়ে ঠাকুরও, আধকান্না স্বরে, প্রায় দুই মিনিট কাল "**হরি বোল,**" "**হরি বোল**" বলিতে লাগিলেন। আমি মাথা তুলিতেই, ঠাকুর পশ্চাদ্দিকে আমার পানে মুখ ফিরাইয়া, মমতাপূর্ণ ছলছল চক্ষে, খুব স্নেহভাবে ডাকিয়া বলিলেন—"**আহা কাল নিরম্বু ক'রে এখনও কিছু খাও নাই? এই নেও, একটু জল খেয়ে এখন ঠাণ্ডা হও গিয়ে।**"

এই বলিয়া, ঠাকুর কিছু মিষ্টি ও একটি বেল আমার হাতে দিলেন। ঠাকুরের সেই সময়ের কান্না, অর্দ্ধস্ফুট স্বর ও এক প্রকার চাহনিতে, আমার যেন বুক ফাটিয়া গেল। কেবল এই মনে হইতে লাগিল, 'আহা! এ জগতে এরূপ দরদের চ'ক্ষে কে আর আমাকে দেখিবে?' আমি কান্দিতে কান্দিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। একটু পরে খাবার লইয়া, নিজ আসনে আসিয়া বসিলাম।

সকালে জলযোগের পর, বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে, ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। ঠাকুর কিছুকালের জন্য পাঠ বন্ধ করিলেন। ঐ সময়ে আমি বলিলাম, 'অনেক সময়ে অনেক কথা আপনাকে বলিব মনে করি, কিন্তু নিকটে আসিলেই সব ভুলিয়া যাই।'

ঠাকুর আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"**বলিবে আর কি? বলা কওয়ার আর**

কি আছে? কাজ ক'রে যাও। একটা স্থায়ী অবস্থা হঠাৎই ত মহাত্মারা দেন না। সিংহের দুধ সোণার পাত্রে না রাখ্‌লে টেকে না, নষ্ট হ'য়ে যায়। মহাত্মারা পাত্রটি ঠিক ক'রে নিয়ে, বস্তু দেন। অবস্থালাভের জন্য ব্যস্ত হইও না, সে ঠিক সময়েই হবে।”

আমি বলিলাম—'এক সময়ে হবে, এই আশা পেলেই ত নিশ্চিন্ত থাকি।'

ঠাকুর বলিলেন—“এখন যদি তোমাকে ঐ অবস্থা দেওয়া যায়, তোমার অনিষ্ট করা হবে। ঊর্দ্ধরেতা হ'লে, তুমি কারোকেই গণ্য কর্‌বে, না। ঐ অবস্থা লাভ হ'লে, তুমি স্থির থাকতে পার্‌বে না। ঐ ঐশ্বর্য্যেতে ক'রে, সমস্ত সংসার তুমি ছারখার কর্‌বে, সর্ব্বনাশ কর্‌বে। অভিমানটি নষ্ট হ'লেই, ওসব ঐশ্বর্য্যলাভ নিরাপদ। এখন কাজ ক'রে যাও। ওসব দিকে খ্যাল রেখো না। সব দিকে ঠিক হওয়া, দু' একদিনের কর্ম্ম নয়।”

ঠাকুর, একটুক্ থামিয়া, আবার বলিতে লাগিলেন—“ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে, স্ত্রীলোকের সহিত কোন প্রকার সংস্রবই রাখ্‌তে নাই। এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হ'তে হয়। তাঁদের দিকে তাকাবে না, তাঁদের সঙ্গে বস্‌বে না, তাঁদের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপও কর্‌বে না। স্ত্রীজাতি যেই কেন হউন না, অত্যন্ত বৃদ্ধাই হউন আর যুবতীই হউন অথবা নিতান্ত বালিকা খুকীই হউন, সর্ব্বদা তাঁদের থেকে তফাৎ থাক্‌বে। চুম্বকে যেমন লোহাকে টানে, সেই প্রকার স্ত্রীজাতির শরীর এমন কতগুলি উপাদানে গঠিত যে, তাতে পুরুষ শরীরকে আকর্ষণ করে। এটি বস্তুগুণ, এতে পাত্রাপাত্র, সাধু অসাধু বিচার নাই। এজন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা, এমন কি মাতা, ভগিনী, দুহিতার সম্বন্ধেও, সাবধান থাক্‌তে অনুশাসন ক'রে বলেছেন—

'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥'

মাতা, ভগিনী, দুহিতার সঙ্গেও নির্জ্জনে একাসনে বস্‌বে না; বলবান ইন্দ্রিয়-গ্রাম বিদ্বান্‌কেও আকর্ষণ করে। বিদ্বান্ বল্‌তে ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান

লাভ হয়েছে। যিনি মুক্তপুরুষ, তাঁকেও এতে আকর্ষণ করে। কাশীতে দণ্ডী স্বামী এ কথা বিশ্বাস করতে পার্‌লেন না, তিনি মনে কর্‌লেন, 'এ কখনও হয় ? ব্রহ্ম-বিদ্যা যিনি লাভ করেছেন, সেই বিদ্বান্‌কে কিছুতেই এতে আকর্ষণ করতে পারে না।' তিনি, ব্যাসদেব ভুল লিখেছেন মনে ক'রে, তা কেটে দিয়ে, 'নহি কর্ষতি, নহি কর্ষতি, নহি কর্ষতি' লিখে রাখ্‌লেন। তার পর তাঁর যে দুর্দ্দশা ঘটেছিল, তা ত শুনেছ ?"

অবিশ্বাস, সাধনে অভিমান ; অনুশাসন।

মহাভারতপাঠের পর, ভিতরে বিষম উদ্বেগ বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, ঠাকুরের সম্বন্ধে আমার যে সব অবিশ্বাস সন্দেহ জন্মিয়াছে, বলিয়া ফেলি। আমি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, ঠাকুরকে বলিলাম, 'মিথ্যা কথা বলা কি শুধু আমাদেরই দোষ, না ভগবানেরও ?'

ঠাকুর বলিলেন—"ভগবান্ কখনও মিথ্যা বলেন না ; তাঁর ইচ্ছা, কার্য্য, বাক্য সমস্তই সত্য। সেখানে মিথ্যার কিছুই নাই।"

আমি বলিলাম—'শ্যামবাজারে আমার প্রতি আদেশ হয়েছিল—"দু'টি ঘণ্টা স্থির হ'য়ে ব'সে নাম ক'রো, স্বপ্নদোষ হবে না।" আমি ত ঐ সময় থেকে প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ সাত ঘণ্টা ব'সে নাম কর্‌ছি, কিন্তু স্বপ্নদোষ ত নিবারণ হ'ল না। এজন্য আপনার কথায় আমার অবিশ্বাস আসিয়াছে। দেখিতেছি, আমরা মিথ্যা বলি অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ে, আর আপ-নারা বলেন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া, কোনও প্রকার অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ না করিয়া, একভাবেই থাকিয়া বলিলেন—"তুমি স্থিরমনে দু' ঘণ্টা নাম ক'রে থাক ?"

আমি বলিলাম—'স্থিরমনে কি ক'রে কর্‌ব ? মন ত স্বভাবতঃই অস্থির। আসনে দু' ঘণ্টারও অধিক সময় একভাবে ব'সে নাম করি।'

ঠাকুর বলিলেন—"তা হ'লে আর অন্যের দোষ কি ? দু' ঘণ্টা কেন, দু' মিনিটও তুমি স্থির হ'য়ে নাম কর না। একটিবার কর দেখি, কেমন কথা অন্যথা হয়। শুধু নাম কর্‌লেই ত হবে না, স্থির হ'য়ে করা চাই। এই নাম অক্ষর নয়, একটা শব্দ নয় ; এই নামে ভগবানের অনন্ত শক্তি। ভগবান্‌ই নাম। নাম করা

আর ভগবানের সঙ্গ করা এক। লক্ষ্য বস্তু ছেড়ে দিয়ে, নাম কর্‌লে কি-হবে ? নাম করার সময়ে, মনটি নানাদিকে ঘুরে বেড়ায়, নাম ঠিক করা হয় না। নিজের দোষ দেখ না, অন্যেরই দোষে কষ্ট পাচ্ছ মনে কর। নিজের ত্রুটি না দেখে, এরূপে অন্যের প্রতি দোষারোপ কর্‌তে নাই, অপরাধ হয়।"

একটু থেমে, আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—"তুমি অন্যান্য অপেক্ষা আসনে একটু অধিক সময় ব'সে থাক, এতেই তোমার কতটা অভিমান হয়েছে! দেখ, কি ভয়ানক! তোমার মত যারা আসনে বসে না নাম করে না, সর্ব্বদা হাস গল্প ক'রে বেড়ায়, কিছুই করে না দেখ্‌তে পাচ্ছ, তাদের ভিতরেও এমন সব সদ্‌গুণ আছে, যা তোমার নাই। কোন চেষ্টা না ক'রে, শুধু বিশ্বাসবলে, কেহ কেহ এমন অবস্থা লাভ কর্‌বে, যা সাধন ভজন ক'রে বহুকালে তোমার লাভ করা কঠিন হবে। সর্ব্বদা নিজেকে ছোট ভেবো, কারও অপেক্ষাই কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে ক'রো না। অনেকে, বহু সাধন ভজন ক'রে, কঠোরতা ক'রে, যে অবস্থা বহুকালে লাভ কর্‌তে পারে না, একটি লম্পটের, বদ্‌মায়েসের, ডাকাতের সেই অবস্থা স্বাভাবিকই থাক্‌তে পারে। অভিমান কর্‌বার কি আছে? একটু সাধন কর ব'লে, অভিমানে পথ দেখ্‌ছ না! এই অভিমান থাক্‌তে, একটা অবস্থা তোমাকে দিলে, ঐশ্বর্য্যমত্ত হ'য়ে তুমি কারোকে তৃণতুল্যও জ্ঞান কর্‌বে না। প্রতিকার্য্যে বিচার ক'রে চ'লো, বিচার না কর্‌লে অনেক অনর্থ জন্মে। নিজেকে ছোট ব'লে না জানা পর্য্যন্ত, হাজার সাধন ভজন চেষ্টা তপস্যায়ও কিছুই হবে না।"

১৫ই চৈত্র, রবিবার।

ঠাকুরের প্রতি আমার অবিশ্বাস আসিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি মিথ্যা কথা বলেন, এই সকল বিষয় ঠাকুরকে মুখের উপরে বলা অবধি, ভিতর যেন আমার একেবারে শূন্য শ্মশান হইয়া গিয়াছে। দিনরাত আমার কি ভাবে যাইতেছে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। অন্তরের অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তবৎ হইয়া, নিজের শরীরে, নিজেই নানাস্থানে আঘাত করিলাম, চুল ছিঁড়িলাম, মাথা ঠুকিলাম, কান্দিতে কান্দিতে অস্থির হইয়া, হাত পা সময়ে সময়ে আছড়াইতে লাগিলাম। আত্মহত্যা করিবারও সময়ে সময়ে ঝোঁক আসিতে লাগিল। ঠাকুর এই সময়ে পাঠ বন্ধ রাখিয়া, এক একবার উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"কাল থেকে আবার তুমি রুদ্রাক্ষ-মালা ধারণ ক'রো।"

আজ ঠাকুরের আদেশ মত, আবার সেই 'নীলকণ্ঠবেশ' ধারণ করিয়া, ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। বেশের গুণেই হউক অথবা ঠাকুরের কৃপায়ই হউক, ধীরে ধীরে আমার জ্বালা যন্ত্রণা, কিছুক্ষণের মধ্যেই নিবৃত্তি হইয়া গেল।

পরিবেশনে ত্রুটি। তীর্থপর্য্যটনের নিয়ম

১৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার।

এবার কলিকাতাহইতে আসার পর, এ পর্য্যন্ত আশ্রমে বড়ই অর্থকৃচ্ছ্রতা চলিতেছে। গুরুভ্রাতারা-অনেকে আহারের অসুবিধা ভোগ করিয়া, স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা সত্ত্বেও, আশ্রমে আহারাদি বিষয়ে ভালর দিকে কোন প্রকার পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই। কিছু দিন, ঠাকুরের এবং সমাধিমন্দিরের জন্য পৃথক্ ভাবে ভোগ রান্না করিয়া, আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতাদের সাধারণ রকম ব্যবস্থায় চলিয়াছিল। ঠাকুর, বোধ হয় আমাদের ভিতরের দুরবস্থা আমাদিগকে দেখাইবার জন্যই, তখন ওসব বিষয়ে কিছু বলেন নাই। 'ঠাকুর পূবেরঘরে পৃথক্ আহার করেন, তাঁর পাক স্বতন্ত্র প্রকার হয়' ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নানা কথা তুলিলেন। ঠাকুর, উহা জ্ঞাত হওয়া মাত্রই, সেই দিন হইতে, দক্ষিণের ঘরে, সকলের সহিত এক সঙ্গে বসিয়া, সাধারণের পাকে আহার করিতেছেন। পরিবেশনের ভার, পূর্ব্বাপর আমার হাতেই আছে। আমি গুরুভ্রাতাদের অপেক্ষা, ঠাকুরকে ভাল তরকারি অধিক পরিমাণে দিয়া থাকি। ঠাকুর, দুই তিন দিন আমাকে ওরূপ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তাহা শুনিয়াও শুনি নাই।

আজ আবার ঠাকুর বলিলেন—"একস্থানে দশটি লোক ব'সে আহার করলে, পরিবেশনে লঘু গুরু করতে নাই; এক রকমই দিতে হয়। প্রসাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় অধিক পরিমাণে দিলে, এঁটো বস্তু দেওয়া হয়। খেয়ে আহারে কোন তৃপ্তি হয় না, ক্ষুধাও মিটে না।"

আজ মহাভারতপাঠের পর ঠাকুর, আমাকে তীর্থপর্য্যটনের নিয়ম বলিলেন—"তীর্থপর্য্যটন যৌবনে না করলে আর হ'য়ে উঠে না। যা কিছু করা, এ সময়েই করতে হয়। পর্য্যটনের সময়ে সর্ব্বদা মাথা হেট ক'রে, মাটির দিকে

দৃষ্টি রেখে চল্‌তে হয়। প্রতিদিন ৩।৪ ক্রোশ বা বেলা দশটা পর্য্যন্ত চ'লে, একটা স্থানে বিশ্রাম কর্‌তে হয়। সেখানে ভিক্ষা ক'রে, স্বপাক আহার কর্‌লেই ভাল। পর্য্যটনের সময়ে ধাতু বস্তু সঙ্গে রাখ্‌তে নাই। অর্থাদি স্পর্শও কর্‌তে নাই। টিকেট কেহ ক'রে দিলে নিতে পার। জলপাত্র কাঠের করঙ্গ হ'লেই ভাল। কৌপীন, বহির্বাস, একখানা কম্বল ও পাঠের দু' একখানা পুস্তক মাত্র সঙ্গে রাখ্‌তে হয়। কারও সঙ্গে না চ'লে, একাকী চলাতেই বেশী উপকার হয়। আহারের জন্য কোন দেবালয়ে প্রসাদও পাওয়া যায়।"

আমি ভাবিলাম, এ মন্দ নয়! দেবতা বিগ্রহকে কল্পনা বই কিছুই মনে করি নাই, এ অবস্থায় আমাকে তীর্থ পর্যটনের ব্যবস্থা!

যোগসঙ্কট।

১৯শে চৈত্র।

গত রাত্রিতে, বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম। রাত্রি বারটার সময়ে, আর আর দিনের মত, হাত মুখ ধুইয়া আসনে বসিলাম। প্রায় দেড়টার সময়ে, নাম করিতে করিতে, একটু তন্দ্রাবেশ হইল। ঐ সময়ে, ঠাকুরের গলার আওয়াজ পাইয়া, জাগিয়া পড়িলাম। তিনি প্রায়ই গভীর রাত্রিতে দুই একটি গানে টান দিয়া, দু' এক মিনিটের মধ্যেই ভাবাবেশে গোঁ গোঁ করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়েন। গত রাত্রিতেও—"সেই এক পুরাতনে, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কররে" ব্রহ্ম-সঙ্গীতের এই গানটির দু' এক পদ গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের ঐ গান এবং আশ্চর্য্য গম্ভীর এক প্রকার স্বর শুনিয়া, আমার ভিতরে, আপনা আপনি এতই বেগে নাম হইতে লাগিল যে, আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে, আমার হাত পা মাথা যেন খিচিয়া পেটের ভিতরে টানিয়া লইতে লাগিল। আমি তখন ঐ অস্বাভাবিক ক্রিয়া, প্রতি অঙ্গে হইতেছে বুঝিয়াও, তাহাতে কোন প্রকার বাধা দিতে পারিলাম না। শিরা, ধমনি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাংসপেশীগুলি মোচড়াইয়া, মনে হইল, যেন আমাকে একেবারে কুষ্মাণ্ডাকৃতি করিয়া ফেলিল। ভিতরে বাহিরে কেবল নামই শুনিতে লাগিলাম। শরীরে এক প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব হইতে লাগিল; কিন্তু তাহা নিবারণের কোনও চেষ্টাই আসিল না। কিছুক্ষণ পরে, আমার দেহের জ্ঞানও বিলুপ্ত হইল। তখন কি অবস্থায় কোথায় কি ভাবে ছিলাম, ঠাকুরই জানেন।

এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম, আমি কিছুই জানি না। পরে, ধীরে ধীরে নামের বেগ কমিয়া আসিল, হাত পাও, ক্রমে ক্রমে চেষ্টা করিয়া, সোজা করিয়া বসিলাম।

ঠাকুরকে মধ্যাহ্নে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম—'এরূপ কেন হইল?'

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ওপ্রকার হয়। নাম শ্বাসে প্রশ্বাসে হ'লে, যখন ঐ নাম প্রতি শিরায় শিরায় চল্‌তে থাকে, তখন হাত, পা, নাক, কাণ, চোখ্, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিতর দিকে টেনে নেয়। ঐ অবস্থার আরম্ভেই, সতর্ক না হ'লে, আর নাম এ সময়ে একেবারে ছেড়ে দিলে, বিষম সঙ্কটে পড়্‌তে হয়। ঐ অবস্থায়, হাত পা সমস্ত, একেবারে পেটের ভিতরে চ'লেও যেতে পারে। আবার অন্য প্রকারও হয়। নামটি অস্থি মজ্জা মাংসে প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যখন হ'তে থাকে, তখন হাত, পা, জানু প্রভৃতি শরীরের সমস্ত সন্ধিস্থলের গ্রন্থি সকল খ'সে যায়, একেবারে আল্‌গা হ'য়ে পড়ে; হাত পা লম্বা হ'য়ে যায়। তেমন মত হ'লে, হাত পা এমন কি মাথাটি পর্য্যন্ত শরীর হ'তে ছুটে পড়ে! আবার ধীরে ধীরে, ঠিক ঠিক স্থানে এসে লেগে জুড়ে যায়। এ সব শুধু কথা নয়, নিজে দেখেছি।"

প্রশ্ন—'একই নামে, শরীরের ভিতরে পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থা ঘটায় কেন?'

উত্তর—"নাম এক এক ভাবে চ'লে, দেহে এক এক প্রকার অবস্থা করে।"

প্রশ্ন—'নাম কর্‌তে কর্‌তে এক এক সময়ে শরীরে ভয়ানক জ্বালা হয় কেন?'

ঠাকুর বলিলেন—"এ জ্বালা কি জ্বালা? নাম যদি করতে পার, তা হ'লে জ্বালা কি টের পাবে। প্রাচীন কালে ঋষিদের সময়ে তুষানলের ব্যবস্থা ছিল। দেহশুদ্ধির জন্য কারো কারোকে তাঁরা তুষানলে শুদ্ধ ক'রে নিতেন। এ যুগে তা হবার যো নাই। শরীর সে প্রকার নয়; সে প্রকারের হঠযোগেরও অভ্যাস কেহ করে না। এখন মহাপুরুষেরা কৃপা ক'রে, নামাগ্নিতে দেহ শুদ্ধ ক'রে নেন। শ্বাস প্রশ্বাসে যখন নাম হ'তে থাকে, তখন এই জ্বালার আরম্ভ হয়। ক্রমে নামের সঙ্গে সঙ্গে এই জ্বালা এতই বৃদ্ধি হ'য়ে পড়ে যে, মনে হয়, শরীরের প্রতি অণু পরমাণু একেবারে দগ্ধ হ'য়ে গেল। এই নামাগ্নির জ্বালায় মানুষ তখন পাগলের মত ছুটা-ছুটি করে। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে, পরমহংসজীর আদেশে, যখন আমি বিন্ধ্যপর্ব্বতে

ছিলাম, এই জ্বালা আমার হয়েছিল। এই জ্বালায় স্থির থাক্‌তে না পেরে, সারা দিন আমি গায়ে পাতলা কাদা মাখ্‌তাম। একদিন, ঐ জ্বালা বিষম অসহ্য হওয়ায়, পর্ব্বতের ভিতরে একটা কুণ্ডে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লাম। ঐ সময়ে একটি সন্ন্যাসী, আমাকে তুলে এনে, বল্‌লেন—'এ কি করেছ? এ জলে কখনও নাব্‌তে আছে? এখনই যে পাথর হ'য়ে যেতে। দেখ, তোমার চুল, দাড়ি, গোঁপ সমস্ত একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে। এ জলের এ রকমই গুণ।' সন্ন্যাসী, অমনই পাহাড় খুঁজে, একটি লতা এনে, তা ছেঁচে কিছুটা রস ক'রে, চুলে লাগায়ে দিলেন। যে সব স্থানে ঐ রস দিয়েছিলেন, তা কাল হ'লো। আর যেগুলিতে লাগান হ'লো না, তা এখনও সাদা হ'য়ে আছে। তাই আমার সাম্‌নের এ সব চুল সাদা আর দু' পাশে ও পিছনের চুল কাল। গুরুজীর দর্শন পেয়ে, তাঁকে জ্বালার কথা বলায়, তিনি বল্‌লেন—'এ জ্বালায়ই এত অস্থির হ'চ্ছ! এখন তুমি জ্বালামুখী চ'লে যাও। সেখানে গিয়ে সাধন করলে, স্থানের প্রভাবে, এই জ্বালা আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হবে; পরে শীঘ্রই একেবারে নিবৃত্তি হ'য়ে যাবে। আমি অমনই জ্বালামুখী চ'লে গেলাম।"

এই বলিয়া ঠাকুর, বিন্ধ্যপর্ব্বতে সাধন সময়ে, যে সকল অবস্থা হয়েছিল, অনেক বলিলেন। ঠাকুরের মুখে সে সব কথা শুনিয়া, পূর্ব্বে একবার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি বলিয়া, এস্থানে আর লিখিলাম না।

প্রকৃতির গলদ বার্দ্ধক্যে প্রকাশ। উপদেশ।

আমার জীবনের গতি একটা ঠিক হইতে এখনও বহু বিলম্ব। ঠাকুরের মুখে ইহা শুনিয়া অবধি, মনটি অতিশয় খারাপ হইয়া গিয়াছে। এবার বাড়ী যাইয়া, আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, একটি বৃদ্ধের মুখে, তাঁহার জীবনের কথা শুনিয়া, নিয়ত কেবল তাহাই ভাবিতেছি। তিনি আমার ব্রহ্মচর্য্যের কথা শুনিয়া, বলিলেন—'আরে বাপু, এখন যাহাই কর না কেন, শেষ পরিণাম যে কি দাঁড়াবে, বলা যায় না! যৌবনে ইন্দ্রিয়প্রাবল্য যেমন অধিক হইয়া থাকে, তেমন আবার সৎসঙ্গে থাকিলে, ধর্ম্মোৎসাহও খুব বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। প্রকৃতির